প্রথম প্রকাশ
২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক
শঙ্খনীল দাস
এস-পি পাবলিশিং
ঋষি বঙ্কিমনগর
বারুইপুর। দক্ষিণ ২৪ পরগণা

অক্ষরবিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ
সুব্রত চৌধুরী

স বি ন য় নি বে দ ন

এককালে কথায় বলতো 'নাটক-নভেল'। নাটকের নামটাই আগে আসতো। নাটককে বোধ হয় সাহিত্যের মধ্যেই ধরা হতো তখন। আজকালও নাটকের বই বেরোয়, তবে তেমন করে নয়, কেননা তার নাকি আর সে-রকম পাঠক নেই। তা সে মঞ্চ নাটকই হোক বা চিত্রনাট্য। বেতার নাটক সে অর্থে তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

আসলে গল্প-উপন্যাস যেমনই হোক, বর্ণনায় তার চরিত্রগুলির একটা পূর্ণ রূপ, একধরনের চিত্রময়তা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মঞ্চ বা চিত্রনাটক এমনই প্রত্যক্ষ রূপের কারবারি যে শুধুমাত্র নিজের কল্পনা দিয়েই তাকে ইচ্ছেমতো সাজাতে পারবে না দর্শক। সেখানে নির্মাণকর্তার দৃশ্য-শ্রাব্য রূপের চৌহদ্দির মধ্যেই ঘুরপাক খেতে হবে তাকে। সেক্ষেত্রে বেতার বা শ্রুতিনাটকে সেই কল্পনার পরিধিটা আরও অনেকখানি পরিব্যাপ্ত। গল্প-উপন্যাসের মতো লেখকের বর্ণনামাফিক চরিত্রগুলির অবয়ব চিত্রিত হয় না বটে, তবে স্বর ও ধ্বনির সাহায্যে কল্পনায় ভিন্ন এবং নিজস্ব একটা ছবি ফুটে ওঠে শ্রোতার মনে। তখন কান দিয়েই সে দেখা আর শোনার দুটো কাজই একত্রে সেরে নেয়, যাকে বলা যায় 'কর্ণেন পশ্যতি'। মনের মাধুরী মিশিয়ে পছন্দ মতো ছবি তখন সে ফুটিয়ে তোলে মনের ভিতরে। হয়তো তাই ইদানীং মঞ্চেও বেশ কিছু শ্রুতিনাট্যের চর্চা দেখা যাচ্ছে। শ্রোতাদের উপভোগ্যতাও বাড়ছে।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের আমন্ত্রণে বিভিন্ন সময়ে কিছু শ্রুতিনাটক লিখতে হয়েছে। এগুলি তার মধ্যে বাছাই করা কয়েকটি। কিছু নাটকের পাণ্ডুলিপি হারিয়েছে, কিছুবা বর্জন করেছি স্বেচ্ছায়। এছাড়া এখনও প্রচারিত হয়নি এমন দু-একটি রচনাও থেকে গেছে এই সংকলনে যা ইতিমধ্যেই ওদের নির্বাচিত দপ্তরের ফাইলবন্দী হয়ে যথাকালে আত্মপ্রকাশের দিন গুনছে।

স্বনির্বাচিত নাটকগুলি কোনোদিন যে একত্রিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে তা আমার দূরবর্তী কল্পনাতেও ছিল না। এর মধ্যে বেশ কিছু নাট্যরূপান্তর রয়েছে, আবার কিছুবা মৌলিক। সম্প্রতি জন্মশতবর্ষ পালিত হলো এমন কিছু কুশলী কথাশিল্পীর গল্পে শ্রুতিনাট্যের রূপ দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধাও জানাতে চেয়েছি তাঁদের প্রতি। ভিন্ন ভিন্ন রসের নাট্যগুচ্ছের মধ্যে স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের গল্পও ঠাঁই পেয়েছে। এমনকী ধ্রুপদী কাহিনিও।

শ্রুতিনাটকে সাহিত্যের সঙ্গে নাট্যের রসায়নে তৃতীয় যে রূপটি ফুটে ওঠে, রসিক পাঠকের কাছে তার আবেদন নিষ্ফল হয় না— হয়তো এমন ভাবনায় প্রাণিত হয়েই সাহিত্যপ্রেমী প্রকাশকের এই প্রয়াস। প্রচেষ্টা সাধু। অনুরাগী পাঠকের দাক্ষিণ্য পেলে ভবিষ্যতে প্রবীণ-নবীন নাটককারদেরও শ্রুতিনাটকে আগ্রহ জন্মাবে এমন কল্পনাও অসম্ভব নয়। তাতে যে বৈচিত্র্য দেখা দেবে, আশা করা যায় নাট্যসাহিত্য তার ফলে পু ও ঋদ্ধই হবে।

এখানে নিজস্ব উপলব্ধিতে গ্রন্থিবদ্ধ নাটকগুলির সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করা গেল। যদিও খুবই সংক্ষিপ্ত, তবে বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের প্রথা তো এখনও অপ্রচল নয় সেটুকুই ভরসা।

পরবাসী অয়দিপাউস মহান গ্রিক নাটককার সফোক্লেস-এর এক ধ্রুপদী সাহিত্যকীর্তি। তিন খণ্ডে বিভাজিত এই ট্রিলজির এটি মধ্যপর্ব। রানী ইয়োকাস্তের আত্মহননের পরে স্বেচ্ছান্ধ অয়দিপাউস রাজা ক্রেয়নের নির্দেশে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হলেন। সেই বিপর্যস্ত জীবনে কন্যা আন্তিগোনেই তাঁর একমাত্র সঙ্গী। তার হাত ধরে দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে তিনি প্রান্তিক জীবনে পৌঁছে অবশেষে প্রতিবেশি রাজ্য কলোনাসে উপস্থিত হলেন। তারপর বহু নাটকীয় ঘাত-সংঘাতের পরে সেই পরবাসেই দেহান্তের মধ্য দিয়ে তাঁর 'অভিশপ্ত' জীবনের সমাপ্তি ঘটলো। ...সফোক্লেসের এ এমনই এক অনন্য শিল্পকর্ম যুগান্তকাল ধরে যা মহাকাব্যের রূপে বিশ্বনাট্য-সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন পেতেছে শ্রুতিনাট্য নির্মাণের জন্য এই বিশাল মঞ্চনাট্যের আয়তন ও গঠনভঙ্গির কিছু বদল ঘটাতে বাধ্য হলেও মূলের রূপ-রস ও নান্দনিক সৌরভ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সামর্থ অনুযায়ী তৎপরও থেকেছি। ফলে এই নবসৃজনের সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন রসিকমনের বিচার্য হয়ে রইলো।

পথের দাবী কিংবদন্তি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস। মানব-অন্তরের জাগ্রত দেশাত্মবোধই এই মহৎ সাহিত্যের মূল প্রেরণা। ব্রিটিশ রাজশক্তি একদা এই ব্যতিক্রমী উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করলেও তিনি যে বিপ্লবচেতনাকে প্রত্যক্ষভাবে জনমানসে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন তা অম্লানই রয়ে গেছে। সেকালের বিপ্লবীরা যে নির্মম-নিষ্ঠুর-হিংস্র ছিলেন না, পরন্তু মানবকল্যাণের অভীপ্সায় আপন স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে মানবাত্মার পূর্ণ মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, এ রচনায় তারই সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলার বিপ্লবীদের কলঙ্কমুক্ত করার জন্য শরৎচন্দ্রের এই হার্দিকপ্রয়াস স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অর্ধশতকে শ্রুতিনাট্যের আদলে পুনরুচ্চারণ করতে পেরে শ্লাঘা অনুভব করছি।

জয়ন্তর কীর্তি রহস্যগল্পে বিদেশের পাশাপাশি স্বদেশের কথাশিল্পী হেমেন্দ্রকুমার রায়ও প্রাক্‌স্বাধীনতা কালের জীবনচর্যা ও অপরাধতত্ত্বকে এমন সরল নিপুণতায় বিধৃত করেছেন

যে একাধারে তা যেমন কিশোরমনকে আকৃষ্ট আলোড়িত করে, অন্যদিকে তেমনি লেখকের বিজ্ঞানমনষ্কতা ও সমাজচেতনা বিদগ্ধ পাঠকেরও অভিনন্দনযোগ্য হয়ে ওঠে। মানুষ মরণশীল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কৌশলে তার টিসুগুলিকে মাঝে মাঝে ঘুম পাড়িয়ে সযত্নে সঠিক সংরক্ষণ করতে পারলে দীর্ঘকাল যে তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ভোরোনফের এই সূত্রকে অপরাধতত্ত্বের মিশ্রণে এক আশ্চর্য গল্পে রূপান্তর করেন হেমেন্দ্রকুমার। কিশোর সাহিত্যে একদা তিনি ছিলেন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। তাই একালের ছেলেমেয়েদের হাতে সেই রহস্যপুরীর গোপন রত্নভাণ্ডারের চাবিকাঠি তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

মৃত্যুবিষ আগাথা ক্রিস্টির এক অনবদ্য গোয়েন্দাকাহিনির শ্রুতিনাট্যরূপান্তর। উচ্চবিত্ত পরিবারের এক তরুণী বধুর খুনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রহস্যসমূহ কেমন করে শৈল্পিক কারুকৃতে জটিল জালবিস্তার করলো, কেমন করে অজ্ঞাত অন্তর্বর্তী ঘটনাবলির উন্মোচন হলো, পর্যায়ক্রমে উত্থান-পতন-উত্তেজনার মধ্য দিয়ে অপ্রত্যাশিত, অনিবার্য পরিণতি পেলো— সেই অনুপম অথচ শ্বাসরুদ্ধকর বিন্যাসভঙ্গি পাঠক ও শ্রোতার মননকে ক্ষণে ক্ষণে বিমুগ্ধ ও শিহরিত করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষিত অপরাধতত্ত্বের সামাজিক চিত্রাবলি যে বিশিষ্ট আঙ্গিকে দীর্ঘকাল ধরে আগাথা ক্রিস্টি সৃজন করেছেন তার বিকল্প দৃষ্টান্ত বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ।

না তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্রায়িত এক রমনীয় উপন্যাস। ইংরাজি শিক্ষার মাপকাঠিতে যেখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মাননির্ণয় হয় সে সমাজ যে কী পরিমাণ হাস্যকর ও তাৎপর্যহীন কালীনাথ আর অনন্তর সমস্যাবলি সেই সত্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই গল্পে.। তথাকথিত শিক্ষার আড়ালে মুখ লুকিয়ে ব্রজরানির জন্য কালীনাথের খেলাচ্ছলে এক তঞ্চকতা অনন্তর জীবনে যে কী ভয়ংকর বিপর্যয় ডেকে আনে— গ্রিক নাটকের নিয়তির মতো ভাগ্যবিড়ম্বনা তাদের এই ত্রিকোন প্রেমের পরিণতিকে কী দুঃসহ করে তোলে, সে দৃশ্য পাঠকের চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায়। সমকালকে ছুঁয়ে সেই অকিঞ্চিৎকর সমস্যা কী করে চিরকালীন মূল্যাবোধের মাত্রা পেয়ে গেল তারাশঙ্করের এ কাহিনিতে রয়েছে তারই সুচারু প্রতিভাস। জন্মশতবর্ষে তাই এ শ্রুতিনাটক সেই মহৎ কথাশিল্পীর স্মৃতির প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধারই প্রতীক।

শিমুলকাঁটা বাংলা সাহিত্যে অনু-গল্পের স্রষ্টা বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)-এর সৃজিত এক স্মরণীয় গল্প 'গনেশ'-এর শ্রুতিনাট্যরূপ। শহরের নামী ডাক্তারের চিকিৎসা আর কিশোরী স্ত্রীর আন্তরিক পরিচর্যায় জীবন ফিরে পেলেও একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায় গণেশ। বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া শেষসম্বল সোনার বালাজোড়াও স্বামীর চিকিৎসায় ব্যয় হয়ে যায় বিভাবতীর এখন স্ত্রীর শূন্য হাত দুটিই গণেশের মর্মজ্বালা বাড়ায়। মনে সাধ এখনকার ফ্যাশানদোরস্ত একজোড়া শিমুলকাঁটা বালা স্ত্রীকে সে পরাবে। কিন্তু দশটাকা বেতনের কর্মচারির সাধ অনুযায়ী সাধ্য ছিল না বলে মালিকের পুত্রবধুর জন্যে

তৈরি করা শিমুলকাঁটা বালা একটি রাতের তৃপ্তির জন্যে মিথ্যে বলে স্যাকরার কাছ থেকে চেয়ে এনেছিল। তারপর সেই বালাকে ঘিরে যে দুর্দৈব ঘটে গেল তা নিয়েই এ উপাখ্যান। যুদ্ধ-পূর্ব গ্রামবাংলার অর্থনীতি ও মূল্যবোধের এক অগ্নিভ দৃশ্য এ গল্পে আঁকা হয়েছে। বনফুলের জন্মশতবর্ষে তাঁর কাহিনিতে নাটক নির্মাণ করে শেষপর্যন্ত গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করলাম।

ভূত-ভবিষ্যৎ প্রবাসী কথাশিল্পী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মানবহিতৈষী রসিকভূতের গল্প। তাঁর ভূত ভয় দেখায় না, বরং বৈঠকি আড্ডায় তার আসক্তি প্রবল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের মুৎসুদ্দি সেই নন্দদুলাল নন্দী মশাই নিজের বুদ্ধি ও শ্রমে একদা জমিদার হয়েছিলেন। কিন্তু কর্মবীর এই মানুষটির আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর মূল্যবোধহীন বংশধরেরা কাপ্তেনি আর বাবু কালচারিতে কেমন করে সেই বিপুল সম্পত্তি নয়ছয় করে নিঃস্ব হয়ে গেল ভূতের গল্পে উনিশ শতকের সেই অভিশপ্ত রূপই ফুটে উঠেছে। সিপাহি-বিদ্রোহ কালের এই অশরীরী আত্মা বর্তমানে আপন প্রপৌত্রের একমাত্র অনূঢ়া কন্যাটির বিবাহচিন্তায় ব্যাকুল। তাকে সৎপাত্রস্থ করার দুশ্চিন্তায় ইহলোক ছাড়তে পারছেন না। পরিশেষে এক অলৌকিক যোগসূত্রে অভূতপূর্ব এক সরসতার মধ্য দিয়ে এ কাহিনির মিলনান্ত সমাপ্তি ঘটে। শরদিন্দুব বিচিত্রমুখী প্রতিভার প্রতি এ শ্রুতিনাট্য পরবর্তী প্রজন্মের সম্মাননারই স্বাক্ষর।

ইজ্জত আশাপূর্ণা দেবীর এক অনন্য ছোটগল্পের শ্রুতিনাট্যরূপ। মানুষের বাড়ি বাড়ি কাজ করা ঠিকে-ঝি বাসন্তী তার পরম রূপবতী কিশোরীকন্যাকে পারিপার্শ্বিক লোভের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য তার পুরোনো এক মনিবের বাড়ি, এক উচ্চবিত্ত পরিবারের দ্বারস্থ হলো। সমস্যাটির মর্ম আর গুরুত্ব বুঝে গৃহকর্ত্রী আশ্রয় দিতে রাজি থাকলেও তাঁর মূল্যবোধহীন আত্মকেন্দ্রিক দাম্ভিক স্বামীর অসম্মতি সেই বিপন্ন পরিবারটিকে তপ্ত খোলা থেকে জ্বলন্ত উনুনে ছুঁড়ে দেয়। তাতে কার ইজ্জত বাঁচে এমন মর্মান্তিক প্রশ্নে এ গল্পের সমাপ্তি। মানবিক আতসকাচের নিচে সমাজ ও সংসারকে রেখে তৃতীয় নয়নের মহার্ঘ দৃষ্টিতে আশাপূর্ণার অনুপুঙ্খ এই বিশ্লেষণ যেন বাংলা সাহিত্যের মুকুটে দুর্লভ দৃষ্টান্তের কমল হিরে পারিয়ে দিলো।

দীপান্বিতা বিজন কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটো গল্পের নাট্যরূপ। দাদার রূপবান বাল্যবন্ধু বীরেনকে বাইরে থেকে দেখে, সারাটা দিন একই কাজের সূত্রে তাঁর অন্তরের পরিচয় পেয়ে তরুণী অরুণার মনে স্বপ্নের যে ফুল ফুটে উঠেছিল, একদিন স্বক্ষেত্রে কর্মরত সেই বীরেনকে ভিন্ন রূপে পুনরাবিষ্কার করে সেই ফুল আকাশকুসুম হয়ে চোখের জলে ঝরে গেল তার। আবার বন্ধুর পরিবারে আত্মসম্মান বাঁচাতে যে মিথ্যাটুকুর আশ্রয় নিয়েছিল বীরেন তা যে এমন মর্মান্তিক বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে তা কি সে ভাবতে পেরেছিল কোনোদিন? পেশাদার ডুবুরির মতো জীবনের অতলে ডুব দিয়ে অরূপরতন খুঁজে পাওয়াই যেন ছিল এই কথাশিল্পীর নিত্যকালের বিলাস।

মুষ্টিমেয় যে কজনের বাংলা গল্প বিশ্বসাহিত্যে ঠাঁই পাবার যোগ্য নরেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। তাঁর অকালপ্রয়াণ বাংলাসাহিত্যের অশনিপাত সন্দেহ নেই।

ফালতু সুশীল জানার অন্যতম সেরা গল্প 'মানুষ'-এর সূত্র ধরে রচিত। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের এই বলিষ্ঠ গল্পকার অতি তুচ্ছ বিষয়বস্তুকেও যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির আলোয় আলোকসামান্য করে তুলতে পারতেন এ গল্পটি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোনো এক প্রতিবাদী মিছিলের দুর্বার গতিরোধে অসমর্থ পুলিশ যখন আন্দোলনকারীদের উপরে গুলি চালাতে বাধ্য হয়, তখন সেই মিছিলের পুরোভাগে থাকা মেয়েদের আড়াল করতে এক পথচারী হঠাৎ বন্দুকের সামনে ছুটে এসে প্রাণ হারায়। এমন আচমকা শহীদ হয়ে যাওয়া অজ্ঞাতপরিচয় লোকটি, অনেক অনুসন্ধানের পর, স্বার্থান্বেষী মানুষজনের কাছে নেহাৎই 'ফালতু লোক' হিসেবে চিহ্নিত হলেও সংগ্রামী মানুষের চোখে 'সত্যিকারের মানুষ' হিসেবেই তিনি কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় হয়ে রইলেন।

কার্গিলের মা এবং **কৃষ্ণচূড়া** শ্রুতিনাটক দুটি যেহেতু আমার মৌলিক রচনা তাই এখানে তার সবিশেষ পরিচিতি অবান্তর ভেবে পরিত্যাজ্য হলো। সেক্ষেত্রে আমার যা অনুভব তা প্রস্তাবনা আকারে নাটকদুটির সূত্রপাতেই বিধৃত হয়েছে। যথার্থ মূল্যায়ণের দায়িত্ব সুভদ্র রসিক পাঠককুলের।

আত্মঘাতী তন্বিষ্ঠ কথাশিল্পী বীরেন্দ্র দত্তর 'দুই পলাতক' গল্পের শ্রুতিনাটক। একদিকে দিনমজুরের মেয়ে সালমা আপন ঘরের ঠিকানা খুঁজতে চেয়ে পথ হারায় আর অন্যদিকে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে জীবন বাজি রাখা তরুণ অরিন্দমের দিকভ্রান্তি। এই দুই বিপন্ন মানুষকে বিধাতা আশ্চর্য মিলিয়ে দেন আত্মগোপনের আস্তানায়। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে বেরিয়ে আসে এরা দুজনেই একদা ছিল একই পাঠশালার সহপাঠি। আজ সালমা তার কুৎসিত সমাজের নিষ্ঠুর শিকার আর অরিন্দম স্বদেশি শাসককুলের নির্মম বিচারে উৎপীড়িত। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই দুই ভাসমান তরুণ-তরুণী কি শেষপর্যন্ত তাদের স্বভূমি ফিরে পাবে এমন এক ব্যাকুল প্রশ্নে এ গল্পের সমাপ্তি। যদিও দীর্ঘকাল সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ভ্রাম্যমান বীরেন্দ্র, তবু বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর ছোটোগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের মণিভাণ্ডার।

আলোর রাস্তা শিবতোষ ঘোষ রচিত কিশোর কাহিনী। অরণ্যবাসী লোধাদের জীবন ও জীবিকার সংগ্রামকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এর আখ্যানভাগ। সেই আদিবাসী সম্প্রদায়েরই এক বালকের কৌশল ও সহায়তায় একদল কাঠের চোরাচালানকারিদের গ্রেপ্তার এবং দিশাহারা বনবাসীদের স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে লেখক স্বপ্ন আর বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। পেশাদার লেখকের মতো বাধ্যতামূলক না লিখলেও এই সংকলনের সর্বকনিষ্ঠ শিবতোষ উদীয়মান গল্পকারদের মধ্যে নিজের কলমের জোর বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

'কর্ণেন পশ্যতি'-র পরিচয় প্রসঙ্গে আমার প্রিয় কবি বন্ধু অমিতাভ দাশগুপ্ত যে বৈদূর্যখচিত রচনাখণ্ড পাঠিয়েছেন, একমাত্র ভালোবাসাতেই তার পরিমাপ হয়। তাঁকে কি ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করা যায়? ভালোবাসাই তো ভালোবাসার একমাত্র বিকল্প।

প্রথিতযশা গল্পকার ও প্রাবন্ধিক বন্ধু বীরেন্দ্র দত্তর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধ্য। যে সব অনুলেখ্য রচনাবলি অমুদ্রিত, অগ্রন্থিত হয়েই হয়তো পড়ে থাকতো, তাঁরই একান্ত আগ্রহ, তাগিদ, বিস্ময়কর তৎপরতা ও সৌজন্যে আজ তা শোভনসুন্দর বই হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। তাঁর একান্ত বিশ্বাস বইটি রসজ্ঞ পাঠকের ভালোবাসা আদায় করবে। কে জানে? লোকে বলে— বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। প্রসঙ্গত, তাঁর একটি অসামান্য ছোটোগল্পের শ্রুতিনাট্যরূপ এ সংকলনে সংযুক্ত করতে পেরে ব্যক্তিগত ভাবে খুব তৃপ্তি পেয়েছি।

যে সব কথাশিল্পীর রচনা নিয়ে কাজ করার সুযোগ ঘটেছে তাঁদের সৃজনশৈলীর প্রতি আমার শ্রদ্ধার পরিসীমা নেই। সেই সঙ্গে আকাশবানীর প্রয়োজনাসূত্রে যে সব শিল্পী, কলাকুশলী, প্রযোজক এমন কী কর্তৃপক্ষ—সমবেতপ্রয়াসে, অসীম যত্ন ও শিল্পমাধুর্যে শ্রুতিনাট্যগুলি রসোত্তীর্ণ করেছেন তা তুলনাহীন। বিমুগ্ধ শ্রোতাবন্ধুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও তাঁদের নন্দিত করি।

কিছু রচনা ইতিপূর্বেই নানান পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হয়ে আগ্রহী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার মধ্যে কেউ কেউ বা তা নিয়ে মঞ্চে শ্রুতিনাটক পরিবেশনের দুঃসাহস দেখিয়ে আনন্দ কুড়িয়েছেন, এ খবরও আছে। সে যাই হোক, আমি ভাবি, নাট্যরূপান্তরে গল্পের রসমাধুর্য যদি অক্ষুন্ন থাকে, পাঠক তৃপ্তি পান, তাতেই সার্থকতার সুখ। অন্যথায় এর সামগ্রিক ব্যর্থতার দায় একান্তই আমার এ দীন স্বীকারোক্তিতে কুণ্ঠিত হবো না।

সূ চি প ত্র

কর্ণেন পশ্যতি

সফোক্লেস
(খ্রি.পূ. ৪৯৭ – খ্রি.পূ. ৪০৬)

প র বা সী অ য় দি পা উ স

অয়দিপাউস. রাজা থিসিউস. রাজা ক্রেয়ন. পলোনিসেস.
আন্তিগোনে. ইসমেনে কোরাস

ঝোড়ো বাতাসের শব্দ। একটুকাল পরে শোনা যাবে লাঠি ঠুকঠুক করে কে যেন এগিয়ে আসছে।

অয়দিপাউস।। আন্তিগোনে, মা আমার! তোর এই দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ পিতাকে এ কোথায় নিয়ে এলি মা? একি কোনো পল্লিভূমি, নাকি জনপদ? এখানে কেউ কি আতিথ্য দেবে এই গৃহহীন পথিক অয়দিপাউসকে?

আন্তিগোনে।। বাবা, দূরে কয়েকটি প্রাসাদচূড়া দেখে তো কোনো জনপদ বলেই একে মনে হচ্ছে। তবে যেখানে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি, সেটি বোধ হয় কোনো মন্দিরপ্রাঙ্গণ। এইতো— এখানে কত পবিত্র লরেল, জলপাইগাছ আর বুনো আঙুরলতার গুল্ম। ওই যে একটি শিলাখণ্ড— তুমি ওখানে বসে বিশ্রাম করবে এসো।

অয়দিপাউস।। বেশ তাই চল মা।

পাখির কাকলির মধ্যে হার্পের মৃদু সুর স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করে।

এই বিপুল চলমান সময়, এই দীর্ঘস্থায়ী শোকতরঙ্গ, ধমনীতে এই প্রবাহিত রাজরক্ত— ত্রিমুখী খরস্রোতের এই ঘাতপ্রতিঘাত আমাকে শিখিয়েছে স্থৈর্য আর সংযম। তাই আজ সামান্যই আমার আকাঙ্ক্ষা।

আন্তিগোনে।। মনে হচ্ছে, আমরা বোধহয় আথেন্সে এসেছি। কাউকে জিগ্যেস করতে পারলে হতো। ওইতো— একজন লোক এদিকেই আসছে যেন?

অয়দিপাউস।। আমাদের দিকে?

আন্তিগোনে।। হ্যাঁ, এই তো এসে গেছেন, তুমি কথা বলো বাবা।

অয়দিপাউস।। হে পথচারী, দাঁড়াও, শোনো— আমি অন্ধ। এই যে আমার কন্যা, ওর চোখেই আমার দৃষ্টি। তুমি কি অনুগ্রহ করে আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেবে?

পথিক।। মহাশয়, যে কোনো প্রশ্নের আগে আপনি ওই শিলাখণ্ড থেকে নেমে আসুন। এ বড়ো পবিত্র দেবালয়, ওটা ছুঁতে নেই।

অয়দিপাউস।। তাই নাকি? (লাঠির ঠুকঠুক শব্দ দূরে চলে যেতে থাকে) পথিক, কোন দেবতার মন্দির এটা?

পথিক।। এ হলো ধরিত্রী আর তমসার মহাদেবীদের লীলাভূমি। আমরা বিশ্বাস করি, অন্তর্যামী এই মহতী দেবীরা এতই জাগ্রত যে আন্তরিক প্রার্থনা করলে সকল প্রার্থীকেই অনুগ্রহ করেন।

অয়দিপাউস।। পথিক, আর একটি প্রশ্নের উত্তর দেবে? বলতে পারো, আমরা এখন কোথায় এসেছি?

পথিক।। যতদূর জানি, যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাকে বলে— আথেন্সের শিলা। ওই অশ্বারোহী মর্মরমূর্তি— দেব আপোল্লনের, যিনি এদের অধীশ্বর ও রক্ষক।

অয়দিপাউস।। তাহলে অদূরে নিশ্চয়ই জনবসতিও রয়েছে?

পথিক।। নিশ্চয়ই। মহান রাজার নামেই তার পরিচয়।

অয়দিপাউস।। রাজা? তিনি কে?

পথিক।। রাজা থিসিউস। রাজা এজেউস ছিল তাঁর পিতার নাম।

অয়দিপাউস।। তাঁর কাছে কি কোনো দূত পাঠানো সম্ভব?

পথিক।। প্রিয় বন্ধু, আপনার এই জীর্ণ দশা দেখেও আপনাকে সুজন বলেই মনে হয়। আপনার কথা আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েই আমি সকলকে বলবো। আপনি এখন এখানেই থাকুন। নগরে না গিয়ে আমি প্রথমে গ্রামবাসীদের সব কথা জানাচ্ছি। এখানে আপনার থাকা না থাকার ব্যাপারে তাঁরা যা স্থির করবেন তাই হবে।

বিরতি। হার্পের মৃদু সুর বাজে।

অয়দিপাউস।। আন্তিগোনে, ও কী চলে গেল মা?

আন্তিগোনে।। হ্যাঁ বাবা, আমি ছাড়া এখানে আর কেউ নেই।

অয়দিপাউস।। (প্রার্থনার সুরে) হে ধরিত্রী ও তমসার দেবি, তোমাদের লীলাভূমিতে আমি এসেছি, তোমরা প্রসন্ন হও। দেব আপোল্লনের অভিশাপে যদিও আমি আজ পরবাসী, তবু তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল যে জীবনের সীমান্তে পৌঁছে কোনো এক পীঠস্থানে আমি আমার শান্তির নীড় খুঁজে পাবো। আর সেখানেই হবে আমার দীর্ঘজীবনের যন্ত্রণা ও বেদনার উপশম।

আন্তিগোনে।। বাবা প্রবীন গ্রামবাসীরা বোধ হয়, তোমার খোঁজেই এদিকে আসছেন।

অয়দিপাউস।। তাহলে আমাকে তাড়াতাড়ি ওই বনের ভিতরে লুকিয়ে রাখ মা। আমি আগে আড়াল থেকে ওদের কথা শুনতে চাই।

দূর থেকে কোরাসদলের কণ্ঠস্বর নিকটবর্তী হয়।

১ম।। কোথায়? গেল কোথায়?

২য়।। শুনেছি একটু আগেও তো এইখানেই ছিল? নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়েছে।

৩য়।। বাইরে থেকে চারদিকে নজর রাখো। কেননা এ বনের মধ্যে ঢোকা নিষেধ।

৪র্থ।। শুনেছি, সে অন্ধ বৃদ্ধ এক বিদেশি পথিক। এইটুকু সময়ে কোথায় যেতে পারে?

লাঠি ঠুকঠুক শব্দ দূর থেকে এগিয়ে আসে।

অয়দিপাউস।। এই যে এখানে আমি। আমার কথাই তোমরা শুনেছ। আর এই আমার কন্যা। হে প্রবীন পল্লিবাসি, আমাদের দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখ, কী মন্দভাগ্য অসহায় মানুষ আমরা। এক দুর্বল নারী আজ এই অন্ধ বৃদ্ধের পদযাত্রার একমাত্র অবলম্বন।

হার্পের সুরে যেন বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে।

কোরাস।। হে প্রাচীন বিদেশিপথিক,
আপন অজ্ঞাতে তুমি
প্রবেশ করেছ এক নিষিদ্ধ কাননে।
ভগবান ফ্যয়বস, দেব আপোল্লন
এইখানে স্বর্গ হতে মধু আর শান্তিজল
প্রক্ষেপ করেন।

সরে যাও, দ্রুত সরে যাও—
পবিত্র অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ করে
তোমার বক্তব্য বলো, শুনবো সকলে।

লাঠির ঠুকঠুক শব্দ দূরে সরে যেতে থাকে।

অয়দিপাউস।। কত দূরে যেতে হবে?
কোরাস।। যাও যাও, আরো দূরে— আরো দূরে যাও।

লাঠির শব্দ আরো দূরে যায়।

অয়দিপাউস।। আরো দূরে?
১ম।। এবারে ঠিক আঁছে।
২য়।। তোমার বাঁ দিকে একটি শিলাখণ্ড আছে, ইচ্ছে হলে বসতে পারো।
অয়দিপাউস।। (স্বস্তিতে) আ!! — আমাকে একটু হাত ধরে বসিয়ে দে না মা আন্তিগোনে, আমি বড়ো ক্লান্ত!
৩য়।। এইবার বলো, তুমি কে?
৪র্থ।। কী নাম তোমার?
২য়।। কোথায় তোমার দেশ?
১ম।। কেন এমন অসহায়ভাবে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছ?
অয়দিপাউস।। (আতঙ্কিত) না না, ও সব তোমরা জিগ্যেস কোরো না— আমার দেশ, নাম, বংশপরিচয়— না না—
১ম।। না, যদি তুমি এখানে আশ্রয় চাও, তবে সে কথা আমাদের জানতেই হবে।
অয়দিপাউস।। (হতাশ) ও, জানতেই হবে? — বেশ, তবে যদি সহ্য করতে পারো, শোনো। ... তোমরা কি রাজা লাইয়সের নাম শুনেছ?
২য়।। শুনেছি। (ভীত) কিন্তু—
অয়দিপাউস।। সেই বংশের অন্য কারও নাম?
২য়।। (প্রায় আতঙ্কিত) কী বলতে চাও তুমি?
অয়দিপাউস।। আর সেই হতভাগ্য অয়দিপাউসের?
৩য়।। ও, তুমিই তাহলে সেই? হায়, দেবতারা আমাদের রক্ষা করুন।
৪র্থ।। পালাও, পালিয়ে যাও—
১ম।। এখনই এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাও—
আন্তিগোনে।। হে সুভদ্র পল্লিবাসি, আপনারা প্রাচীন, প্রাজ্ঞ এবং ন্যায়নিষ্ঠ। অতীতে

আমার এই অন্ধ-অসহায় পিতার কিছু অসামাজিক কাজের অপরাধে তাঁর আবেদন আপনারা অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, যে পাপ সেদিন ঘটেছিল তা নিয়তির বিধানে এবং তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতে। আমার প্রার্থনা এই হতভাগ্য পিতার জন্যেই। আপনারা একবার ভাবুন, আপনাদেরই এক মেয়ে যেন কোনো এক যন্ত্রণাকাতর মানুষের জন্যে আপনাদের কাছে আবেদন করছে। আপনারা কি তাকে ফিরিয়ে দেবেন?

কোরাস।। তোমরা যে সীমাহীন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হচ্ছো সে কথা ভেবে তোমার এবং তোমার পিতার উপর মমতা হচ্ছে। কিন্তু দৈব অভিসম্পাতের আশঙ্কায় আমরা ভীত বলেই তোমাদের চলে যাবার কথা বলেছি।

অয়দিপাউস।। আমি জানি, তোমাদের ভয়ের উৎস আমার পাপ। কিন্তু সত্যিই কি আমি পাপ করেছিলাম? আর যদি করেও থাকি, বিশ্বাস করো, সেও তো সজ্ঞানে নয়? আমি দেবতার নামে শপথ করে তোমাদের করুণা ভিক্ষা করছি, তোমরা আমাকে রক্ষা করো। অন্তত তোমাদের রাজা না আসা পর্যন্ত আমার প্রতি কোনো অবিচার কোরো না।

২য়।। তোমাদের আবেদনের অর্থ ও গুরুত্ব আমরা অনুভব করছি। আমরা নীরব রইলাম। আমাদের অধীশ্বর তোমাদের বিচার করবেন।

অয়দিপাউস।। বেশ, তিনি কত দূরে থাকেন?

১ম।। কিছু দূরে। ওই জনপদের কেন্দ্রে, যেখানে তাঁর পিতার রাজত্ব ছিল। এখানে যে পথিক তোমাকে প্রথমে দেখতে পায় সে-ই গেছে তাঁকে সংবাদ দিতে।

অয়দিপাউস।। ও। কিন্তু আমার মতন একজন রিক্ত নিঃস্ব অন্ধ বৃদ্ধকে দেখতে কি তিনি আসবেন?

৪র্থ।। তোমার নামই এখানে টেনে আনবে তাঁকে।

অয়দিপাউস।। কী করে জানবেন আমার নাম? ওই পথিককে তো আমি আমার পরিচয় দিইনি?

৩য়।। বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো রটনা হয় সংবাদ। লোকমুখে তোমার আগমনের কথা ছড়িয়ে গেছে। এই পৃথিবীতে কে না জানে তোমার নাম?

একটি ঘোড়ার পায়ের শব্দ কাছে আসছে।

আন্তিগোনে।। কী আশ্চর্য! একি স্বপ্ন দেখছি!

অয়দিপাউস।। আন্তিগোনে, কী হয়েছে মা?

আন্তিগোনে।। ঘোড়ায় চেপে ও কে আসছে? টুপিতে মুখের খানিকটা আড়াল হলেও আমার যেন মনে হচ্ছে— কী জানি, ভুল দেখছি না তো? না না, ওই তো হাসছে! — হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে ইসারা করছে! — না, কোনো ভুল নেই, ওই তো আমার দিদি ইসমেনে!

অয়দিপাউস।। ইসমেনে? অসম্ভব।

আন্তিগোনে।। না বাবা, সত্যি। তোমার মেয়ে, আমার দিদি ইসমেনে— ওই তো ঘোড়ায় চেপে আসছে—

ইসমেনে।। আঃ! শেষপর্যন্ত আমি সত্যিই তোমাদের খুঁজে পেলাম! চোখের জলে আমার সব ঝাপসা হয়ে আসছে বাবা।

অয়দিপাউস।। ইসমেনে, মা, সত্যিই তাহলে তুই এলি?

ইসমেনে।। হ্যাঁ বাবা, সত্যিই অনেক কষ্টে তোমাদের খুঁজে পেলাম।

অয়দিপাউস।। একবার আমার হাতটা ধর তো মা।

ইসমেনে।। এই তো বাবা, এই তো আমি তোমাদের দু-জনেরই হাত ধরলাম।

অয়দিপাউস।। (গভীর তৃপ্তিতে) আ—

আন্তিগোনে।। দিদি আমার, ইসমেনে—

অয়দিপাউস।। এত কষ্ট করে কেন এলি মা? আমাদের দেখতে?

ইসমেনে।। তোমাদের দেখতে।

অয়দিপাউস।। কেন, এ সময়ে তোমার ভাইরা কোথায়?

ইসমেনে।। যে যেখানে থাকার সেখানেই আছে। তবে তারাও খুব সুখে নেই।

অয়দিপাউস।। সুখে নেই? সব বিপদ-আপদের ঝুঁকি নেবার জন্যে তোমাদের দুই বোনকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা নিশ্চিন্ত আরামে ঘরের মধ্যে বসে আছে, আর বলছো— সুখে নেই? যত অপদার্থ, শয়তানের দল। আমার জন্যেও ওরা কোনো কষ্ট স্বীকার করেনি। দ্যাখ ইসমেনে, এই তো বেচারি আন্তিগোনে— আমার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সব সুখের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে আমার মতো এক অসহায় বৃদ্ধের সঙ্গী হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আর তুইও ইসমেনে, আমার নির্বাসনের পর থেকেই তুইও তো কত কষ্ট স্বীকার করে, থেবাইয়ের লোকজনদের নজর এড়িয়ে, মাঝে-মধ্যে দৈববাণী শুনতে পেলে আমাকে জানিয়ে গেছিস? আর আমার ছেলেরা? ভাব?... যাক, কী খবর এসেছিস বল। কোনো বিপদের পূর্বাভাষ?

ইসমেনে।। আমাদের দুঃখকষ্টের কথা এখন থাক বাবা। আগে শোনো তোমার হতভাগ্য দুই ছেলের কথা। দেবতাদের অভিশাপে আমাদের রাজবংশ যখন চরম সর্বনাশের মুখোমুখি হয়েছিল, তখন আসন্ন ধ্বংসের আশঙ্কায় তারা মাতুল ক্রেয়নকেই থেবাইয়ের অধীশ্বর বলে মেনে

নিতে বাধ্য হয়। তারা চেয়েছিল, সারা দেশ পাপমুক্ত হোক। কিন্তু ধীরে ধীরে রাজমুকুটের প্রতি লোভ তাদের পাপ মনেও জন্ম নেয়। ক্ষমতার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ছোটো ভাই পিতৃভূমি থেকে বিতাড়ন করলো বড়ো ভাই পলোনিসেসকে। এখন শোনা যাচ্ছে পলোনিসেসও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আর্গসের রাজার সহায়তায় থেবাই আক্রমণের আয়োজন করছে। এই হচ্ছে ঘটনা। রূঢ় সত্য। তাছাড়া তোমার এই ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে দেবতার কতখানি অনুগ্রহ পাবে তাও বলতে এসেছি।

অয়দিপাউস।। অনুগ্রহ?

ইসমেনে।। দৈববাণী শুনে সেই ভরসাই হয় বাবা।

অয়দিপাউস।। কী সেই দৈববাণী?

ইসমেনে।। থেবাইয়ের জনসাধারণ তোমার জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরে তোমারই অভাব অনুভব করবে। তাদের মধ্যে তারা তোমাকেই পেতে চাইবে।

অয়দিপাউস।। পেতে চাইলে... কিন্তু এখন আমি আর তাদের কোন কাজে লাগবো?

ইসমেনে।। তোমার স্পর্শেই তারা সুখসমৃদ্ধি লাভ করবে। জগতের চোখে এই জাতি আবার মহান হয়ে উঠবে।

অয়দিপাউস।। হাঃ! তাতে কি আবার আমি মানুষের মতো হবো?

ইসমেনে।। যে দেবতারা তোমাকে পতনের মুখে নিক্ষেপ করেছেন, তাঁরা আবার তুলে ধরলে অসম্ভব কী?

অয়দিপাউস।। হ্যাঁ, কিন্তু কোনো লাভ নেই। যৌবন আর প্রৌঢ়ত্ব যদি সন্তাপেই কেটে যায়, বার্ধক্যে কী লাভ সুখস্বপ্নে?

ইসমেনে।। কিন্তু যদি ন্যায়হীন, সম্মানহীন মৃত্যু তোমাকে বরণ করতে হয়, তাতে থেবাইবাসীর চরম অমঙ্গল বাবা!

অয়দিপাউস।। কে বলেছে তোমাকে?

ইসমেনে।। দেলফয়ের দেবালয়ে যে দূত পাঠানো হয়েছিল, এ সংবাদ সে-ই বহন করে এনেছে।

অয়দিপাউস।। ও। এই কি আমার সম্পর্কে দৈববাণী?

ইসমেনে।। ঠিক তাই।

অয়দিপাউস।। আমার ছেলেরা জানে?

ইসমেনে।। জানে।

অয়দিপাউস।। (চরম বিস্ময়ে) জানে? তবু— ? ... আচ্ছা, এই অনিবার্য ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব যা অচিরেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হবে, কোনো দেবতা কি তা থেকে ওদের নিবৃত্ত করতে পারেন না? কী জানি? আমি থাকলে হয়তো মীমাংসা করা সম্ভব ছিল। আর তা যদি হতো, তাহলে হয়তো

থেবাইয়ের বর্তমান রাজা সিংহাসন বসতো না এবং স্বরাজ্য থেকে নির্বাসিত এই হতভাগ্যেরও স্বদেশে ফিরে যাবার জন্যে দৈববাণীর প্রয়োজন হতো না। (ক্ষোভে) ওঃ! ... যাক্, ধ্বংস হয়ে যাক। ওরা স্বার্থপর শয়তান। সিংহাসনের লোভে উন্মত্ত আমার এই দুই পুত্র তাদের পিতাকে নিয়ে ঘৃণ্য ব্যবসা করতেও কুণ্ঠিত নয়। আমি বলছি, শোন আন্তিগোনে, শোন ইসমেনে, ওরা যদি রাজত্বও পায়, তবু আমাকে আর ফিরে পাবে না। আমি ওদের কোনো রকম সহায়তা করবো না। ওদের শাসনে ওই থেবাইয়ের জনগণের কোনো মঙ্গল হবে না। (কোরাসের প্রতি) শোনো– উপস্থিত আমার প্রিয় বন্ধুগণ, শোনো। তোমরা আমার সহায় হও। তোমাদের সহায়তায়, তোমাদের এই শক্তিরূপিণী দেবীর যদি কৃপা লাভ করি, তবেই আমার শত্রুরা ধ্বংস হবে এবং তোমাদের দেশ এক নতুন উদ্ধারকর্তা লাভ করবে।

১ম।। অয়দিপাউস, তোমার এবং তোমার কন্যাদের জন্যে আমরা দুঃখপ্রকাশ করছি। তবু যদি তুমি সত্যিই এদেশের এক নবশক্তির উৎস হয়ে ওঠো, তবে তোমার মঙ্গলের জন্যে আমরাও তোমাকে সৎ পরামর্শ দিতে প্রস্তুত।

অয়দিপাউস।। বেশ, আমিও প্রস্তুত তোমাদের সেই সব উপদেশ মেনে চলতে। বলো বন্ধু।

কোরাস।। মহাদেবীর বেদীমূলে পা রেখে যে পাপ তুমি করেছ, প্রথমে তারই প্রায়শ্চিত্য করতে হবে।

অয়দিপাউস।। করবো। বলো কী করতে হবে?

২য়।। শুদ্ধ চিত্তে নির্ঝরিণী থেকে সর্বাগ্রে সংগ্রহ করতে হবে পুতসলিল।

অয়দিপাউস।। তারপর?

৩য়।। তারপর ওখানে যে সূক্ষ্ম কারুকাজ করা তাম্রপাত্র রয়েছে তাতে ওই পবিত্র জল এবং মধু পূর্ণ করে দেবতার উদ্দেশে তিনবার অঞ্জলি দিতে হবে। মনে রেখো, তৃতীয়বারেই কিন্তু পাত্রটি নিঃশেষিত হবে।

অয়দিপাউস।। হ্যাঁ আমি বুঝেছি, তমসা ও ধরিত্রী তা পান করবেন। তারপর?

৪র্থ।। তারপর জলপাইশাখা থেকে প্রার্থীর পল্লব ধারণ করে প্রার্থনা করতে হবে অতি নিম্নকণ্ঠে। প্রয়োজনে অবশ্য তোমার হয়ে অন্য কেউ করায় আপত্তি নেই। প্রার্থনার শেষে ধীরে ধীরে পিছন ফিরে সরে আসবে। সব কাজ সঠিক হলে আমরাও তোমাকে সব রকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

অয়দিপাউস।। বেশ। আন্তিগোনে, ইসমেনে–

আন্তিগোনে।। আমরা এঁদের সব কথা শুনেছি বাবা–

ইসমেনে।। এক্ষেত্রে যা করণীয় আমিই তোমার হয়ে করছি বাবা।

১ম।। তোমাকে তাহলে ওই বনের ধারে যেতে হবে। আমাদের মধ্যে একজন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে দেবে।

ইসমেনে।। আন্তিগোনে, তুই বাবার কাছে থাক, আমি যাচ্ছি।

২য়।। বিগতদিনের দুঃসহ বেদনা মানুষের হৃদয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে, জানি তাকে জাগিয়ে তোলা নির্মমতা— তবু অয়দিপাউস, অপ্রতিরোধ্য তোমার সেই অতীত জীবনের যন্ত্রণাবিদ্ধ কাহিনি শুনতে চাই।

অয়দিপাউস।। (আর্ত চিৎকার) না না না, শুনতে চেয়ো না, তোমরা শুনতে চেয়ো না।

৩য়।। সমস্ত পৃথিবীতে আজ যে কাহিনি রটনা হয়েছে, তোমার মুখেই শুনতে চাই সেই ঘটনার প্রকৃত সত্যতা।

অয়দিপাউস।। (লজ্জা ও যন্ত্রণায়) আঃ লজ্জা! কী লজ্জা!! তবু বন্ধুগণ, তবু আমি তোমাদের বলবো, নিতান্ত অকারণেই আমাকে কী দুঃসহ অন্যায় আর অবিচার সহ্য করতে হয়েছে। অথচ ঈশ্বর সাক্ষী, আমি স্বেচ্ছাকৃত কোনো অপরাধ করিনি।

৪র্থ।। কী সেই ঘটনা?

অয়দিপাউস।। একটি বিবাহ। কেউ কখনো শোনেনি, ভাবতে পারে না— একটি নগরীতে ধ্বংসের বীজ আমিই বহন করেছিলাম— এক ঘৃণ্য বিবাহ-বন্ধনের মধ্য দিয়ে.....

৪র্থ।। এবং যার অংশীদার ছিলেন তোমার মাতা?

অয়দিপাউস।। (আর্ত বিপর্যস্ত চিৎকারে) হা—! এ কথা শোনাও আমার পক্ষে পাপ। কালান্তক পাপ! তবু শোনো, এই কন্যা দুটি আমার সন্তান—

১ম।। একই সঙ্গে তোমার কন্যা—

অয়দিপাউস।। এবং ভগ্নী। একই সঙ্গে আমি পিতা এবং ভ্রাতা... কী ভয়ংকর লজ্জা!

২য়।। হ্যাঁ, ভয়ংকর।

অয়দিপাউস।। কিন্তু আমি কি স্বেচ্ছায় এ কাজ করেছিলাম?

কোরাস।। তবে?

অয়দিপাউস।। যে নগরীর আমি উপকার করেছিলাম সেই তো আমাকে দান করছিল আমার প্রিয় উপহার— যা ছিল— আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। নিয়তির অভিশাপের বোঝা বহনের জন্যে কেন ওই নগরীব উদ্ধারে আমি এগিয়ে এসেছিলাম? কেন? কেন?

১ম।। এ ছাড়াও তুমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছিলে?

অয়দিপাউস।। হ্যাঁ, করেছিলাম। কিন্তু জেনে রেখো বন্ধুগণ, সে হত্যাও আমার অজ্ঞাতসারে হয় বলেই আইনের বিচারে আমি নিরপরাধ। আমি নির্দোষ। মুক্ত।

২য়।। ওই তো রাজা থিসিউস আসছেন। তোমার আবেদন শুনে সাহায্যের জন্যেই আসছেন।

একটুকাল হার্পের সুর বাজে।

কোরাস।। রাজা! আমাদের রাজা!

থিসিউস।। রাজা লাইয়সের সন্তান অয়দিপাউস, তুমি আমার কাছে অপরিচিত নও। তোমার অতীতের বেদনার্ত সব কাহিনিই আমি শুনেছি। তোমার ওই দৃষ্টিহীন অক্ষিকোটর, তোমার ওই বিক্ষত মুখমণ্ডল, আর তোমার ওই শতছিন্ন মলিন পরিচ্ছদ, তোমার পরিচয় ও বর্তমান অবস্থা আরও করুণ, আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। হে বিষণ্ণ অয়দিপাউস, এই জীর্ণ অবস্থায় তুমি আমার কাছে কী আবেদন নিয়ে এসেছ? নির্দ্বিধায় বলো-- আমি আন্তরিক সহানুভূতি নিয়ে তোমার সব কথা শোনার জন্যেই প্রস্তুত।

অয়দিপাউস।। মহান রাজা থিসিউস, তোমার সহানুভূতি ও মমতাময় ভাষণে আমি কৃতজ্ঞ। ইতিপূর্বেই তুমি আমার পরিচয় জেনেছ, তাই এখন আমি আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানাবো তোমাকে। আমি একটি সামান্য উপহার এনেছি তোমার জন্যে-- তুমি গ্রহণ করো।

থিসিউস।। কী সেই উপহার?

অয়দিপাউস।। ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত আমার এই জীর্ণ দেহ। যদিও সুখদৃশ্য নয়, তবু মূল্যবান।

থিসিউস।। কোন মূল্যে?

অয়দিপাউস।। পরে জানবে।

থিসিউস।। কখন?

অয়দিপাউস।। আমার দেহান্তে। এই মরদেহ সমাহিত করার সময়।

থিসিউস।। শুধু কি শেষকৃত্যের প্রতিশ্রুতিটুকুই আমার কাছে তোমার প্রার্থনা?

অয়দিপাউস।। হ্যাঁ, প্রার্থনা সামান্য হলেও এর গুরুত্ব অনেক রাজা। তুমি জানো না, আমার ছেলেরা আবার থেবাইয়ে আমার প্রত্যাগমন কামনা করে।

থিসিউস।। নির্বাসনের তুলনায় সে তো অনেক ভালো, অবশ্য যদি তুমি চাও।

অয়দিপাউস।। হ্যাঁ, কিন্তু যখন আমি ওদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম, তখন ওরাই তো পরিত্যাগ করেছিল আমাকে? আমারই শোণিত যাদের ধমনীতে বহমান, তারাই আমাকে বিতাড়ন করেছে আমার জন্মভূমি, আমার স্বদেশ, স্বরাজ্য থেকে।

থিসিউস।। তাই যদি, তাহলে এখন কেন তারা তোমার প্রত্যাগমন কামনা করে?

অয়দিপাউস।। কারণ দৈববাণী। দৈববাণীর ঘোষণা : তোমার এই দেশের হাতে ওরা একদিন কঠিন শাস্তি পাবে।

থিসিউস।। কিন্তু কেন? কী কারণে আমার দেশের সঙ্গে বিবাদ হবে?

অয়দিপাউস।। কারণ? মহাকাল। চিরঞ্জীব মহাকালের হাতেই ওড়ে ধ্বংসের প্রলয়কেতন। দেবতা আর মহাকাল ভিন্ন সবই তো মরণশীল। আমি বলছি, দেবতার অস্তিত্ব যদি মিথ্যা না হয়, তবে আমার কথাও অসত্য হবে না। আমার— যাক, অনেক কিছু বলে ফেললাম— আর নয়। তুমিও কিছু জানতে চেয়ো না, শুধু তোমার নিজের কিছু বলার থাকলে বলতে পারো। আর একটা কথা। আজ যদি তুমি আমাকে এখানে স্থান দাও, ঈশ্বর আমাকে প্রতারণা না করলে তুমি নিশ্চয়ই তার বিনিময়ে পুরস্কৃত হবে।

৩য়।। প্রথম থেকেই উনি এই প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করছেন রাজা।

৪র্থ।। মহান রাজা, আমাদের বিশ্বাস, ওই প্রতিশ্রুতি-পালনে উনি পরাঙ্মুখ হবেন না।

থিসিউস।। এই সব কিছু বিবেচনা করে, অয়দিপাউস, আমার এই নগরীতে আমি তোমার বসবাসের আবেদন মঞ্জুর করলাম।

অয়দিপাউস।। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন থিসিউস। তোমার এই অনুগ্রহে, আমি তোমাকে বলছি— যারা আমাকে আমার দেশ থেকে নির্বাসিত করেছে, তোমার দেশে দাঁড়িয়েই আমি তাদের পরাস্ত করবো। এবং তাতে তোমার মঙ্গলই হবে।

থিসিউস।। আমিও তোমাকে বলছি অয়দিপাউস, যতদিন তুমি এখানে থাকবে, আমার এই বন্ধুরাই তোমার প্রয়োজন ও রক্ষণাবেক্ষণের দিকে দৃষ্টি রাখবে।

অয়দিপাউস।। কিন্তু তুমি কি এখন চলে যাবে?

থিসিউস।। ভয় কী? আমার কর্তব্য সম্পর্কে আমি সচেতন আছি।

অয়দিপাউস।। তোমার অনুপস্থিতিতে ভয়ের কারণ আছে রাজা।

থিসিউস।। যে কারণই থাক, তা গুরুত্ব পাবে না। এমন কী ক্ষমতার মোহে তোমার কোনো অহংকারী আত্মীয়ও যদি আমার অনুমতি ভিন্ন এখানে তোমার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের চিন্তাও করে থাকে— তবে পরিণামে যে কঠিন সংঘর্ষের ঝড় উঠবে সে কথা ভেবে, আমার অনুমান, ওই অন্যায় কর্ম থেকে সে অবশ্যই বিরত থাকবে। তাছাড়া, এক্ষেত্রে স্বয়ং দেব ফ্যয়বসই তোমার ত্রাতা। তদুপরি এই রাজ্যে আমার নামই তোমাকে যে কোনো বাইরের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। বিদায়।

হার্পের সুর মন উদাস করে মুহূর্তকাল। ধীরে ধীরে আসন্ন ঝড়ের মৃদু শব্দ ছাপিয়ে

দূর থেকে কিছু অশ্বারোহীর এগিয়ে আসার শব্দ নিকটতর হয়। আতঙ্কিত আন্তিগোনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

আন্তিগোনে।। পিতা— পিতা—

অয়দিপাউস।। কোনো সংবাদ আছে আন্তিগোনে?

আন্তিগোনে।। ক্রেয়ন আসছে পিতা। হ্যাঁ, বহু অনুচর সঙ্গে নিয়েই আসছে।

আয়দিপাউস।। তাহলে বোধহয় এতদিনে আমার মুক্তির চরম লগ্ন এলো।

কোরাস।। তবে তাই হোক অয়দিপাউস, আমরা প্রবীণ হলেও আমাদের দেশ যৌবনদৃপ্ত।

দূর থেকে এগিয়ে আসা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ থামে। ঝড়ের আভাস স্পষ্টতর হয়।

ক্রেয়ন।। হে কলোনাসের সুধিবৃন্দ, আপনারা আমাকে দেখে ভয় পাবেন না। কেননা কোনো অসাধু উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনাদের কাছে আসিনি। আমি জানি, এই দেশ শৌর্যে-বীর্যে সমগ্র গ্রীসদেশের মধ্যে গরীয়ান। হে সুধিবৃন্দ, আমি বৃদ্ধ বলেই আমার দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে এই ভদ্রলোককে থেবাইয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রেরিত হয়েছি। এবং এঁর পরমাত্মীয় হিসেবে ব্যক্তিগত ভাবেও ওঁর অভাব অনুভব করেই এসেছি। হে হতভাগ্য অয়দিপাউস, আমার কথা শোনো, ফিরে চলো তোমার স্বদেশে। তোমার দেশবাসী অধীর আগ্রহে তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। ভবঘুরে ভিক্ষুকের মতো তোমার এই ভাগ্যবিড়ম্বিত অসহায় জীবনধারা দেখে আমার হৃদয় শোকে মুহ্যমান।

অয়দিপাউস।। নির্লজ্জ ক্রেয়ন, তোমার অসাধু উদ্দেশ্য ওই চতুর বাক্যবিন্যাসে চাপা পড়বে না। তোমার দুর্বুদ্ধি এবং সুযুক্তির রঙিন ফাঁস পরিয়ে ভেবেছ আমাকে চরম দুঃখের অনুগামী করে তুলবে, তা হবে না। মনে করো ক্রেয়ন সেদিনের কথা— যেদিন স্বেচ্ছায় আমি অন্ধত্ব বরণ করে নির্বাসন চেয়েছিলাম, সেদিন এই তুমিই বাধা দিয়েছ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে স্থিত হয়ে যখন সংসারের মমতা ও ভালোবাসার মধ্যে নিজেকে জড়াতে চেয়েছি, তখনই নিষ্ঠুর সেই বাঁধন ছিঁড়ে আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তুমিই বাধ্য করেছ আমাকে তোমার ওই নির্মম নির্বাসন দণ্ড মেনে নিতে। আমি চাই, উপস্থিত আমার এই বন্ধুরা জানুক, কেন তুমি এখানে এসেছ— এবং তার অন্তরালে কী তোমার দূরভিসন্ধি। তুমি যে ভালোবেসে আমাকে জন্মভূমিতে ফিরিয়ে নিতে আসোনি,

বরং এসেছ আমাকে স্বদেশের সীমান্তে রেখে যাতে আথেন্সের সঙ্গে ভবিষ্যতের সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে পারো তারই প্রয়াসে— এ কথা তারা জানুক। এমনকী তুমিও জেনে রাখো, তোমার সে বাসনা অপূর্ণই থাকবে। তুমি, আমার দেশ ও আমার উত্তরাধিকারী পুত্র দুজন শুধু আমার অভিসম্পাত ছাড়া আমার কাছ থেকে আর কিছুই পাবে না। কিচ্ছু না।

ক্রেয়ন।। কিন্তু উপস্থিত তোমার এই বন্ধুরা সাক্ষী, আমি তোমার মঙ্গলের জন্যেই এসেছিলাম। প্রতিদানে তুমি অভিশাপ দিয়েছ আমাকে। কিন্তু এখন তোমাকে একবার যখন ধরতে পেরেছি—

অয়দিপাউস।। তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

ক্রেয়ন।। ভয়? হাঃ হাঃ হাঃ, তোমার কন্যাদুটির কথাই ধরো না? একজনকে তো আগেই নিয়ে গিয়েছি, অন্যটিকেও এখন সেই পথেই যেতে হবে। এবং তার জন্যে পথে-প্রান্তরে কেঁদে বেড়াতে হবে তোমাকে।

অয়দিপাউস।। (আর্ত চিৎকারে) বন্ধুগণ, চুপ করে আছ কেন? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না? তোমরা কি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করবে? দোহাই তোমাদের, ওই পাষণ্ড নাস্তিকটাকে দূর করে দাও তোমরা।

কোরাস।। আগন্তুক, তুমি দ্রুত চলে যাও এখান থেকে। তুমি আগেও অন্যায় করেছ এবং এখনো করে চলেছ। তুমি চলে যাও।

ক্রেয়ন।। সৈনিকগণ— এই তো সময়। মেয়েটাকে বন্দী কর। স্বেচ্ছায় না মানলে বলপ্রয়োগ করবে।

ঝড়ের শব্দ নিকটতর হয়। স্থানীয় মানুষজনের কোলাহলের মধ্যে আন্তিগোনের আর্ত-আবেদন।

আন্তিগোনে।। (চিৎকার করে) হে ঈশ্বর ও মানবসন্তান, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে যেখানে আছ— আমাকে তোমরা রক্ষা করো, রক্ষা করো।

অয়দিপাউস।। হে আথেন্সের মহান জনগণ, আমাদের বাঁচাও। এই দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করো আমাদের।

১ম।। থামো বিদেশি। এই মুহূর্তে যদি এখান থেকে চলে না যাও, আমাদের সঙ্গে কিন্তু তোমার শক্তিপরীক্ষা হবে।

ক্রেয়ন।। সাবধান আথেন্সবাসী, আমার গায়ে সামান্যতম আঁচড় লাগলেও আমার দেশের সঙ্গে তোমাদের দেশের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে, মনে রেখো!

অয়দিপাউস।। (শান্ত গলায়) কেমন? এ কথা আমি আগেই বলিনি?

কোরাস।। মেয়েটাকে ছেড়ে সরে দাঁড়াও।

ক্রেয়ন।। আদেশের সুরে আমার সঙ্গে কথা বোলো না, ওসব আমি সহ্য করি না। যাও— যে যার নিজের কাজে যাও।

কোরাস।। যে যেখানে আছ ছুটে এস দেশবাসী, বিপন্ন স্বদেশভূমি রক্ষার জন্যে সকলে এগিয়ে এসো—

জনকোলাহল উচ্চকিত হতে থাকে। ঝোড়ো বাতাসের চাপা শব্দের মধ্যে আন্তিগোনে ও অয়দিপাউসের হাহাকার শোনা যায়।

আন্তিগোনে।। বাঁচাও বন্ধুগণ, ওই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো আমাদের। রক্ষা করো তোমরা।

অয়দিপাউস।। আন্তিগোনে, তুই কোথায় মা?

আন্তিগোনে।। আমাকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বাবা—

অয়দিপাউস।। দেখি, তোর হাতখানা একবার—

আন্তিগোনে।। পারছি না বাবা, সৈনিকরা আমাকে ধরে রেখেছে। আমি পারছি না—

ক্রেয়ন।। যাও, তোমরা ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাও।

অয়দিপাউস।। হায়রে, কী ভয়ংকর দুর্যোগ! এখন আমি কী করি?

আন্তিগোনের আর্তনাদ দূরে চলে যেতে থাকে। জনকোলাহল বাড়ে। ঝড়ের শব্দও যেন এগিয়ে আসছে।

ক্রেয়ন।। যাও, একবার সঙ্গীবিহীন হয়েই পথ চলো। ভেবেছ কী, দেশ ও দেশবাসীর আহ্বান অগ্রাহ্য করে তুমি পার পাবে— যেখানে আমি তাদের রাজা হয়েই তাদের অনুরোধে নিজে এখানে এসেছি? তুমি এই মুহূর্তে নিজেকে বিজয়ী মনে করলেও, একদিন বুঝতে পারবে তোমার এই দুর্বিনীত অসহিষ্ণুতাই তোমার এই বেদনার্ত পতনের কারণ।

কোরাস।। দাঁড়াও, আর এক পাও এগিয়ো না।

ক্রেয়ন।। আমিও তোমাদের সেই নির্দেশেই দিচ্ছি, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

২য়।। যাদের বন্দী করে নিয়ে গেছ তাদের মুক্ত না করলে আমরাও তো তোমাকে ছেড়ে দেবো না?

ক্রেয়ন।। তাই নাকি? তাহলে তো আর একজনের দিকেও আমাকে হাত বাড়াতে হয়।

৩য়।। কী বলতে চাও?

ক্রেয়ন।। বুঝলে না? ওকেও আমি নিয়ে যাচ্ছি।

কোরাস।। এ কী স্পর্ধা!

ক্রেয়ন।। এই তো আমি ওকে বন্দী করলাম। কে বাধা দেবে আমাকে? তোমরা, না তোমাদের রাজা?

অয়দিপাউস।। আঃ! হাত ছাড়ো নির্লজ্জ শয়তান--

ক্রেয়ন।। চুপ। আর একটা কথাও নয়।

অয়দিপাউস।। না, কোনো আঘাতেই আমাকে আর চুপ করিয়ে দিতে পারবে না। শক্তিরূপা মহাদেবীর সামনে দাঁড়িয়ে অভিশাপ দিলাম, যেমন করে আমার দুই কন্যাকে কেড়ে নিয়ে আমাকে দৃষ্টিহীন করেছ, তেমনি ঈশ্বরের দৃষ্টিপ্রদীপ ওই সূর্যদেবের নির্দেশেই তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা সবাই জন্মান্ধ হবে এবং তোমার সমগ্র জীবনকে নিরানন্দ ও তমসাচ্ছন্ন করে তুলবে।

ক্রেয়ন।। হে আথেন্সের জনগণ, তোমরা সব কিছু লক্ষ করলে?

অয়দিপাউস।। সবাই বিচার করুক, অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আর এক্ষেত্রে আমার আত্মরক্ষার কী উপায় আছে?

ক্রেয়ন।। যদিও আমি একা, তবু কোনো কথা নয়, তোমাকে আমি নিয়ে যাবোই।

অয়দিপাউস।। (অসহায় ক্রন্দনে) আমাকে বাঁচাও-- বন্ধুগণ, আমাকে বাঁচাও--

৪র্থ।। দাঁড়াও। তোমার কথা মতো সব কাজ হবে এমন স্পর্ধা কোরো না বিদেশি--

ক্রেয়ন।। আমি যা ভাবি, তাই করি। চলো--

কোরাস।। কে কোথায় আছ-- হে আথেন্সের অধিবাসী, ছুটে এসো, ছুটে এসো-- আমাদের দেশ বিপন্ন। ওগো আমাদের মহান অধিপতি, বহিঃশত্রুর অত্যাচার থেকে রক্ষা করো রাজা, আমাদের রক্ষা করো--

তুমুল কোলাহল ও আর্তনাদের মধ্যে মেঘগর্জন। তার মধ্যে দূর থেকে রাজা থিসিউসের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

থিসিউস।। একি! কী হয়েছে? কিসের এই আর্তনাদ? রাজ্যোদ্যানে যখন পূজাবেদীতলে বসে সিন্ধুদেবের আরাধনায় নিমগ্ন ছিলাম, তখনই তোমাদের এই ভীত আর্ত চিৎকার আমাকে এখানে টেনে এনেছে। বলো, কী হয়েছে?

অয়দিপাউস।। প্রিয়তম বন্ধু, ওই ব্যক্তির অন্যায় আচরণ আমাদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

থিসিউস।। কার কথা বলছ? একি! এদের এমন আহত করলো কে?

অয়দিপাউস।। ক্রেয়ন। ওই ক্রেয়ন। দেখতে পাচ্ছো না? আমার একমাত্র সম্বল আমার কন্যাদুটিকেও ও ছিনিয়ে নিয়েছে?

থিসিউস।। কী বলছ তুমি?

অয়দিপাউস।। যা শুনছ, তার চেয়ে কঠিন সত্য আর হয় না।

থিসিউস।। এই যদি ঘটনা, তবে তোমাদের মধ্যে কেউ পূজামণ্ডপে ছুটে গিয়ে আমার আদেশ জানিয়ে বলো, তারা যেন দ্রুত অশ্বারোহণে পার্বত্যপথে ছুটে গিয়ে যেভাবেই হোক ওই দুই বন্দিনী এবং লুণ্ঠনকারীদের ধরে আনে।

ক্রেয়ন।। অয়দিপাউস যদি আমাকে আর আমার দেশকে মর্মান্তিক অভিশাপ না দিতো, তাহলে হয়তো শেষপর্যন্ত আমি তাকে পরিত্যাগও করতে পারতাম। আমি বৃদ্ধ বটে কিন্তু ক্রোধমুক্ত নই রাজা। এখানে যদিও বর্তমানে আমি নিঃসঙ্গ ও অসহায়, তবু বলছি, তোমার কোনো অবিবেচক সিদ্ধান্ত আমি বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবো না।

অয়দিপাউস।। নির্লজ্জ, কাপুরুষ ক্রেয়ন, তোমার কি বিবেক বলে কিছু নেই? তুমি হত্যা আর ব্যাভিচারের অভিযোগ তুলে আমাকে অপমান করছ বটে কিন্তু তা সবই যে দেবতার নির্দেশে ঘটেছে তা কি জানো না? তা যদি না হবে, তাহলে আমার জন্মের আগে কেমন করে সে সব দৈববাণী হলো? আমি পাপী নই। সবাই জানে যে ঘৃণ্য ঘটনা ঘটে গেছে তা আমার অজ্ঞাতসারেই ঘটেছে। তার জন্যে তুমি আমাকে দায়ী করতে পারো না।

১ম।। রাজা, নিরপরাধ এই বৃদ্ধের আকুল আবেদনে ওঁকে আমরা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলাম—

থিসিউস।। না না, আর কথা নয়। আমরা এখানে বিতর্ক করছি, আর ওদিকে দস্যুর দল দ্রুত দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে—

ক্রেয়ন।। আমার কী করার আছে? আমি তো এখন সম্পূর্ণ অসহায়।

থিসিউস।। ওর কন্যাদের খুঁজে আনতে তুমিও এখন আমার সঙ্গে যাবে। আমার দেশের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েও যদি তাদের দেখা না পাই, তাহলে আমরা ফিরে আসবো। জেনে রেখো ক্রেয়ন, আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে তোমার কোনো অনুচর দেশে ফিরতে পারবে না।

ক্রেয়ন।। চলো। এখানে বিবাদ নিরর্থক। দেশে ফিরেই আমার ক্ষমতা প্রকাশ করবো।

থিসিউস।। নিশ্চিন্ত থাকো অয়দিপাউস, শপথ করছি, জীবন দিয়েও তোমার কন্যাদের আমি ফিরিয়ে আনবো।

ঝড়ের শব্দের মধ্যে অশ্বক্ষুরধ্বনি মিলিয়ে যেতে থাকে। হার্পের সুর শোনা যায়।

কোরাস।। ধরিত্রীসন্তান ওগো সিন্ধু ও আথেনা,
এই বিপর্যয়ে আজ তোমাদের শরণ নিলাম।
স্বর্গের অধীশ্বর হে দেব জিয়্যুস,
তোমার কৃপায় যেন কলোনাস রক্ষা পায় প্রভু।

ঝড়ের শব্দের মধ্যে অশ্বক্ষুরধ্বনি আবার ফিরে আসে।

২য়।। ওই দ্যাখো বিদেশি, দেবতা আমাদের করুণ আবেদন শুনেছেন।

৩য়।। ওই দ্যাখো, তোমার কন্যারা রাজা থিসিউসের সঙ্গে ফিরে আসছেন।

৪র্থ।। আমাদের মহান রাজা দীর্ঘজীবী হোন।

অয়দিপাউস।। কোথায়? কোথায় তারা? সত্যি বলছ? কোথায় তারা?

কোরাস।। ওই তো— ওই তো আসছে—

মেয়েরা।। বাবা— বাবা—

অয়দিপাউস।। আ— আন্তিগোনে— ইসমেনে—

আন্তিগোনে।। বাবা, একবার, শুধু একটিবারের জন্যেও যদি ঈশ্বরের করুণায় দৃষ্টি ফিরে পেতে, তাহলে যিনি আমাদের তোমার কাছে ফিরিয়ে এনেছেন, সেই মহানুভব মানুষটিকে দেখতে পেতে! রাজা থিসিউস এবং তাঁর প্রিয় সাথীরা আমাদের উদ্ধার করে এনেছেন বাবা।

অয়দিপাউস।। আহা বাছারা আমার! আন্তিগোনে, ইসমেনে— আমার এই হাত দুটো একবার জড়িয়ে ধর তো মা। আর কোনোদিন যে তোদের ছুঁতে পারবো ভাবিনি।

আন্তিগোনে।। আমাদেরও ঠিক তাই মনে হচ্ছিল বাবা।

অয়দিপাউস।। তোরা কোথায় মা?

ইসমেনে।। এই তো, তোমার পাশেই বাবা।

অয়দিপাউস।। আঃ, এখন মরণেও আমার সুখ! আরো কাছে আয় মা। আমাকে জড়িয়ে ধর। আন্তিগোনে, ইসমেনে, তোদের হারিয়ে আমি যে কী নিঃস্ব হয়েছিলাম, কী বলবো! আর কোথাও আমাকে ছেড়ে যাসনে মা। ...হ্যাঁরে, কী ঘটনা ঘটেছিল আমাকে একটু বুঝিয়ে বল তো মা, সংক্ষেপে—

আন্তিগোনে।। এই কাহিনির যিনি নায়ক, আমাদের উদ্ধারকর্তা মহান রাজা থিসিউস, ...তাঁর বীরত্বের কথা তাঁকেই বলতে দাও বাবা।

অয়দিপাউস।। প্রিয় বন্ধু থিসিউস, অপ্রত্যাশিত সম্পদ ফিরে পেয়ে আমি দীর্ঘ সময়

আনন্দের আতিশয্য প্রকাশ করছি দেখে তুমি অবাক হয়ো না রাজা, তোমার দয়াতেই তো এই সুখটুকু আমি পেয়েছি? তোমার এবং তোমার দেশের মঙ্গলের জন্যে আমার যতখানি আন্তরিক প্রার্থনা থাকতে পারে, তা সবটুকুই ঈশ্বর তোমাকে দান করুন। এমন ন্যায়নিষ্ঠ, এমন মহত্ত্ব, সত্যের প্রতি এত আনুগত্য আমি কখনও দেখিনি। তোমার করতল একবার আমাকে চুম্বন করতে দেবে রাজা? ... না না, সরিয়ে নাও তোমার পবিত্র হাত। আমি পাপী, আমার স্পর্শে সব কলুষিত হবে। তুমি শুধু আমার কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ নাও রাজা থিসিউস।

থিসিউস।। তোমার কন্যাদের যে তোমার হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি, এটুকুই যথেষ্ট। তার জন্যে কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দরকার নেই। কেমন করে ওদের ফিরে পেলাম সে কথা ওরাই তোমাকে বলবে। এখন একটা নতুন খবর জানিয়ে তোমার মতামত চাই।

অয়দিপাউস।। কী খবর রাজা?

থিসিউস।। আমি যখন দেবতার পূজা আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম, তখন জানলাম এক বিদেশি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

অয়দিপাউস।। বিদেশি?

থিসিউস।। হ্যাঁ, কেউ চেনে না তাকে। কিন্তু দেখে আমার মনে হল সে তোমার আত্মীয় হতে পারে।

অয়দিপাউস।। আমার আত্মীয়? কী প্রার্থনা তার?

থিসিউস।। সে তোমার সঙ্গে একবার কথা বলতে চায়।

অয়দিপাউস।। (বিস্মিত) একজন বিদেশি আমার সঙ্গে শুধু একবার কথা বলতে চায়?

থিসিউস।। ঠিক তাই। এবং তারপরেই সে স্বদেশে ফিরে যাবে। আচ্ছা, আর্গসে কি তোমার কোনো আত্মীয় আছে যে তোমার খোঁজ করতে পারে?

অয়দিপাউস।। না না, আর নয়। আর বলতে হবে না কিছু।

থিসিউস।। কেন, কী হয়েছে?

অয়দিপাউস।। না, কিছু জানতে চেয়ো না।

থিসিউস।। অয়দিপাউস, আমাকে বলবে না?

অয়দিপাউস।। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারছি, আমার কন্যারা ওই আগন্তুকের কথাই বলছিল।

থিসিউস।। কিন্তু কে সে? সে কি কোনো অপরাধী?

অয়দিপাউস।। সে আমার পুত্র রাজা।

আন্তিগোনে।। তোমার উপর যত নির্মমতা প্রকাশ করে থাকুক, তবু সে তো তোমারই সন্তান? তার প্রতি এমন কঠিন প্রতিশোধ তুমি নিয়ো না

বাবা। শান্ত-শোভন ব্যবহার তো অনেক সময় ক্রোধ পরিহার করতে শেখায়? হয়তো এই সাক্ষাৎকার কোনো নতুন সূত্র দিতে পারে?

অয়দিপাউস।। বেশ, তবে তাই হোক। আমার পক্ষে অসহনীয় হলেও তোমাদের আনন্দের জন্যে আমি সম্মতি দিলাম। কিন্তু রাজা— আমার জীবন বিপন্ন হলে তার দায়িত্ব তোমার রইল।

থিসিউস।। ভয় নেই বৃদ্ধ। অহংকার করিনা, তবে এই কথা দিতে পারি, আমি বিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত তোমার জীবনও সুরক্ষিত থাকবে।

হার্পের সুরে ফুটে ওঠে যেন স্নিগ্ধ শান্তির রূপকল্প।

কোরাস।। এ জীবন যত দীর্ঘ তত তার বেদনাসঞ্চয় ;
মরণের মাঝে থাকে অন্তহীন শান্তির আবাস।
অন্তরের যত আশা, কামনা-বাসনা
কিছু যদি না পায় পূর্ণতা—
তবে কেন কাম্য নয় জীবনের দ্রুত অবসান?
একমাত্র শৈশবের রঙ্গভূমি ছাড়া
কোথায় রয়েছে আর আনন্দের নির্ঝরিণী ধারা?
আহা, আমাদের এই পরদেশি বন্ধুর জীবন
কত না বেদনা আর যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়েছে—
দুঃখের তুষারবাত্যা উত্তরের পর্বতের মতো
গ্রহণ করেছে তার আপন হৃদয়।
হায়, তার জীবনের সন্ধ্যা ও প্রভাত
দুঃখের তিমিরে, যেন রয়েছে নিমগ্ন।

হার্পের সেই সংগীত ক্রমে বিষণ্ণ হয়ে মিলিয়ে যায়।

আন্তিগোনে।। কে যেন আসছে?

অয়দিপাউস।। কে?

আন্তিগোনে।। হ্যাঁ, ঠিক। আমরা যা ভেবেছিলাম। আমাদের ভাই পলোনিসেস। আহা, নিঃসঙ্গ বেচারি, দুই চোখে জল।

পলোনিসেস।। আন্তিগোনে, ইসমেনে—

আন্তিগোনে।। পলোনিসেস—

পলোনিসেস।। তোমরা বলো, আমি এখন কী করি? কার জন্যে চোখের জল ফেলি? আপন দুর্দশায়, না পিতার দুরবস্থায়? হায়, কী হতভাগ্য আমি, এত

দেরি করে এলাম এখানে? না, আমার নির্মমতা স্বীকারে কোনো কুণ্ঠা নেই আমার। হ্যাঁ, আমি দোষী। সাক্ষের প্রয়োজন নেই, স্বেচ্ছায় অভিযুক্ত আমি। পিতা, ভগবান জিয়্যুসের নামে শপথ করে আজ তোমার কাছে কৃপা প্রার্থনা করতে এসেছি। না— মুখ ফিরিও না। কথা বলো। আমার প্রতি বিরূপতার কারণ বুঝতে দাও। ইসমেনে, আন্তিগোনে, তোমরা বুঝিয়ে বলো। বিদেশ থেকে অনেক আশা নিয়ে আমি এসেছি। ওঁর আশীর্বাদ না নিয়ে আমাকে যেন ফিরে যেতে না হয়—

আন্তিগোনে।। হায়রে হতভাগ্য, বলে যাও, আরও বলে যাও। হয়তো তোমার কথার উত্তাপে ওঁর ক্রোধ দয়া হয়ে গলে যেতে পারে।

পলোনিসেস।। বাবা, এখন আমি বলছি, কেন এলাম এখানে। তোমার মতো আজ আমিও পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত। কারণ, তোমার পরিত্যক্ত সিংহাসনে আমার জন্মগত অধিকার দাবি করায় আমার ছোটো ভাই, এতিওক্লেস আমাকে বিতাড়ন করে। এবং আশ্চর্য, সেজন্যে একবিন্দু রক্তপাতও হয়নি, সামান্য প্রতিবাদও করেনি কেউ। জনগণ তাকেই সমর্থন করে। তখন আমার এই ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ জানতে দৈবজ্ঞের শরণ নিলাম। এবং জানলাম এর মূলে আছে আমার প্রতি দেবতার অভিসম্পাত। অতঃপর আর্গসে পৌঁছে আদ্রেপাসের কন্যাকে বিবাহ করে ওঁদের বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হলাম। তখন তাদেরই সহযোগিতায় আমি থেবাই আক্রমণের উদ্যোগ করেছি। আমার সাতজন মহান বীর সুহৃদ আমাকে অনুসরণ করে সাতটি সৈন্যদল নিয়ে সাত দিক থেকে থেবাই অবরোধ করবে। যারা আমাকে অন্যায়ভাবে সিংহাসনচ্যুত করেছে, আমি শপথ করছি, হয় তাদের বিতাড়িত করবো, না হয় মৃত্যুবরণ করবো বীরের সম্মানে। আমার এবং আমার বন্ধুদের একান্ত মিনতি— পিতা, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। যদি তুমি তোমার মাতৃভূমিকে, তোমার জন্মভূমিকে ভালোবাসো, তবে ক্রোধ পরিহার করে, তোমার, এবং আমার, ভগ্নীদের দুর্দশার কথা চিন্তা করে আমাদের সঙ্গে চলো। দেখ, আমরা দুজনেই আজ নির্বাসিত, লাঞ্ছিত। তোমাকে আমাকে যারা এই যন্ত্রণা দিয়েছে, তারাই নির্বিঘ্নে রাজত্ব করছে থেবাইয়ে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই আমার এই বিদ্রোহ পিতা। তোমার আশীর্বাদে আমি ওদের পরাস্ত করবো। তারপর যথাস্থানে তোমাকে স্থাপন করে আমার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করবো। আমি জানি, তোমার সম্মতিই এনে দেবে আমাকে বিজয়ীর সম্মান, এবং প্রত্যাখ্যানেই মৃত্যু।

কোরাস।। আমাদের মহান রাজার সম্মানে অন্তত তুমি ওকে তোমার কথা বলো অয়দিপাউস।

অয়দিপাউস।। বন্ধুগণ, এই কথা রাজা থিসিউসের ইচ্ছায় বলছি— অন্যথায় আমি কোনো জবাবই দিতাম না। জানি, আমি এখন যা বলবো তাতে ওর কোনো লাভ হবে না— তবু বলছি। শোনো পলোনিসেস, তোমার ভাই সিংহাসনে আরোহণ করার আগেই তুমি তা দখল করে আমাকে, তোমার এই অন্ধ পিতাকে, রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছ। গৃহহীন পথের ভিক্ষুক করেছ। এখন নিজে সেই দুর্দশায় পড়ে আমার কাছে এসে অশ্রু বিসর্জন করছ। যদি তোমার সৈন্যেরা থেবাই আক্রমন করে তবে ঈশ্বরের বিরূপতা তাদের সহ্য করতে হবে। থেবাই তুমি জয় করতে পারবে না। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, বিপুল রক্তক্ষয় হবে এবং তোমাদের দু-ভায়েরই পতন ঘটবে। মৃত্যু ও অন্ধকারের মহাদেবীর কাছে প্রার্থনা, আমার এ অভিশাপ ফলবতী হোক। যাও, তোমার বন্ধুদের জানাও— অয়দিপাউস তাঁর দুই পুত্রের উদ্দেশে এই শুভেচ্ছা জানিয়েছে। যাও—

থিসিউস।। না না, আর কোনো কথা নয়। তুমি অপরাধী। ফিরে যাও। দ্রুত চলে যাও এখান থেকে।

পলোনিসেস।। হায়, আমার সব কিছু বিফল হলো। ফিরে গিয়ে এখন আমি কী বলবো বন্ধুদের? কিসের আশায় তবে আর্গস থেকে এত কষ্ট করে এখানে ছুটে এলাম? না না, এ কথা ওদের জানানো সম্ভব নয়। ফিরে যেতেও বলতে পারবো না। আমার দুর্ভাগ্যের বোঝা নিঃশব্দে আমাকেই বহন করতে হবে। লক্ষ্মী বোনেরা আমার, এই নিষ্ঠুর অভিশাপ যদি সত্যি হয় তবে তোমরা থেবাইয়ে ফিরে গেলে আমার এই অভিশপ্ত শবদেহ দয়া করে সমাহিত করো। বিদায় নেবার আগে তোমাদের কাছে এইটুকুই আমার একান্ত মিনতি।

আন্তিগোনে।। পলোনিসেস, এখনো সময় আছে। তোমার আমন্ত্রিত সেনাদলকে এখনো ফিরে যেতে বলো আর্গসে। স্বদেশকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করো।

পলোনিসেস।। না। ফিরে যাবার অর্থ বড়ো ভাই হয়ে ছোটো ভাইয়ের লাঞ্ছনা সহ্য করা।

আন্তিগোনে।। না না, তা না হলে যে ধ্বংস অনিবার্য হবে! পিতার অভিশাপে তোমরা পরস্পরের হাতে মৃত্যুবরণ করবে।

পলোনিসেস।। আমাদের মৃত্যুই তাঁর কাম্য। বিদায়, বিদায়—

আন্তিগোনে।। (ক্রন্দন) পলোনিসেস, ভাই—

হার্পের সুরে করুণ সংগীত ছড়িয়ে পড়ে।

কোরাস।। পরবাসী অন্ধ এই বৃদ্ধের বিক্ষোভ
ক্রমান্বয়ে বিপর্যয় ডাকে—
হয়তো বা তাই ছিল নিয়তির নির্মম বিধান।

মেঘগর্জন ও বজ্রপাতের শব্দ।

অয়দিপাউস।। ইসমেনে, আন্তিগোনে, তোরা কোথায়?

মেয়েরা।। এই তো বাবা—

অয়দিপাউস।। আমার কাছে আয়। — কে আছ, দয়া করে একবার তোমাদের মহান রাজাকে এখানে আসতে অনুরোধ জানাবে?

মেয়েরা।। কেন বাবা? কেন তুমি ডাকছ তাঁকে?

অয়দিপাউস।। শুনতে পাচ্ছিস না, ওই মেঘগর্জন? ওই বজ্রপাতের শব্দ? আমাকে মরণের হাতছানি দিচ্ছে—

পুনরায় বজ্রপাতের শব্দ।

মেয়েরা।। না না—

অয়দিপাউস।। যাও যাও, দ্রুত খবর দাও রাজাকে।

১ম।। এ কী ভয়ংকর শব্দ!

২য়।। আকাশে কি অগ্নিবানও শুরু হলো?

৩য়।। এ কিসের সংকেত?

৪র্থ।। দেবরাজ জিয়ুস, দয়া করো, দয়া করো আমাদের।

অয়দিপাউস।। এ আমার মৃত্যুর সংকেত। ইসমেনে, আন্তিগোনে, তোদের হতভাগ্য পিতার মৃত্যুলগ্ন আসন্ন।

আন্তিগোনে।। কেমন করে তুমি জানলে বাবা?

অয়দিপাউস।। অন্তরের আলোয় আমি সব দেখতে পাই মা। রাজা কোথায়? শীঘ্র ডাকো— সময় নেই।

ঘন ঘন বজ্রপাতের শব্দ চলতে থাকবে।

১ম।। ওই আবার সেই প্রচণ্ড বজ্রপাত!

২য়।। দয়া করো, ঈশ্বর, দয়া করো—

৩য়।। বিপর্যয়ের এই ঘন তমসার মধ্য থেকে আমাদের রক্ষা করো—

৪র্থ।। আমাদের দেশকে রক্ষা করো প্রভু—

অয়দিপাউস।। *কোথায় তোমাদের রাজা? কত দূরে? চেতনা লুপ্ত হবার আগে তাঁর সঙ্গে কি দেখা হবে না আমার?*

আন্তিগোনে।। রাজার আগমনের জন্যে কেন তুমি এত ব্যাকুল বাবা? কী চাও তাঁর কাছে? কোনো আশ্বাস?

অয়দিপাউস।। আমার জন্যে তিনি যা করেছেন সে জন্যে কৃতজ্ঞ আমি।

কোরাস।। মহারাজ, দয়া করে একবার ছুটে আসুন। আমাদের এই বিদেশি অতিথির শেষ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ঘন ঘন বজ্রপাতের শব্দ

থিসিউস।। এমন করে কেন আমাকে তোমরা আহ্বান করছ? প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যায় আচ্ছন্ন চারিধার। দেবতার চক্রে উদ্ভাসিত বিদ্যুৎঝলক। নিশ্চয়ই কোনো জটিল সমস্যা আসন্ন?

অয়দিপাউস।। এসেছ? এসেছ রাজা? আমার অভিলাষ পূর্ণ করেছ? রাজা, তোমার উপর ঈশ্বরের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক।

থিসিউস।। কী হয়েছে অয়দিপাউস?

ঘন ঘন বজ্রপাতের শব্দ ঝড় ও মেঘের গর্জন।

অয়দিপাউস।। দেবতার নির্দেশ পেয়েছি। আমার জীবনাবসানের সময় এসেছে। এই বজ্র আর উল্কাপাত তারই ইঙ্গিত। তাই তোমার এবং তোমার দেশের জন্যে আমার প্রতিশ্রুতি পালন করতে চাই রাজা।

থিসিউস।। হে লাইয়সের সন্তান অয়দিপাউস, এক্ষেত্রে আমার কী করণীয় বলো?

অয়দিপাউস।। রাজা, এখন আমি তোমাকে যা বলবো, আমার ইচ্ছা, তুমি ও তোমার দেশের কল্যাণের জন্যে তা গোপন রাখবে। আমি চাই পৃথিবীর কেউ যেন কখনও তা জানতে না পারে। দেখতে না পায় আমার এই সমাধিক্ষেত্র। জেনে রাখো, এই গুপ্তস্থান তোমাকে এমন মহত্তর শক্তি দান করবে যার কাছে তোমার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ক্ষমতা ম্লান হয়ে যাবে। তুমি আমরণ একথা কারো কাছে প্রকাশ কোরো না। এমন কী আমার প্রাণাধিক প্রিয় কন্যাদের কাছেও নয়। শুধুমাত্র তোমার মৃত্যুকালে তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র বা সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে বলে যেয়ো এবং তোমার বংশপরম্পরায় যেন সেই ধারা প্রবাহিত হয়।

আ ... আন্তিগোনে— ইসমেনে, আমার কাছে আয়। আমাকে অনুসরণ করো। আপন অন্তরের আলোকে আজ আমি তোমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবো। ... চলো রাজা...

লাঠির ঠুকঠুক শব্দ দূরে চলে যেতে থাকে। ঝড় মেঘগর্জন ও মুহুর্মুহু বজ্রপাতের শব্দ।

কোরাস।। হে তমসার মহাদেবি,
তোমাদের বেদীমূলে
আমাদের সম্মিলিত এই প্রার্থনা ঃ
মৃত্যুপথযাত্রী ওই পরবাসী বন্ধু যেন
আর কোনো বেদনা না পান।
কত না দুঃখ আর নিরাশায় অতিক্রান্ত
তাঁর ওই সুদীর্ঘজীবন। তোমাদের শুভাশিস
তাঁকে শান্তি দিক। মুক্তি পাক অভিশপ্ত প্রাণ।
নরকের প্রহরীরা, শোনো, অনুনয়—
আর কোনো যন্ত্রণা দিও না তাঁকে।
হে অনন্ত নিদ্রার ঈশ্বর,
তোমার কোমল করপল্লবের ছায়া
আমাদের ভাগ্যহত পথিকবন্ধুকে
নিয়ে যাক স্বর্গের শান্তিনিবাসে।।

অ ভি ন য়া ং শে

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু ঘোষ, শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, রত্না গোস্বামী ও শেলী পাল

প্রযোজনা \ জগন্নাথ বসু

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৭৬ – ১৯৩৮)

প থে র দা বী

নিমাই. অপূর্ব. জগদীশ. সব্যসাচী. তেওয়ারি.
রামদাস. ব্রজেন্দ্র. শশী. ভারতী. সুমিত্রা

সূত্রপাতে 'ও আমার দেশের মাটি' গানের সুরের মধ্যে নদীর ছলছল শব্দ। দূর থেকে জাহাজের ভোঁ। পথ দিয়ে লোকজনের চলাচল, যানবাহনের শব্দ ও গুঞ্জন শোনা যাবে।

নিমাই ।। আরে কে? অপূর্ব না?

অপূর্ব।। (অবাক) কী আশ্চর্য! নিমাইকাকা?

নিমাই।। থাক থাক বাবা। তা তুই হঠাৎ সাতসমুদ্দুর পেরিয়ে এই রেঙ্গুনে? কবে এলি?

অপূর্ব।। এই তিন-চারদিন হলো। আমি এখানে বোথা কোম্পানির ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে এসেছি কাকা।

নিমাই।। বেশ বেশ। তা বাড়ির সব কুশল তো?

অপূর্ব।। আছেন সবাই একরকম। আপনি?

নিমাই।। আমারও চলে যাচ্ছে। তোর বাবার দয়ায় এই পুলিশের চাকরিটা পেয়েছিলাম বলেই না এই নিমাই দারোগার এখনো দুটি অন্নসংস্থান হচ্ছে। ... আমাদের কি আর স্থানকাল বলে কিছু আছে বাবা? ব্রিটিশের রাজত্ব। রেঙ্গুন তো দূরস্থান, সাহেবরা বললে মরতে মরতে নরকে গিয়েও হাজিরা দিতে হবে।

অপূর্ব।। আপনাকে এখানে দেখতে পেয়ে কী যে ভালো লাগছে কাকা। এই

নির্বান্ধব শহরে এত দুশ্চিন্তায় ছিলাম—

নিমাই।। ভয় কি রে ব্যাটা, আমি তো আছি। তা কোথায় চলেছিস?

অপূর্ব।। তেমন কোথাও না। অচেনা শহর তো? রোজ তাই একটু ঘুরে ঘুরে চিনে নেবার চেষ্টা করি।

নিমাই।। গুড। তাহলে চল আমার সঙ্গে। যেতে যেতে তোদের বাড়ির খবরাখবর শুনি একটু। কতকাল যে যোগাযোগ নেই—

অপূর্ব।। কোথায় যাবেন এখন?

নিমাই।। জাহাজঘাটায়। এক মহাপুরুষের আগমনের কথা আছে।

অপূর্ব।। মহাপুরুষ?

নিমাই।। হ্যাঁ, তাঁর সংবর্ধনার জন্যেই তো দেশ ছেড়ে আমাকে এতদূরে আসতে হয়েছে বাবা। এখন প্রভুর মর্জি, দেখা দেবেন কি দেবেন না!

অপূর্ব।। আপনি যখন এসেছেন, তখন মহাপুরুষটি বাঙালি নিশ্চয়ই? খুনী আসামি নাকি?

নিমাই।। (হাসে) তিনি যে কী এবং কী নন, তা দেবা ন জানন্তি আর আমি তো কোন ছার। এর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো চার্জ নেই, আবার যা আছে তা পেনাল কোডের কোহিনুর! ওঃ! একেবারে চরকি পাক খাইয়ে ছাড়ছে ব্যাটা?

অপূর্ব।। বুঝেছি, পোলিটিক্যাল আসামি ইনি।

নিমাই।। ছাই। ও সব ওর কাছে শিশু। ইনি হলেন রাজবিদ্রোহী, যাকে বলে গিয়ে রাজার শত্রু। বলিহারি সেই প্রতিভাকে, যিনি ওর নাম দিয়েছিলেন সব্যসাচী।

অপূর্ব।। সব্যসাচী? কই এ নাম তো আগে শুনিনি?

নিমাই।। শুনবি কোত্থেকে? ওঁর কি আর একটা নাম? অর্জুনের মতো কোথায় যে কখন উদয় হচ্ছেন—

অপূর্ব।। বলেন কী?

নিমাই।। শুধু এই? শুনেছি দশ-বারোটা ভাষা নাকি এমন বলতে-কইতে পারেন যে বিদেশি লোকের পক্ষেও চেনা ভার, ইনি কোন অঞ্চলের!

অপূর্ব।। আশ্চর্য!

নিমাই।। লোকে তো আরো কত কী বলে। ও নাকি জার্মানি থেকে ডাক্তারি পাশ করেছে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং, বিলেতে আইন, আমেরিকা থেকেও হয়তো কিছু করে থাকবে। বুঝি, সবই রটনা। তবে যা রটে তার কিছু তো বটে?

অপূর্ব।। এতো অসাধারণ প্রতিভা কাকাবাবু?

নিমাই।। কিন্তু কোন কাজে এলো বাবা? আমার তো মনে হয় এর রক্তের মধ্যে ভগবান এমন আগুন জ্বেলে দিয়েছেন যে মশালের মতো নিজে জ্বলতে

জ্বলতে চতুর্দিক জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তবে নিভবে। বাপরে বাপ! এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে আমাদের বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা তো ভেবে পাইনে। (জাহাজের ভোঁ) ওই জাহাজ ভিড়ছে। চল চল, জেটির দিকে এগোনো যাক।

দৃশ্যান্তর

জাহাজঘাটা। জনকোলাহল।

অপূর্ব।। নিমাইকাকা?

নিমাই।। বল।

অপূর্ব।। আজ কি আপনি ওঁকে অ্যারেস্ট করবেন?

নিমাই।। আগে তো পাই।

অপূর্ব।। ধরুন পেলেন?

নিমাই।। (হাসেন) অত সহজ না রে বাবা। শেষমেস দেখবো হয়তো অন্য কোনো পথ দিয়ে তিনি সটকে পড়েছেন!

অপূর্ব।। তাই যেন হয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনারা যেন তাঁকে ধরতে না পারেন।

নিমাই।। (সস্নেহে) বোকা ছেলে! পুলিশের কাছে কি এসব কথা বলতে আছে? যা— তোর আবার অফিসের বেলা হয়ে যাবে। নতুন চাকরি। দেরি না হওয়াই ভালো।

অপূর্ব।। না কাকা, এমন একজন মহাপুরুষকে দেখার লোভ সামলাতে পারছি না।

নিমাই।। তাহলে থাক। তবে দেখা পাবি কিনা জানি না।

দৃশ্যান্তর

থানার পরিবেশানুগ শব্দ।

জগদীশ।। বসো বসো, ওইখানে বসো সবাই।

গিরিশ।। (কাশতে কাশতে) সেলাম হুজুর—

অপূর্ব।। এরা কারা কাকাবাবু? চেহারা দেখে তো মনে হয় না এদের চোদ্দপুরুষে কেউ এনার্কিস্ট ছিল!

জগদীশ।। এরা সবাই বর্মা তেল কোম্পানির মজুর। তেলের খনিতে কাজ করতো। এই কজনাই বাঙালি।

নিমাই।। হ্যাঁ, রিপোর্টে যখন বাঙালি বলা আছে তখন— এই যে, কী নাম হে

তোমার?

গিরিশ।। (কাশতে কাশতে) আজ্ঞে গিরিশ মহাপাত্র হুজুর।

নিমাই।। (হাসে) ওরে বাবা, শুধু পাত্র নয়, একেবারে মহাপাত্র?

গিরিশ।। (কাশতে কাশতে) আজ্ঞে বাপ-মায়ের দয়ায় ওই পদবিটুকুই তো সম্বল হুজুর? ওর জন্যেই পাঁচজনার কাছে একটু খাতির পাই, নইলে আমরা কি আর ধর্তব্যের মধ্যে?

নিমাই।। তা তো বুঝলাম। তা এত জায়গা থাকতে হঠাৎ রেঙ্গুনে মরতে এলে কেন বাপ?

গিরিশ।। বরাত হুজুর। (কাশতে থাকে) এই মরণের কাশিই আমার দফারফা করলে! তা নইলে এই বাজারে অমন সাধের চাকরিটা আমার— আহাহা...

জগদীশ।। এই, কাশতে কাশতে মেঝেতে আবার থুথুটুথু ফেলো না যেন।

গিরিশ।। আজ্ঞে না হুজুর। কাঠ কাশি। (প্রচণ্ড কাশে) কাশতে কাশতে ফুসফুস ছিঁড়ে যায়, তবু এককোঁটা কিছু বেরোয় না।

নিমাই।। বলছ— তেলকলের মজুর, অথচ তোমার সাজপোশাকের ঘটা দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি ময়ূর ছাড়া কার্তিকটি হে গিরিশ?

গিরিশ।। আজ্ঞে মনের সাধ মনেই রইলো হুজুব। অভাবী মানুষ। কতটুকুই বা মেটাতে পারলাম!

কাশতে থাকে।

অপূর্ব।। এ লোক সে লোক নয় কাকাবাবু, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

নিমাই।। সকলের জিনিসপত্র সার্চ করেছ জগদীশ?

জগদীশ।। হ্যাঁ স্যার। কিছুই পাইনি।

নিমাই।। তাহলে আর কী হবে, ছেড়ে দাও। যত উটকো ঝঞ্ঝাট! ... এটি আবার কাকে আমদানি করলে হে?

জগদীশ।। এটিও বাঙালি স্যার। ট্রেনে আসছিল, টিকিট নেই। টিকিটবাবু জমা করে দিয়ে গেছেন থানায়।

নিমাই।। আরে দূর, একে তো বেহেড মাতাল হয়ে প্রায়ই পথেঘাটে ঘুরতে দেখি। পয়লা নম্বর লোফার। তবে বেহালাটা বাজায় ভালো।

শশী।। ঠিক ধরেছেন স্যার।

নিমাই।। শাট আপ। নাম কী?

শশী।। শশীকান্ত স্যার।

অপূর্ব।। এর ট্রেন ফেয়ার চার্জ কত জগদীশবাবু?

নিমাই।। (হাসেন) কেন, তুই দিবি নাকি?

অপূর্ব।। বাঙালির ছেলে, সামান্য কারণে বিদেশবিভুঁইয়ে হাজতে পচবে—

শশী।। তিন টাকা স্যার। এই বেহালাটা বাঁধা রেখে দিন, পরে ছাড়িয়ে নেবো?

গিরিশ।। (সাগ্রহে) বেহালা বাঁধা দেবেন বাবু? (প্রচণ্ড কাশে) ... না, হল না!

নিমাই।। কী হল মহাপাত্র?

গিরিশ।। হল না হুজুর, ছ-আনা কম পড়ে গেল।

শশী।। ওতেই হবে। আমার কাছে সাত আনা আছে। তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও ভাই, পয়সা জোগাড় করে ঠিক ছাড়িয়ে নেবো।

নিমাই।। তুমি বেহালা নিয়ে কী করবে হে গিরিশ?

শশী।। (কাশতে কাশতে) আজ্ঞে অনেককালের শখ ছিল হুজুর। পয়সার অভাবে কিনতে পারিনি। এখন যখন শস্তায়গণ্ডায় একটা মওকা পেলাম—

নিমাই।। হুম্। তা রুমাল বের করতে গিয়ে তোমার পকেট থেকে কী যেন একটা পড়লো?

গিরিশ।। কই? ... আরে ছি ছি—

জগদীশ।। এটা তো গাঁজার কলকে দেখছি। তুমি গাঁজা খাও?

গিরিশ।। আজ্ঞে না হুজুর। (কাশতে কাশতে) পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, রেখে দিয়েছি, যদি কারো কাজে লাগে—

নিমাই।। বটে? দেখি হাত? এই তো গাঁজা টেপার দাগ স্পষ্ট। তবে যে বললে খাইনে?

গিরিশ।। মাইরি বলছি হুজুর। (কাশতে কাশতে) তবে মিথ্যে বলবো না, ইয়ার বন্ধুরা বললে সেজে দিই মাঝেমধ্যে।

নিমাই।। আহারে, কী দয়ার শরীর! নিজে খায় না, সেজে দেয়! ও পকেটে কী আছে?

গিরিশ।। এই দেখুন হুজুর— একটা কম্পাস, একটা ফুটরুল— (কাশতে থাকে) মিস্তিরির কাজ করি তো? — মাপজোপের কাজে লাগে।

জগদীশ।। কিন্তু তুমি চুলে কী মেখেছ বলো দেখি? গন্ধে মাথা ধরিয়ে দিলে?

গিরিশ।। (লজ্জিত) আজ্ঞে নেবুর তেল হুজুর। (কাশে) কাশতে কাশতে মাথা তেতে যায় তো?

নিমাই।। ঠিক আছে, এখন এসো। তুমিও যাও হে শশীকান্ত, খালাস।

শশী।। থ্যাঙ্ক য়্যু স্যার।

গিরিশ।। সেলাম হুজুর।

কাশতে কাশতে চলে যায়।

দৃশ্যান্তর

অপূর্বর বাড়ি।

তেওয়ারি।। (চিৎকার করে) নেমে আয় ব্যাটা, হিম্মত থাকে তো নিচে নেমে আয়। এই লাঠি দিয়ে যদি তোর ঠ্যাং না ভাঙি তো আমার নামে কুত্তা পুষিস। এতবড়ো সাহস, তুই কিনা বামুনের মুখের অন্নে নর্দ্দমার জল ফেলিস? তোর প্রাণে কি নরকের ভয়ও নেই রে? অবশ্যি থাকবেই বা কী করে? জাতে মেলেচ্ছ তো? তোদের কি আর ধর্মাধর্ম জ্ঞান আছে? মরবি মরবি, বামুনের শাপে সবংশে নিপাত যাবি।

অপূর্ব।। (দূর থেকে কাছে আসে) কী হল রে, তেওয়ারি? কাকে এমন করে শাপশাপান্ত করছিস?

তেওয়ারি।। এসেছ দাদাবাবু? দ্যাখো এসে— উপরতলার ওই মেলেচ্ছ সাহেবটা কী সব্বোনাশ করেছে আমাদের! ওই ব্যাটাকে আজ আমি খুন করবো। নেমে আয় হারামজাদা—

অপূর্ব।। আঃ! কী হচ্ছে তেওয়ারি? মুখখারাপ করিসনে। বিদেশবিভুঁই। মানহানির মোকদ্দমা করলে দাঁড়াবি কোথায়?

তেওয়ারি।। আর দাঁড়ানো। ওই ব্যাটাচ্ছেলে আমাদের এখন কোথায় দাঁড় করিয়েছে দেখবে চলো না? সারাদিনের এত খাটুনি আমার! হায় হায় হায়—

অপূর্ব।। অমন হায় হায় না করে কী হয়েছে বলবি তো?

তেওয়ারি।। কী বলবো দাদাবাবু— নিচে আমি রান্না করছি, আর আমাদের ওপর তলায় মদ খেয়ে ওই সাহেবটা উদোম নাচ জুড়েছে। কাঠের বাড়ি, শব্দে মনে হচ্ছে এই বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো—

অপূর্ব।। তারপর?

তেওয়ারি।। আমি তখন চেঁচিয়ে বারন করতেই সাহেব রেগেমগে ইঞ্জিরিতে আমাকে গাল দিতে লাগলো। শুধু তাই? ক্ষেপে গিয়ে যত রাজ্যের নোংরা জল ঢেলে দিলো পাটাতনের ওপর থেকে।

অপূর্ব।। সে কী?

তেওয়ারি।। তবে আর বলছি কী? দেখবে চলো না, খাবারদাবার থেকে শুরু করে জামাকাপড় বিছানাপত্তর সব কেমন থই থই করছে! তার ওপর আবার চাবুক আছড়ে আছড়ে কী শাসানি মাতালটার!

অপূর্ব।। (দীর্ঘশ্বাস) কপাল রে তেওয়ারি, ভগবান না মাপালে বোধহয় এমনিই হয়।

তেওয়ারি।। এ বাড়ি তুমি ছেড়ে দাও দাদাবাবু, অফিসে বলে অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করো।

অপূর্ব।। দেখি। ... তুই যদি গালমন্দ না করে তক্ষুনি ঘা কতক কসিয়ে দিতিস তো সযুত হয়ে যেত ব্যাটা।

তেওয়ারি।। তুমি বলো কী দাদাবাবু? ওরা হলো গে সাহেব—

অপূর্ব।। থাম থাম। কালাসাহেব!

তেওয়ারি।। কালা হোক, ধলা হোক, সাহেব সাহেবই। রাজার জাত। আমরা কি ওদের গায়ে হাত তুলতে পারি?

অপূর্ব।। আমি পারি। দেখি লাঠিটা—

তেওয়ারি।। সে কী! তুমি মারামারি করবে নাকি? না না—

অপূর্ব।। থাম। অন্যায় যে করে তাকে প্রশয় দেওয়াও পাপ। এর একটা বিহিত না করে আমি ছাড়বো না।

কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

তেওয়ারি।। দাদাবাবু, ওই শোনো, সাহেবটা বোধহয় উপর থেকে নেমে আসছে।

অপূর্ব।। আসুক। ভালোই হল। বোঝাপড়াটা এখানেই হবে।

সিঁড়িতে শব্দ এগিয়ে আসছে।

তেওয়ারি।। এ কী দাদাবাবু, এ যে মেয়েছেলে দেখছি?

অপূর্ব।। তাইতো! ... শুনুন— আপনি কি ওপরে থাকেন?

ভারতী।। (পায়ের শব্দ থামে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

অপূর্ব।। আমি ওপরের ওই মাতাল সাহেবটার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

ভারতী।। কেন বলুন তো?

অপূর্ব।। তাঁকে দেখাতে চাই, তিনি আমাদের কী পরিমাণ ক্ষতি করেছেন। ওঁর বরাত ভালো, সেই সময়ে আমি বাড়ি ছিলাম না।

ভারতী।। থাকলে কি মারামারি করতেন? ও— সেইজন্যেই বুঝি তেওয়ারির লাঠি নিয়ে উপরে উঠছিলেন?

অপূর্ব।। মারামারি করা আমার কাজ নয়। তবে কেউ অন্যায় অত্যাচার করলে তাকে শাস্তি দিতেও আমার হাত কাঁপবে না। আচ্ছা, বলুন তো— আমরা ওর কী ক্ষতি করেছি?

ভারতী।। আমার বাবার এই ব্যবহারের জন্যে আমি তাঁর হয়ে ক্ষমা চাইছি।

অপূর্ব।। (অবাক) আপনার বাবা? ওই সাহেব? আপনাকে তো বাঙালি বলেই মনে হচ্ছিল।

ভারতী।। ঠিকই ধরেছেন। আমি আর মা বাঙালি। আমরা ক্রিশ্চান।

অপূর্ব।। ও— জাতধর্ম সব খুইয়েছেন?

ভারতী।। ও কথা থাক। এই ফলগুলো মা আপনাদের পাঠিয়েছেন।

অপূর্ব।। কেন?

ভারতী।। আজ আমাদের পর্বদিন। তাছাড়া আমাদের জন্যে আপনাদের খাওয়া হলো না। আমরা সত্যিই লজ্জিত।

অপূর্ব।। আপনার মাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এগুলো আমাদের দরকার হবে না। আমাদের ঘরে অন্য খাবারও আছে।

ভারতী।। বুঝতে পারছি, আপনারা বিধর্মীদের ঘৃণা করেন। কিন্তু এসব তো বাজারের ফল। এতে দোষ কী?

তেওয়ারি।। এঃ! — গরু মেরে জুতো দান! দরকার হলে বাজার থেকে আমি ফল কিনে আনবো। ওসব মেলেচ্ছদের আনা জিনিস আমাদের চলবে না ঠাকরুণ।

অপূর্ব।। আঃ তেওয়ারি! কথা বলতে না জানলে কথা বলবি না। ওর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম। আমরা আচার বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্থ, কিন্তু অসভ্য নই।

ভারতী।। তা হবে। তবু বাবার ব্যবহারের জন্যে আমি আবার ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি। আজ উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাল সকালে উনিও এসে ক্ষমা চাইবেন। আসলে আজ উনি অসুস্থ ছিলেন।

কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়।

অপূর্ব।। ছি ছি, কী করলি বল তো? কী মনে করলেন উনি?

তেওয়ারি।। রাখো তো! সব কিছু নষ্ট করে এখন দয়া দেখাতে এসেছেন! আমরা যেন ওই ব্যাঙের ভরসায় পুকুর কেটেছি।

অপূর্ব।। চুপ কর। ভুল মানুষ মাত্রেই করে। কিন্তু তার জন্যে যখন অনুশোচনা জাগে তাতেই তার মুক্তি। এসব তুই বুঝবিনে। এই যে ওঁর ক্ষমা চাওয়া, মিনতি, লজ্জা— এর বুঝি কোনো দাম নেই? শুধু আচারবিচারটাই বড়ো? ছিঃ!

দৃশ্যান্তর

অপূর্বর অফিস।

রামদাস।। নমস্তে বাবুজি, আমাকে ডেকেছেন?

অপূর্ব।। আজ্ঞে হ্যাঁ, আসুন রামদাসজি, নমস্তে।

রামদাস।। বাবুজি, আমার পুরা নাম রামদাস তলোয়ারকর। তলোয়ার শব্দের একটা

অর্থ আছে জানেন তো? তাই সম্বোধনের জন্যে নামের শেষ অংশটাই আমার পছন্দ।

অপূর্ব।। তাই হবে মিঃ তলোয়ারকর। বসুন।

রামদাস।। ধন্যবাদ। যাক, এখানে আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো বাবুজি?

অপূর্ব।। এমনিতে চলে যাচ্ছে একরকম। বিদেশি মানুষ, সড়গড় হতে তো একটু সময় লাগবেই। তবে যে বাসায় আমাকে তুলে দিয়ে এলেন সেখানে কিন্তু আমার বাস করা সম্ভব নয়।

রামদাস।। কেন, কী হলো আবার?

অপূর্ব।। আমার বাসার ওপরতলায় এক মাতাল ফিরিঙ্গি থাকে, বুঝলেন? দেশি খ্রিস্টান। মাদ্রাজি কী গোয়ানিজ হবে—

রামদাস।। তাতে কী?

অপূর্ব।। সেই কথা বলবো বলেই তো ডেকেছি। সে তো ভয়ংকর উপদ্রব শুরু করেছে। গতকাল সারাদিন আমাদের মাথার ওপর নাচানাচি করেছে। নোংরা জলটল ফেলে আমাদের খাবারদাবার সব নষ্ট করেছে। গালমন্দ করেছে, শাসাচ্ছে। ও বাড়িতে আমার থাকা চলবে না মিঃ তলোয়ারকর— আপনি অন্যত্র ব্যবস্থা দেখুন।

রামদাস।। তা এসব আপনি চুপচাপ দেখে গেলেন বাবুজি?

অপূর্ব।। আমি তো তখন ছিলাম না। তবে ফিরে এসে ওর সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে অনেক ডাকাডাকি করলাম, কিন্তু লোকটা নামলোই না।

রামদাস।। বাঃ! নামলো না বলে আপনিও মুখ বুজে ফিরে এলেন?

অপূর্ব।। কী আর করতে পারি বলুন? ওর ঘরের মধ্যে ঢুকে তো তাই বলে আর হামলা করতে পারি না?

রামদাস।। কী জানি। আমি হলে কিন্তু ওকে ক্ষমা না চাইয়ে ছাড়তাম না।

অপূর্ব।। কী করে?

রামদাস।। সোজা ওর ঘরে ঢুকে ওর ঘাড়টা ধরে নাকে খত দেওয়াতাম।

অপূর্ব।। সর্বনাশ! তাতে তো ক্রিমিন্যাল অ্যাসল্ট হতো?

রামদাস।। হলে হতো। চলুন তো, আমিও যাই আপনার সঙ্গে?

অপূর্ব।। না না, অত ঝামেলার দরকার নেই। তার চেয়ে মানে মানে এখান থেকে সরে পড়াই ভালো।

রামদাস।। (মৃদু হাসে) বাবুজি, কোথায় সরবেন? দেখছেন না, সারা দেশ জুড়েই তো এই অন্যায় আর অবিচার। সরতে সরতে শেষে যে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে।

মুহূর্তকাল বিরতি। শুধু সংগীতের মধ্য দিয়ে মানসিক অস্থিরতা ও দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটবে।

অপূর্ব।। আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি মিঃ তলোয়ারকর। আপনি ঠিকই বলেছেন। এ বাসা আমি ছাড়বো না।

রামদাস।। সাবাস। ... পালিয়ে লাভ নেই বাবুজি, একবার সাহস নিয়ে রুখে দাঁড়ান, দেখবেন ওরাই ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

অপূর্ব।। আপনার কিন্তু খুব সাহস, মিঃ তলোয়ারকর।

রামদাস।। (মৃদু হেসে) আমরা যে রাজপুত বাবুজি?

দৃশ্যান্তর

রেল স্টেশন। পরিবেশানুগ শব্দ।

অপূর্ব।। আরে ওটা কে? গিরিশ মহাপাত্র না? কী হে গিরিশ, আমাকে চিনতে পারো?

গিরিশ।। (কাশতে কাশতে) আজ্ঞে পারি বইকি বাবুমশাই। তা এখন কোথায় আগমন হচ্ছে আপনার?

অপূর্ব।। এই একটু বাইরে যাচ্ছি। আফিসের কাজে। তা তুমি যে রেলস্টেশনে?

গিরিশ।। আজ্ঞে এনাজাং থেকে দুজন বন্ধুনোক আসার কথা ছিল— (কাশতে থাকে) আমাকে কিন্তু সেদিন ঝুটমুট হয়রান করা হলো বাবুমশাই। হ্যাঁ অনেকে আনে বটে কেউ কেউ আফিং-সিদ্ধি নুকিয়ে। কিন্তু আমি ভারি ধম্মভীরু মানুষ। (কাশি) আমি বলি, কাজ কী বাবু জুচ্চুরিতে? কথায় বলে— পরো ধম্ম ভয়াবহ। লল্লাটের নেকা তো খণ্ডাবে না?

অপূর্ব।। (হাসে) তা বটে। কিন্তু তোমার বাপু একটা ভুল হয়েছে মহাপাত্র। আমি পুলিশের লোক নই। আফিং-সিদ্ধির ধার ধারিনে। সেদিন কেবল তামাসা দেখতেই গিয়েছিলাম থানায়।

রামদাস।। বাবুজি, ম্যয়নে আপকো তো জরুর কঁহা দেখা?

গিরিশ।। (কাশতে কাশতে) আশ্চয্যি নেহি হ্যায় বাবুসাহেব, নোকরির বাস্তে কেত্তা কেত্তা জায়গায় তো ঘুমতা হ্যায়— দেখে গা কোথাও? আচ্ছা, তাহলে এখন আসি? নমস্কার বাবুমশাই, রাম রাম।

কাশতে কাশতে দূরে চলে যায়।

অপূর্ব।। (হাসে) এই লোকটাকেই কিনা আমার পুলিশকাকা একদিন বিপ্লবী সব্যসাচী সন্দেহ করে থানায় ধরে এনেছিলেন, ভাবতে পারেন?

রামদাস।। এইটে আপনার কম্পার্টমেন্ট। উঠুন বাবুজি, গাড়ি ছাড়ার সময় হলো।

সঙ্গে লোক যাচ্ছে, সেই আপনার মালপত্র দেখাশোনা করবে।

অপূর্ব।। তেওয়ারি একা রইল মিঃ তলোয়ারকর—

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা।

রামদাস।। আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না বাবুজি, আমি দেখবো।

অপূর্ব।। আমিও কৃতজ্ঞ থাকবো মিঃ তলোয়ারকর।

গার্ডের হুইসিল। ট্রেন ছাড়ে।

রামদাস।। রাম রাম বাবুজি।

অপূর্ব।। রাম রাম।

দৃশ্যান্তর

ভারতীর বাসা।

অপূর্ব।। আসতে পারি?

ভারতী।। কী আশ্চর্য! অপূর্ববাবু, আপনি এখানে? আসুন, ভেতরে আসুন। বসুন। এখানে আমার খোঁজ পেলেন কী করে?

অপূর্ব।। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

ভারতী।। তাহলে এতদিনে সত্যি সত্যিই আপনার ইচ্ছে হলো?

অপূর্ব।। নিশ্চয়ই। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, ভারতী।

ভারতী।। আমার নামও জানেন?

অপূর্ব।। তেওয়ারির কাছে জেনেছি। ওর জন্যে আপনি যা করেছেন—

ভারতী।। মানুষ মানুষের জন্যে করবে এটাই তো স্বাভাবিক, অপূর্ববাবু?

অপূর্ব।। তেওয়ারি বললে— ভারতী মা আমার মানুষ নন গো বাবু, দেবী। এই বসন্তরোগে আমার মা-ও বোধকরি আমাকে অমন করে বাঁচাতে পারতেন না।

ভারতী।। (মৃদু হেসে) তেওয়ারি পাগল।

অপূর্ব।। দিন পনেরোর জন্যে অফিসের কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল, ফিরে এসে সব দেখে শুনে তো আমার চক্ষুস্থির।

ভারতী।। তা না হয় হলো, কিন্তু আমার হাতের পথ্যিজল খেয়ে তেওয়ারির যে জাত গেল, তার কী হবে অপূর্ববাবু? প্রায়শ্চিত্ত করাতে তো আপনার অনেক খরচ হয়ে যাবে?

অপূর্ব।। ছাড়ুন তো। তেওয়ারি রোগে পড়ে খেয়েছে, কিন্তু আমাকে তো সুস্থ থেকেই আপনার হাতে খেতে হবে, তা নইলে আমি আর বাঁচবো না।

ভারতী।। কেন?

অপূর্ব।। যা একটা রাঁধুনি বামুন জুটেছে বরাতে-- তার রান্না আর কটা দিন খেলে আমি নির্ঘাত পরপারে।

ভারতী।। (হাসে) তা আমি কী করবো? আপনার খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করার ভার তো আমার উপরে নেই। কেউ তা দেয়নি। না ভগবান, না মানুষ।

অপূর্ব।। সে না হয় হলো। কিন্তু সাততাড়াতাড়ি আপনিই বা ও বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন কেন?

ভারতী।। উপায় ছিল না যে। মাত্র কদিনের তফাতে মা-বাবা দুজনেই দেহ রাখলেন। আমি একা মেয়েমানুষ ওখানে থাকি কী করে বলুন? তা ছাড়া অত টাকা ভাড়াই বা জোটাবো কোত্থেকে?

অপূর্ব।। হ্যাঁ, আপনার এই দুঃসংবাদটাও পেয়েছি তেওয়ারির কাছে। সত্যিই মর্মান্তিক। কিন্তু এখানেই বা আপনার খরচ চালাবে কে?

ভারতী।। এই স্কুলটায় একটা চাকরি পেয়েছি। একা মানুষ, চলে যায়।

অপূর্ব।। দূর, এসব স্কুল কী মাইনে দেবে? এতো আর এক ধরণের শুকিয়ে মরা! না না শুনুন, আমার অফিসে একটা পোস্ট খালি আছে। আমি সেই কথাটাও বলতে এসেছি। বেতন একশো টাকা। ঘণ্টা দু-একের বেশি কাজ নেই। করবেন?

ভারতী।। আপনার অফিসে? না বাবা--

অপূর্ব।। কেন?

ভারতী।। সেখানে আপনিই তো আমার বস হবেন? আর পান থেকে চুন খসলেই তেওয়ারির লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবেন।

অপূর্ব।। এখনও আপনি আমার উপর রাগ করে আছেন?

ভারতী।। সারাদিন ছেলেময়ে পড়িয়ে, রাতে সমিতির চিঠিপত্র লেখালিখির কাজ সেরে বিছানায় শুতে না শুতেই তো ঘুমিয়ে পড়ি। রাগ করার সময় কই?

অপূর্ব।। কিসের সমিতি আপনাদের?

ভারতী।। ওই যে দেখছেন না, দেয়ালে লেখা রয়েছে-- 'পথের দাবী'?

অপূর্ব।। হ্যাঁ, তা তো দেখেছি, কিন্তু এর মানে কী?

ভারতী।। মানে? আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার দাবি নিয়ে আমরা পথ চলি। আমাদের পরে যারা আসবে, তারা যেন বিনা বাধায় হাঁটতে পারে। তাদের অবাধ গতিকে কেউ যেন রোধ করতে না পারে, এই আমাদের পণ। আপনি আসবেন আমাদের দলে?

অপূর্ব।। এতো খুব ভালো কথা। এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, আমি আছি।

ভারতী।। তবে চলুন, নিচে গিয়ে আপনাকে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 'পথের দাবী'র সদস্য করে নিই।

অপূর্ব।। ডাক্তার বুঝি আপনাদের সভাপতি?

ভারতী।। না, তিনি আমাদের মূল শিকড়। মাটির তলায় থাকেন। তাঁর কাজ দেখা যায় না।

অপূর্ব।। তাহলে প্রেসিডেন্ট?

ভারতী।। তাঁর নাম সুমিত্রা।

অপূর্ব।। মহিলা? তিনিও কি আপনার মতো শিক্ষিতা?

ভারতী।। আমার মতো? শুধু ডাক্তার ছাড়া তাঁর মতো বিদুষী বোধহয় এদেশে আর কেউ নেই।

অপূর্ব।। আর ডাক্তার?

ভারতী।। তাঁর কথা থাক অপূর্ববাবু। পরিচয় দিতে গেলেই হয়তো তাঁকে ছোটো করে ফেলবো। ধীরে ধীরে নিজেই বুঝতে পারবেন। একটু বসুন। নিচে একটা মিটিং চলছে। আমি সুমিত্রাদিকে একটু জিগ্যেস করে আসি।

দৃশ্যান্তর

ভারতীর ঘর।

রামদাস।। বাবুজি—

অপূর্ব।। এ কী তলোয়ারকর! আপনি এখানে?

রামদাস।। আমি ভারতীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বাবুজি।

অপূর্ব।। আপনি ওঁকে আগে চিনতেন?

রামদাস।। না, তেওয়ারির অসুখের সময়ে আপনার বাড়িতেই পরিচয়। তারপর থেকেই আমি ওঁর ভক্ত হয়ে পড়েছি।

অপূর্ব।। আমি ওঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি। তেওয়ারিকে তিনি যেভাবে বাঁচিয়ে তুলেছেন—

রামদাস।। সে তো আপনি শুধু শুনেছেন বাবুজি, আমি প্রত্যক্ষদর্শী। রাতের পর রাত যেভাবে ওঁকে তেওয়ারির শিয়রের পাশে বসে থাকতে দেখেছি— যেন জ্বলন্ত প্রদীপশিখা। সত্যি সব্যসাচীর শিষ্যা না হলে এমন হয়?

অপূর্ব।। কে সব্যসাচীর শিষ্যা?

রামদাস।। কেন ভারতী? আপনি জানেন না?

অপূর্ব।। না তো? আপনি দেখেছেন সব্যসাচীকে?

রামদাস।। না। তবে ভারতী বলেছেন, সময় হলে দর্শনের ব্যবস্থা করে দেবেন।

অপূর্ব।। আশ্চর্য! যে মানুষটাকে ধরবার জন্যে গভর্নমেণ্ট, পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে, সেই সব্যসাচী কিনা ভারতীর গুরু? একদিন না জেনে ভারতীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলাম— আজ সে কথা ভাবতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

রামদাস।। না জেনে মানুষ তো কত অন্যায় করে বাবুজি, কিন্তু জেনে বুঝে, শুধুমাত্র সংস্কারের বশবর্তী হয়ে মানুষকে অপমান করাও কিন্তু পাপ।

অপূর্ব।। হ্যাঁ, সেটাও জেনে বুঝে করি নি তলোয়ারকর। আশৈশব যা দেখেছি, জেনেছি, শুধুমাত্র তাকেই বিশ্বাস করেছি। ঠিক না ভুল সেটাই বিচার করে দেখিনি কোনোদিন— এটাই আমার অপরাধ। এই সব্যসাচী নামটাই আজ আমার মনের সেই অন্ধকার কোনটায় মশালের আলো জ্বেলে দিয়েছে তলোয়ারকর। যে মানুষ তাঁর জন্মভূমিকে স্বাধীন করার জন্যে এমন মরণ-পন করেছেন, তাঁকে আমি আমার আত্মার আত্মীয়ই মনে করি।

রামদাস।। এসব কথা বলায় কিন্তু দুঃখ আছে বাবুজি, সে আপনি সইতে পারবেন না।

অপূর্ব।। আপনি পারলে আমি পারবো না কেন?

রামদাস।। আমিই কি পেরেছি? মিছেই দু'বছর জেল খাটলাম।

অপূর্ব।। সেকি?

রামদাস।। আমার জামাটা খুললে দেখতে পাবেন বাবুজি, বেতের দাগে পিঠে আর জায়গা নেই। তবু সর্বস্ব ফেলে ওই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলাম কই? স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে তো সুখের পায়রার মতো সেই চাকরি করতেই এলাম রেঙ্গুনে। স্বাধীনতার উপাসক হবো এমন বড়াই আর করি না

যন্ত্রসংগীতে 'ও আমার দেশের মাটি' সুরটি মৃদু বাজতে থাকে।

অপূর্ব।। তলোয়ারকর, আজ তুমি আমার চোখ খুলে দিলে বন্ধু। তোমার কথা আমি আজীবন মনে রাখবো।

ভারতী।। আরে— এই তো রামদাসজিও এসে গেছেন! ভালোই হলো। আপনাদের কথা আমি সুমিত্রাদিকে বলেছি। প্রেসিডেণ্ট আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। আসুন।

দৃশ্যান্তর

পথের দাবীর সভাকক্ষ।

সুমিত্রা।। আসুন অপূর্ব্ববাবু। রামদাসজি, আপনি ওই ঘরটায় একটু বসুন। আপনার সঙ্গে একটু পরে কথা বলছি।

রামদাস।। ঠিক আছে প্রেসিডেন্ট।

সুমিত্রা।। বসুন, অপূর্ব্ববাবু, আপনি আমাদের চেনেন না কিন্তু ভারতীর সূত্রে আমরা আপনাকে চিনি। শুনলাম, আপনি নাকি আমাদের পথের দাবীর সভ্য হতে চান? সত্যি?

অপূর্ব।। তা সত্যি, তবে এ সমিতির কী উদ্দেশ্য, আমাকে কী করতে হবে কিছুই জানি না।

সুমিত্রা।। খাতায় যখন একবার নাম উঠে গেছে, তখন ধীরে ধীরে সবই জানতে পারবেন।

অপূর্ব।। (আতঙ্কিত) আমার নাম উঠে গেছে খাতায়? সে কী?

ডাক্তার।। ভয় পেলেন নাকি অপূর্ব্ববাবু?

অপূর্ব।। কে?

ভারতী।। ইনিই আমাদের ডাক্তার। উঠে দাঁড়ান।

ডাক্তার।। (কাশতে কাশতে) চিনতে পারেন বাবুমশাই?

অপূর্ব।। (চরম বিস্ময়ে) এ কী! এ তো সেই গিরিশ মহাপাত্র!

ডাক্তার।। ঠিক ধরেছেন। এঁরা আমাকে ডাক্তার বলে ডাকেন।

অপূর্ব।। কিন্তু আমার কাকাবাবুর খাতায় যে অন্য কী একটা নাম—

ডাক্তার।। সব্যসাচী তো? সে তো আমি নই?

অপূর্ব।। তাহলে কে সে?

ডাক্তার।। শুনেছি সময় হলেই তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন।

শশী।। (হাঁপাতে হাঁপাতে আসে) প্রেসিডেন্ট—! ডাক্তার—!

ডাক্তার।। আরে, এসো এসো কবি। কী খবর?

অপূর্ব।। (স্বগত) আরে, এতো সেই মাতাল শশীকান্তটা! আশ্চর্য, এ আবার কবি?

শশী।। সাংঘাতিক খবর ডাক্তার, আপনাকে এক্ষুনি পালাতে হবে।

ডাক্তার।। (হাসে) সে কী? কেন হে?

শশী।। পুলিশ পিছু নিয়েছে?

সুমিত্রা।। পুলিশ?

শশী।। হ্যাঁ, নিমাই দারোগা আমাকে পাকড়াও করেছিল। তার ধারণা আমি নাকি সব্যসাচীর ডেরা চিনি।

ডাক্তার।। (হাসে) তা কিছু কিছু চেন বইকি, অস্বীকার করতে পারো?

শশী।। ডাক্তার!

ডাক্তার।। তা তোমার নিমাই দারোগা কি আমাকেই সব্যসাচী সন্দেহ করছে না কি?

শশী।। আপনি আর অপেক্ষা করবেন না ডাক্তার। যে কোনো মুহূর্তেই পুলিশ

এসে পড়তে পারে, আপনি চলে যান।

অপূর্ব।। (উত্তেজিত) পুলিশ যদি আসে, সে আসবে আপনার বোকামির জন্যেই। থানা থেকে সরাসরি এখানে এলেন কোন আক্কেলে মশাই? পুলিশ যদি ফলো করে থাকে?

ডাক্তার।। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না অপূর্ববাবু, এসব কাজে কিছুটা ঝুঁকি তো থাকবেই। চলুন, বরং আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। রাত হয়ে গেছে। পথটাও ভালো নয়।

অপূর্ব।। আপনি?

ডাক্তার।। আমার জন্যে ভাববেন না, চলুন।

দৃশ্যান্তর

জনতার গুঞ্জন।

ভারতী।। এই অসুস্থ শরীর নিয়ে তোমার আজকের এই মিটিংয়ে আসা উচিত হয়নি সুমিত্রাদি।

সুমিত্রা।। কাজটাই যে আমাদের কাছে বড়ো ভারতী। তুচ্ছ শরীর নিয়ে অত ভাবতে গেলে কি চলে? তাতে সেই কাজটুকুই পণ্ড হয়। কতদিনের চেষ্টায় আমরা এ জমায়েত করতে পেরেছি বলো?

ভারতী।। তোমার সঙ্গে কথায় পারবো না। তুমি প্রেসিডেণ্ট, যা বলবে তাই হবে।

সুমিত্রা।। জোর করে তো আমি কিছু চাপাই নে ভাই। বিভিন্ন কারখানার মজুররা আজ এই মিটিংয়ে এসেছে, তা তোমাদেরই অনেক পরিশ্রমের ফল। ওরা অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। এখন যদি আমরা পিছিয়ে যাই তবে 'পথের দাবী'-র সত্যিটাই যে মিথ্যে হয়ে যায় ভারতী? অপূর্ববাবু—

অপূর্ব।। বলুন প্রেসিডেণ্ট?

সুমিত্রা।। যে কোনো মুহূর্তে এখানে পুলিশের হামলা হতে পারে।

অপূর্ব।। (ভীত) সে কী? পুলিশ? কেন?

সুমিত্রা।। আসল সত্যিটা যদি শ্রমিকরা জেনে যায়, তাহলে মালিকদের কায়েমি আসনটা যে ধসে যেতে পারে— সেটা রুখতে তাদের পুলিশি সাহায্য চাই বইকি?

অপূর্ব।। কিন্তু পুলিশ এলে তো আমাদেরও ধরে নিয়ে যেতে পারে?

সুমিত্রা।। তা তো পারেই। 'পথের দাবী'-র সভ্যদের কি পুলিশের ভয় পেলে চলে?

অপূর্ব।। (স্বগত) পথের দাবী না পথের দাবী! দাবির বহর যে এত তা আগে কে জানতো?

সুমিত্রা।। আর সময় নেই, আপনার ভাষণ শুরু করুন অপূর্ববাবু। আপনি তো রাজি হয়েই এখানে এসেছেন?

অপূর্ব।। (দ্বিধা) তা ঠিক কিন্তু... মানে... যদি সাহেবদের কানে ওঠে?

হঠাৎ গোলমাল শুরু হয়। ঘোড়ার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসে। বিক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর, আর্তনাদ।

জনতা।। —পালাও— পালাও— পালাও—
—পালাও— মারপিট হবে। পুলিশ আসছে—
—ঘোড়ায় চড়ে পুলিশ আসছে, এবার ব্যাটন চলবে। পালাও—
—দারোগা সাহেব নিজে আসছে— পালা পালা—

সুমিত্রা।। শ্রমিকরা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে, ওদের কিছু বলুন অপূর্ববাবু—

অপূর্ব।। আমি মানে— পুলিশ—

রামদাস।। আমাকে কিছু বলবার অনুমতি দেবেন, প্রেসিডেণ্ট?

সুমিত্রা।। বলুন।

রামদাস।। (চিৎকার করে) ভাইসব, আমার প্রিয়বন্ধুরা, তোমরা ভয় পেয়ো না। ওই যে বন্দুকধারী পুলিশ তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, ওদের কারা পাঠিয়েছে জানো? তোমাদের কারখানার মালিকরা। তোমাদের আজ একজোট দেখে তারা ভয় পেয়েছে। তারা চায় না তোমাদের দুঃখদুর্দশা তোমরা চিনতে শেখো। যারা তোমাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী, তাদের পরিচয় জানতে পারো। মানুষের ন্যায়সংগতভাবে বেঁচে থাকার দাবি যাতে তোমরা তুলতে না পারো, তাই ওদের এই অন্যায় অভিযান। এই পুলিশি চক্রান্ত।

বক্তৃতাব শেষাংশে ভয়ার্ত জনতার আর্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

জনতা।। —না না আমরা কিছু শুনতে চাই না—
—পুলিশ আসছে, পুলিশ—
—পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে—
—ঘরবাড়ি ভেঙে দেবে। না খেয়ে মরবো আমরা—

রামদাস।। বন্ধুগণ, এখনো কি বেঁচে আছ তোমরা? এখনো কি তোমরা দুবেলা পেটপুরে খেতে পাও? তোমাদের এই ভয়ের সুযোগ নিয়েই ওরা তোমাদের ব্যবহার করে। ভুলে যেও না বন্ধুগণ, তোমরা যত দরিদ্র, যত দুঃখী, যত অশিক্ষিতই হও, তবু তোমরা মানুষ। আত্মরক্ষার অধিকার তোমাদের আছে।

জগদীশ।। স্টপ দিস ননসেন্স। মিটিং বন্ধ করুন।

জনতা।। —আমাদের কোনো দোষ নেই দারোগাবাবু।
—ওই দিদিমণিরাই আমাদের বুঝিয়েসুঝিয়ে এখানে এনেছে।

জগদীশ।। ভাগ্‌! পালা! যত সব কুত্তার দল! — শুনুন, আপনি বক্তৃতা করছিলেন, কী নাম আপনার?

রামদাস।। রামদাস তলোয়ারকর।

জগদীশ।। আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো। সেপাই—

সুমিত্রা।। কারণ?

জগদীশ।। উনি শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীবিদ্বেষ ছড়াচ্ছিলেন। মজুরদের স্ট্রাইক করার জন্যে ক্ষেপিয়ে তুলছিলেন।

সুমিত্রা।। এসব আমাদের কথা। সেটাই উনি বলেছেন।

ভারতী।। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অধিকার তো সকলেরই আছে?

রামদাস।। বন্ধুগণ, ওরা ভয় পেয়েছে। ওরা জানে না যে সত্যের কণ্ঠরোধ করা যায় না। আমি জানি, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ একদিন তোমাদের শতসহস্র কণ্ঠে গর্জে উঠবে। তার আর দেরি নেই।

কথা বলতে বলতে দূরে চলে যায় রামদাসের কণ্ঠস্বর। জনতার গোলমাল ও ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

অপূর্ব।। (আতঙ্কিত) তলোয়ারকরকে যে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল প্রেসিডেণ্ট?

সুমিত্রা।। (ক্লান্ত) কী আর করা যাবে?

ভারতী।। সুমিত্রাদি—

সুমিত্রা।। ভয় কী বোন? ঝড়ের হাওয়া উঠতেই পারে। তাই বলে প্রদীপের শিখা তো নিভতে দিতে পারি না আমরা? চলো।

দৃশ্যান্তর

ভারতীর ঘর।

অপূর্ব।। আমার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ভারতী। 'পথের দাবী'তে আর আমার ঠাঁই হবে না।

ভারতী।। (হাসে) কেন?

অপূর্ব।। আমি ভীরু, কাপুরুষ। তলোয়ারকরকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল— আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম।

ভারতী।। (দীর্ঘশ্বাস) আর কী-ই বা করতে পারতেন?

অপূর্ব।। তাইতো! ... কিন্তু এখন আমি কী করি?

ভারতী।। আপনি আগে ওঁর স্ত্রীর কাছে যান। সেটা অনেক জরুরি।

অপূর্ব।। তুমিও চলো। হয়তো এখন তোমাকে তাঁর কাছে থাকতে হতে পারে।

ভারতী।। (ম্লান হাসে) আমি কোন কাজে লাগবো? আমি যে ক্রিশ্চান।

অপূর্ব।। (দীর্ঘশ্বাস) ও— তা বটে।

ডাক্তার।। গুড ইভনিং ফ্রেণ্ডস্।

ভারতী।। আরে, এই তো ডাক্তারবাবু। সুমিত্রাদির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ডাক্তার।। না তো?

অপূর্ব।। (উত্তেজিত) এখানে ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেছে ডাক্তারবাবু, আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট রামদাস তলোয়ারকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

ডাক্তার।। ও। (হাই তোলে) আমাকে একটু চা খাওয়াতে পারো ভারতী? বড্ডো ক্লান্ত।

ভারতী।। আনছি। কিন্তু এখনি যে আমাদের বেরোতে হবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার।। কোথায়?

ভারতী।। ইয়াসিনে। তলোয়ারকরের বাসায়।

ডাক্তার।। কোনো দরকার নেই।

অপূর্ব।। (উত্তেজিত) দরকার নেই মানে? তাঁর বিপন্ন পরিবারের খোঁজখবর নেবার কোনো দরকার নেই?

ডাক্তার।। ওটা আমার উপরেই ছেড়ে দিন না? রাত হয়ে গেছে। এখন ইয়াসিনের বনেজঙ্গলে সারারাত ঘুরতে পারেন, কিন্তু বাড়ি খুঁজে পাবেন না।

অপূর্ব।। তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো সবাই?

ডাক্তার।। উপায় কী? কাল সকালের আগে তো আর খবর পাঠাবার লোক পাবো না?

ভারতী।। চা—

ডাক্তার।। আঃ, বাঁচালে! এত কাজ বাকি ... আবার রাত দুটোর ট্রেনে রওনা দিতে হবে।

অপূর্ব।। তলোয়ারকরের কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারছি না। আপনি জানেন, একটা মানুষ দেশের জন্যে দু-বছর জেল খেটেছে? অসংখ্য বেতের দাগ এখনো তার পিঠ থেকে মোছেনি? এই বিদেশে যাঁর স্ত্রী-পুত্র তাঁরই মুখ চেয়ে আছে, তাঁর কী অসামান্য সাহস!

ডাক্তার।। পরাধীনতার আগুন অহোরাত্র যার বুকের মধ্যে জ্বলছে, এ ছাড়া তার আর উপায় কী অপূর্ববাবু? সাহেবের দোকানে বড়ো চাকরি বা স্ত্রীপুত্রসংসার কিছুই তাকে বাঁধতে পারে না।

অপূর্ব।। (উত্তেজিত) সাহেবের দোকানে চাকরি করি বলে আপনি আমাকে তুচ্ছ ভাবতে পারেন, কিন্তু সে নির্ভীক, বীর। আপনার মতো ছদ্মবেশ ধরে

তাকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় না।

ভারতী।। একি! এ আপনি কাকে কী বলছেন অপূর্ববাবু?

অপূর্ব।। ঠিকই বলছি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি তাঁর তেজ, তাঁর বাগ্মীতা, তাঁর নির্ভীকতাকে উনি মনে মনে ঈর্ষা করেন। তাই ইয়াসিনে যেতে দিলেন না।

ভারতী।। (তীব্র রাগ তবু সংযতস্বরে) অপূর্ববাবু, আপনাকে অপমান করতে পারবো না। কিন্তু আপনি এখান থেকে যান। আমরা ভুল বুঝেছিলাম। ভয়ে যার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, 'পথের দাবী'তে তার ঠাই নেই। আপনি আর কোনোদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবেন না।

ডাক্তার।। (লঘু সুরে) আরে উঠছেন কোথায়? বসুন। এই অন্ধকারে একলা যেতে পারবেন না। আমি স্টেশনে যাবার পথে পৌঁছে দেবো।

ভারতী।। আবার কবে ফিরবেন?

ডাক্তার।। কী জানি? কিন্তু এত তাগাদা কেন?

ভারতী।। এবার যে বড়ো ভয় করছে ডাক্তারবাবু, মনে হচ্ছে সব বুঝি শেষ হয়ে যাবে।

ডাক্তার।। (হাসে) হবে না গো, হবে না। এই তো— রামদাস এসে গেছে। একটু কি দেরি হলো?

রামদাস।। আজ্ঞে হ্যাঁ, জামিনের জন্যে একটু দেরি হয়ে গেল।

অপূর্ব।। (অবাক) এ কী! তলোয়ারকর?

রামদাস।। নমস্তে বাবুজি। ডাক্তারবাবুর দয়ায় আবার দেখা হয়ে গেল! আপনাকে কিন্তু আমি মিটিংয়ের মাঠেই এক ঝলক দেখেছিলাম ডাক্তারবাবু— তারপর যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন!

ডাক্তার।। উধাও হবার যে কারণ ছিল রামদাস, যেমন এখান থেকেও রাতারাতি উধাও হতে হবে?

রামদাস।। সেদিন কিন্তু স্টেশনে আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম।

ডাক্তার।। জানি। কিন্তু এত রাতে বাড়ি না ফিরে এখানে এলে কেন?

রামদাস।। আপনাকে প্রণাম করতে। পুনার সেন্ট্রাল জেলে সেবার আমি যাবার দিন-কয়েকের মধ্যেই আপনি চলে গেলেন। নীলকান্ত যোশীর কী হলো?

ডাক্তার।। ব্যারাকের পাঁচিল টপকাতে পারলো না বলে সিঙ্গাপুরে তার ফাঁসি হয়ে গেল। — একি অপূর্ববাবু, কী হলো আপনার? কাঁদছেন? ছিঃ! পুরুষ মানুষের চোখে জল মানায় না, মুছে ফেলুন।

দৃশ্যান্তর

থানা। পরিবেশানুগ মৃদু কলরব।

নিমাই।। না না, এটা কিন্তু তোমার খুব ভুল কাজ হলো জগদীশ। রামদাস তলোয়ারকে বেল দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি।

জগদীশ।। কী করবো বলুন? লোকটা বোথা কোম্পানির অ্যাকাউন্টেন্ট। তার উপর কৃষ্ণ আইয়ারের মতো বড়ো ব্যারিস্টার ওর জামিন দাঁড়ালো! তাছাড়া আমার উপর তো কোনো স্পেসিফিক ইন্সট্রাকশানও ছিল না—

নিমাই।। বুঝবে বুঝবে, এর ফল নিজেই বুঝবে! ... কদিন আগে— এক পেশোয়ারি শালওয়ালা, থেন মঙের বাড়িতে ঢুকে পুলিশকে গুলি করে পালিয়েছিল, মনে আছে?

জগদীশ।। হ্যাঁ স্যার?

নিমাই।। ওই লেবার মিটিংয়ে যে শিখব্যাটাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলে, আমার বিশ্বাস, সে একই লোক। সব্যসাচী।

জগদীশ।। কদিন ধরে কিন্তু সেই বেহেড মাতাল ব্যায়লাওলাটারও টিকি দেখা যাচ্ছে না, লক্ষ করেছেন স্যার?

নিমাই।। কে জানে বাবা, ওই ভ্যাগাব্যাণ্ডটাই আসলে সব্যসাচী কিনা! এ কার পাল্লায় পড়লাম হে জগদীশ— হাড়ে তো দুব্বে গজিয়ে ছাড়লো!

জগদীশ।। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় স্যার, ওই তলোয়ারকরের সঙ্গে সব্যসাচীর কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে?

নিমাই।। তোমার ওই মিটিংয়ের মাঠের ধারের সেই শিখ ব্যাটা যদি সব্যসাচী হয়, তাহলে থাকতে পারে না, আছেই— এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

জগদীশ।। তাহলে আর ভাবনা কী? তলোয়ারকরের মামলা চলার সময়েই তো সব বেরিয়ে পড়বে?

নিমাই।। আহা, কত আশা! তুমিও তলোয়ারকরকে পেয়েছ, আর মামলাও হয়েছে।

জগদীশ।। পালাবে কোথায় স্যার? ওর বউবাচ্চা তো এখানে?

নিমাই।। কী বুদ্ধি তোমার জগদীশ! নিজের প্রাণ যে বিলিয়ে দেবার জন্যে হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার কাছে ঘর-সংসার আর বৌ-বাচ্চা! (হঠাৎ টেলিফোন বাজে) হ্যালো— হ্যাঁ, আমি বলছি। ... কী? ... কী বললে? ওদের ডেরার খবর পেয়েছ? গুড। হ্যাঁ, ভালো করে খানাতল্লাসী ... কী বলছো? বাড়িটায় আগুন জ্বলছে? বাঃ! চমৎকার। ... এটা? ... হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। যত্তোসব!

টেলিফোন রাখে।

জগদীশ।। কী হলো স্যার?

নিমাই।। যা হবার তাই হলো। তুমি চলো ডালে ডালে, সব্যসাচী পাতায় পাতায়।

ওদের ডেরা সার্চ হতে পারে আন্দাজ করেই বাড়িটাতে ওরা আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়েছে। ওখানে নাকি দুজন মহিলা টিচার থাকতেন, তাঁরা বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই নাকি আগুন লাগে।

জগদীশ।। তখন কি ওদের সঙ্গে কেউ ছিল? মানে বললো কিছু?

নিমাই।। হ্যাঁ ছিল। একজন শিখ। ... কিন্তু অপূর্ব কোথায়? ওকেই আমার দরকার।

দৃশ্যান্তর

পথের দাবীর গুপ্তসভা।

ডাক্তার।। এসো ভারতী। এই ভাঙা প্যাগোডায় আজ 'পথের দাবী'র জরুরি সভা। খুবই তাড়াহুড়ো করে ডাকা হয়েছে। তুমি জানতে না, তাই তোমাকে নিয়ে আসা হলো। বসো। না না, তুমি আমার পাশেই বসো। স্টার্ট সুমিত্রা।

সুমিত্রা।। ভারতী, আমি তোমার মন জানি। তাই ডেকে এনে তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি। কিন্তু সকলের দাবিতে—

ভারতী।। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না সুমিত্রাদি?

সুমিত্রা।। বিষয়টা অপূর্ববাবুকে নিয়ে। তিনি কী করেছেন জানো? পোলিটিক্যাল কারণে বোথা কোম্পানি থেকে তলোয়ারকরের চাকরি গেছে। ডিসমিস। অপূর্ববাবুরও যেত কিন্তু নিমাই দারোগার কাছে পথের দাবীর সব কিছু ফাঁস করে দিয়ে নিজের চাকরিটা বাঁচিয়েছেন। 'পথের দাবী' যে বিপ্লবী দল, আমরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী, আমাদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র থাকে, সবই কবুল করে এসেছেন।

রামদাস।। শুধু তাই? ডাক্তারবাবুই যে সব্যসাচী সে কথাও বলেছেন।

সুমিত্রা।। বুঝতেই পারছ ডাক্তার ধরা পড়লে ফাঁসি নয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ওঁর অপরাধের কথা উনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাতে লাভ কী? এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কী ভারতী?

ডাক্তার।। ভারতী আর কি বলবে? তোমরাই বলো না?

সুমিত্রা।। ওঁর জন্যেই তলোয়ারকরকে ফেরার হতে হলো। তার নামে মামলা রুজু হয়েছে। এমনিতে হয়তো তেমন শাস্তি হতো না, কিন্তু এক্ষেত্রে—। তার ওপর সার্চ হতে পরে খবর পেয়ে পথের দাবীর বাড়িটা ডাক্তার আসার সময়ে পুড়িয়ে দিয়ে এসেছেন। এখন পথই আমাদের ঘর হল। এর শাস্তি কী তোমরাই বলো।

সমবেত।। ডেঁথ। ডেথ। মৃত্যুদণ্ড!

সুমিত্রা।। বেশ, তাহলে ডেথসেন্টেস-ই দিলাম। ভারতী কিছু বলবে?

ভারতী।। (আর্তকণ্ঠে) দাদা!

ব্রজেন্দ্র।। একজিকিউশনের ভার আমি নিলাম। এই ব্রজেন্দ্র সিংহের গুলিগোলা ছুরিছোরা কিছুই লাগে না। তার এই হাত দুটোই যথেষ্ট। বাগানের উত্তর কোনে একটা মজা কুয়ো আছে, সেটাতে ওই ডেডবডি ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিলে কাকপক্ষীও টের পাবে না। তার উপরে কিছু শুকনো ডালপালা চাপা দিয়ে দেবো।

সুমিত্রা।। হীরা সিং, অপূর্ববাবুকে নিয়ে এস।

আবহসংগীতে তীব্র উৎকণ্ঠা।

ডাক্তার।। বাঃ! এ তো চমৎকার মানিয়েছে দেখছি অপূর্ববাবু! হাত দুটো শক্ত করে পিছমোড়া বাঁধা। কোমর থেকে আবার ভারি ভারি পাথরের টুকরো ঝুলছে। এ অবস্থায় চট করে আর পালাতে পারবেন না, কী বলেন?

রামদাস।। বাবুজিকে তাঁর দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়ে দেওয়া হোক।

সুমিত্রা।। বিপ্লবীদলের নিয়ম অনুযায়ী আপনার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল অপূর্ববাবু।

উদাসী সুর বাজে।

অপূর্ব।। (আচ্ছন্নের মতো) মৃত্যুদণ্ড?

সুমিত্রা।। হ্যাঁ, আপনার কোনো বক্তব্য আছে?

অপূর্ব।। (যেন বুঝতে পারছে না) বক্তব্য? কী জানি? না বোধহয়—

ব্রজেন্দ্র।। ব্যাস, তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। এবার ওকে ওই কুয়োর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হোক।

ডাক্তার।। তোমাদের যার যার কাছে পিস্তল আছে, আমার কাছে দাও। তোমার? তোমার? তোমার? ঠিক আছে। থ্যাঙ্কস। সুমিত্রা, তুমি বললে— আমরা অপূর্বকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। কিন্তু কই, ভারতী তো দেয়নি?

সুমিত্রা।। ভারতী দিতে পারে না।

ডাক্তার।। পারা উচিতও নয়, কী বলো ভারতী? শোনো, অপূর্ববাবু যা করে ফেলেছেন তার আর চারা নেই, এর ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। সে শাস্তি দিলেও হবে, না দিলেও হবে। তাই আমি বলি, শাস্তি দিয়ে কাজ নেই। আমরা বরং ভারতীর উপরেই তার ভার দিই। এই দুর্বল মানুষটিকে ভারতী শক্তপোক্ত করে গড়ে তুলুন— কী বলো সুমিত্রা?

সুমিত্রা।। না, বিচার হয়ে গেছে, আর তা হয় না।

সমবেত।। না না, কিছুতেই না।

ব্রজেন্দ্র।। ভারতীর আর কী? সে তো এখন অপূর্বকে নিয়ে ঘরসংসার করবে— আর আমরা এদিকে—

ডাক্তার।। ব্রজেন্দ্র, বাটাভিয়াতে তোমাকে একবার শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, আবার যেন আমাকে তা না করতে হয়।

সুমিত্রা।। কিন্তু অপূর্বর এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে তো আমাদের সব কিছু ভেঙে-চুরে যাবে ডাক্তার?

ডাক্তার।। যায় যাবে। উপায় কী? অমানবিক হবার মধ্যে তো কোনো বাহাদুরি নেই সুমিত্রা?

রামদাস।। দেশের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে আমরা কিছুই মানবো না।

সমবেত।। না না না, কিছুতেই না—

ব্রজেন্দ্র।। ভয় দেখিয়ে আপনি আমাদের দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন না ডাক্তার। আপনার একার মতে কিছুই হবে না।

একটুকাল আবহসংগীতে তীব্র উৎকণ্ঠা।

ডাক্তার।। সুমিত্রা, দলে বিদ্রোহকে প্রশ্রয় দিও না। তোমরা তো জানো, আমার একার মত তোমাদের একশোজনের চেয়েও কঠিন? ভয় নেই ভারতী, অপূর্বকে অভয় দিলাম।

ভারতী।। কিন্তু দাদা, ওঁরা তো দিলেন না?

ডাক্তার।। না দিলেও ওরা জানে, আমি যাকে অভয় দিই তাঁকে ছোঁয়া যায় না। (হাসে) আমি ভালো করে খেতে পাইনে ভারতী, আধপেটা খেয়েই দিন কাটে, তবু ওরা জানে, এই কটা সরু আঙুলের চাপে ব্রজেন্দ্রর অত বড়ো বাঘের থাবাও গুঁড়ো হয়ে যাবে, কী বলো ব্রজেন্দ্র? ... অপূর্ব দেশে ফিরে যাক। ও ট্রেটর নয়। স্বদেশকে ও মনপ্রাণ দিয়েই ভালোবাসে, কিন্তু অধিকাংশই— থাক, স্বজাতির নিন্দে আর করবো না। ... অপূর্ব দুর্বল। আজ সভাভঙ্গের আদেশ দাও সুমিত্রা।

সুমিত্রা।। অধিকাংশের মত যেখানে ব্যক্তিবিশেষের গায়ের জোরের কাছে হার মানে, সভা তো সেখানে প্রহসন। সে সভার নেতৃত্ব করতে আমি রাজি নই।

ডাক্তার।। সেই ভালো। সকলের ভার আমার উপর চাপিয়ে দাও। ডুবি, আমি একাই ডুববো। হীরা সিং, অপূর্বর বাঁধন খুলে দাও।

সুমিত্রা।। ফাঁসির দড়িটা কি নিজের হাতে গলায় না পরলেই হতো না?

ডাক্তার।। (হাসে) সামান্য একটা দড়িতে ভয় পেলে চলবে কেন সুমিত্রা? (বেদনার সুর বাজে বাঁশীতে) এস ভারতী, তোমাকে আর অপূর্ববাবুকে একটু এগিয়ে দিয়ে

আসি। ... তোমাদের পিস্তলগুলো এখানে রইলো, যার যারটা নিয়ে নিও। ... রামদাস, অপূর্ব তোমার বন্ধু, ও তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে। পারলে ক্ষমা কোরো। হ্যাঁ, ভালো কথা ব্রজেন্দ্র— তোমরা সবাই তামাসা করে বলতে, অন্ধকারে আমি নাকি প্যাঁচার মতো দেখতে পাই? আজ যেন সে কথাটা কেউ ভুলো না, কেমন? গুডনাইট অল অফ ইউ। গুড নাইট।

দৃশ্যান্তর

গুপ্ত ওয়ারলেস অফিস, টেলিগ্রাফের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সুমিত্রা।। ডাক্তার—

ডাক্তার।। (ক্লান্ত) প্রেসিডেন্ট? এসেছ?

সুমিত্রা।। আমি আর কোথায় যাবো ডাক্তার? ছিলাম স্মাগলার। কোকেন, আফিং, চরসের চোরাচালান করতাম। সে পাপ থেকে উদ্ধার করে তুমিই তো আমাকে এই আসনে বসিয়েছ। তোমার আলোতেই তো আমি পথ দেখি ডাক্তার। তোমাকে ছাড়া আমার অস্তিত্ব কই?

ডাক্তার।। তুমি তোমার একুশ বছরের সংস্কার একদিনে মুছে ফেলতে পেরেছিলে বলেই তোমার ওই অনুপম শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি সুমিত্রা। কিন্তু এবার যে সত্যি-সত্যিই আমাকে ছাড়তে হবে?

সুমিত্রা।। এ কথা কেন বলছ? সিঙ্গাপুরের কী খবর পেলে? কোনো দুঃসংবাদ?

ডাক্তার।। দুঃসংবাদ? (হেসে) ওয়ারেলেস রিপোর্ট শুনবে? সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লাব পুলিশ ঘেরাও করেছে। এনকাউন্টারে তিনজন পুলিশ আর আমাদের বিনোদ মারা গেছে।

করুণ সুর বাজে।

সুমিত্রা।। (আতঙ্কিত) মারা গেছে? আমাদের বিনোদ?

ডাক্তার।। আরো আছে। মহাতপ আর অযোধ্যা সিং দু-ভাইই ধরা পড়েছে।

সুমিত্রা।। সে কী?

ডাক্তার।। হ্যাঁ, অযোধ্যা হংকংয়ে। মহাতপ, দুর্গা আর সুরেশ পেনাঙে। পুলিশের জাল ছিঁড়ে পালাতে পারেনি ওরা।

সুমিত্রা।। এখন কী হবে ডাক্তার?

ডাক্তার।। সম্ভবত ওদের ফাঁসি হবে।

সুমিত্রা।। (প্রায় আর্তনাদ) ফাঁসি? তাহলে তো সবই শেষ হয়ে গেল।

ডাক্তার।। শেষ খবরটাও শুনে যাও। মহাযুদ্ধের জন্যে ইংরেজ এবার এ অঞ্চলের সব সৈন্য সরিয়ে নিচ্ছে। কেননা ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের সব রেজিমেন্টের মধ্যে আমাদের লোক মিশে আছে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না সুমিত্রা— কেন, কার কথায়, ওরা দু-ভাই রেজিমেন্ট ছেড়ে সাংহাইয়ে এলো? ... আচ্ছা ব্রজেন্দ্র এখন কোথায় বলতে পারো?

সুমিত্রা।। না, সে হঠাৎই উধাও হয়েছে। সে জানতো তুমি হাঁটাপথে বর্মা থেকে বেরিয়ে গেছ। তাহলে কি ব্রজেন্দ্রই— ?

ডাক্তার।। সে পথের দাবীর নেতৃত্ব চেয়েছিল সুমিত্রা, এটা সেই বিদ্রোহীর প্রথম আঘাত।

সুমিত্রা।। পালিয়ে ব্রজেন্দ্র বাঁচতে পারবে না ডাক্তার। কিন্তু কী লাভ তাতে? তোমার এতদিনের এত পরিশ্রম সব তো শেষ হয়ে গেল!

ডাক্তার।। (হাসে) কিছুই শেষ হয় না সুমিত্রা। শেষের পরেও কিছু থাকে। উপসংহার। আবার আমাকে নতুন করে কাজ শুরু করতে হবে। সে যেভাবেই হোক। ইংরেজের ওই সৈন্যদের এবার পুরোপুরি আমাদের স্বাধীনতার সৈনিক করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্যে নতুন মন্ত্র চাই। আমি তো হার মানতে শিখিনি সুমিত্রা?

সুমিত্রা।। তুমি জয়ী হও ডাক্তার। আমি বিশ্বাস করি তুমি চাইলে এই ভস্মস্তূপের ভিতর থেকেই একদিন স্বাধীনতার নবকিশলয় মাথা তুলে দাঁড়াবে।

ডাক্তার।। হ্যাঁ, বিশ্বাস রেখো সুমিত্রা। বিশ্বাসেই শক্তি বাড়ে। হীরা সিং, আজ রাতেই পাহাড় ডিঙিয়ে আমাদের চিনের পথে পাড়ি দিতে হবে। তৈরি থেকো। চলো সুমিত্রা, যাবার আগে দু-একটা টুকরো কাজ আছে সেরে নিই। প্রসিড।

ঝড়ের শব্দ ভেসে আসে।

দৃশ্যান্তর

ঝড়ের শব্দ। বেহালা বাজে।

ভারতী।। উঃ, কী ভয়ংকর ঝড় উঠেছে। এত ভয় লাগছে কবি—

শশী।। (বেহালা থামিয়ে) এই সময়টাতে একবার দুর্যোগ শুরু হলে আর থামতেই চায় না।

আবার বেহালা বাজে, সঙ্গে ঝড়ের শব্দ।

ভারতী।। (একটু পরে) দাদা আর সুমিত্রাদির জন্যে বড়ো চিন্তা হচ্ছে। (বেহালা বেজেই চলেছে। একটুকাল পরে) যদি ধরা পড়েন?

বেহালা থামে।

শশী।। কে ডাক্তার? ধরা দিতে না চাইলে কারো সাধ্য আছে নাকি?

দরজায় শব্দ।

ভারতী।। কে যেন দরজায় নক করছে না?

শশী।। তাইতো মনে হলো। দাঁড়ান দেখছি। (দরজা খোলার শব্দ) আরে, আসুন আসুন ডাক্তার, আসুন প্রেসিডেন্ট। দুর্যোগ দেখে ভারতী তো দুশ্চিন্তায় ছটফট করছেন।

ভারতী।। এ কী! কী হয়েছে দাদা? সুমিত্রাদির চোখে জল কেন?

ডাক্তার।। তলোয়ারকর ধরা পড়েছে ভারতী।

বজ্রপাতের শব্দ।

শশী।। সে কী?

ডাক্তার।। লুকিয়ে লুকিয়ে ইয়াসিনে গিয়েছিল বউ-বাচ্চাকে দেখতে। পুলিশের নজর ছিল বাড়ির ওপর। তবে অজ্ঞান হবার আগে পর্যন্ত ধরা দেয়নি।

ভারতী।। এখন কী হবে দাদা?

ডাক্তার।। যদি বেঁচে ওঠে, জেল খাটবে। যাবজ্জীবনও হতে পারে।

ভারতী।। আর তার বউ মেয়ে? কী হবে সুমিত্রাদি?

সুমিত্রা।। জানি না ভাই।

ডাক্তার।। আমরা তো গৃহী নই ভারতী। বিদেশির আইনে নিজের জন্মভূমিতেও আমাদের ঠাঁই নেই। পশুর মতো অন্ধকারের জীবন। সংসারী মানুষের দুঃখ ঘোচাবো সে শক্তি কই?

সুমিত্রা।। তলোয়ারকরের দেশের বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। সেখান থেকে কেউ যদি এসে ওদের নিয়ে যায় ভালো, নইলে এ দেশের নিরুপায় বিধবার যা গতি হয় তাই হবে।

ভারতী।। শেষপর্যন্ত এই তাহলে তোমাদের পরিণাম?

ডাক্তার।। (ম্লান হাসে) একি তুচ্ছ পরিণাম ভারতী? আজ হয়তো দেশের মানুষ উপহাস করবে। কিন্তু আমি বলছি, একদিন এই রক্তের দেনা

বংশপরম্পরায় তাদের রক্ত দিয়েই শোধ করে দিতে হবে।

ভারতী।। আরো রক্তপাত?

ডাক্তার।। বিপ্লব মানে কিন্তু শুধু রক্তপাত নয় বোন, বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে দ্রুত আমূল পরিবর্তন। তুমি তো ক্রিশ্চান ভারতী, বলোতো—যিশু খ্রিষ্টের রক্তপাত কি ব্যর্থ হয়েছে?

শশী।। আরে এ কী! অপূর্ববাবু যে? এই রাতে এমন ঝড়-জলে এলেন কী করে?

অপূর্ব।। জানি না কবি। শুধু জানি আমাকে আসতে হবে, তাই এসেছি।

ডাক্তার।। কেন?

অপূর্ব।। একদিন আপনার দয়ায় প্রাণ পেয়েছিলাম, আমৃত্যু তা মনে রাখবো সেই কথাটাই জানাতে এসেছি।

ডাক্তার।। (হাসে) তুচ্ছ পাওয়াটাকেই বড়ো করে দেখলে অপূর্ববাবু, আর যে দিলে তাকে মনে রাখলে না?

অপূর্ব।। এ জীবনে তাঁকে ভুলবো না ডাক্তার।

ডাক্তার।। আশীর্বাদ করি, সত্যিকারের দাতাকে যেন চিনতে পারো। ভারতী, অপূর্ববাবু ভুল করেন বটে, কিন্তু যাকে ভালোবাসেন তাকে ভালোবাসতেও জানেন। ওঁকে তুমি ফিরিয়ে দিও না বোন।

সুমিত্রা।। কিন্তু এখন আমি কী করবো বলে যাও ডাক্তার।

ডাক্তার।। 'পথের দাবী' যখন ভেঙেই গেল তখন তুমি সুরাবায় ফিরে যাও সুমিত্রা। সেখানে তোমার দাদামশাই অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে দুঃখ দিও না।

সুমিত্রা।। বেশ, তোমার আদেশে আমি যাবো। কিন্তু তোমার জন্যে আমরণ অপেক্ষা করবো। শুধু বলে যাও ডাক্তার, কবে তোমার দেখা পাবো?

ডাক্তার।। সে তো বিধাতাপুরুষ জানেন সুমিত্রা?

শশী।। আপনার আদেশ আমি কিন্তু ভুলিনি ডাক্তার। আর মদ ছোঁব না, রাজনীতি করবো না, ভারতীর কাছে থাকবো এবং কবিতা লিখবো। আপনার সব হুকুম আমি মেনে চলবো ডাক্তার।

ডাক্তার।। থ্যাঙ্ক য়্যু কবি। কিন্তু এবার তো আমার সময় ফুরিয়েছে, আমাকে তোমরা বিদায় দাও। কেঁদো না ভারতী। যদি কোনোদিন খবর পাও, তোমার দাদার ফাঁসি হয়েছে, তাহলে জানবে বিদেশির হুকুমে সেই দড়িটাও গলায় পরিয়ে দিয়েছে আমার দেশেরই মানুষ। এতে অবাক হবার কিছু নেই, গরুর মাংস গরুতেই তো বয়ে নিয়ে যায়। চলো হীরা সিং, চরৈবেতি—চরৈবেতি—

শশী।। দুর্দিনের বন্ধু হীরা সিং— তোমায় নমস্কার।

দরজা খোলার শব্দ। ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জন আছড়ে পড়ে। বেহালার সুরে 'ও আমার দেশের মাটি' বাজে। শশী মন্ত্রোচ্চারণের মতো আবৃত্তি করে :

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে,
সেই রুদ্রদূতে বলো কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধনশৃঙ্খল তাঁর
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার
কারাগার করে অভ্যর্থনা—"

ঝড়ের বিপুল শব্দের মধ্যে শশীর কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায়। বেহালায় তখন 'ও আমার দেশের মাটি'-র সুর বাজতে থাকে।

অ ভি ন য়া ং শে
নির্মলকুমার. মমতাশঙ্কর. দেবতোষ ঘোষ. গৌতম বসু. স্বরাজ বসু.
প্রবীর ব্রহ্মচারী. মুরারি চক্রবর্তী. কাজল চৌধুরী
প্রযোজনা / বিশ্বনাথ দাস
আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত

জ য় ন্ত র কী র্তি

জয়ন্ত. মানিক. সুন্দরবাবু. হরি. ভবতোষ. সদানন্দ. মুকুন্দ.
১ম মাঝি. ২য় মাঝি. ১৭ নং. ২৩ নং. ২৬ নং

বাঁশীতে আশাবরীর আলাপ চলছে। ডোর বেল বাজলো একটু পরে। বাঁশী থেমে গেল।

জয়ন্ত।। (চেঁচিয়ে) হরিদা—
হরি।। (দূর থেকে) যাই—

দরজা খোলার শব্দ।

জয়ন্ত।। কে মানিক? আয় আয়। হরিদা, দুকাপ চা।
মানিক।। চা খাবার সময় নেই জয়ন্ত— চটপট রেডি হয়ে 'নে।
জয়ন্ত।। কেন? কী আবার হলো এই সাতসকালে?
মানিক। বসে বসে বাঁশী বাজালে আর জানবি কোত্থেকে? খবরের কাগজ পড়েছিস?
জয়ন্ত।। আজকের? ভালো খবর আছে নাকি কিছু?
মানিক।। আশ্চর্য। পাঁচের পাতাটা একবার খুলে দ্যাখ?
জয়ন্ত।। তুই শোনা।

কাগজের শব্দ।

মানিক।। এই যে পেয়েছি। — 'রহস্যময় চুরি। গতকল্য গভীর রজনিতে বিখ্যাত ব্যবসায়ী মুকুন্দলাল নন্দীর গদিতে এক রহস্যময় চুরি হইয়া গিয়াছে। গদির কার্য শেষ করিয়া—'

জয়ন্ত।। জানালার গরাদ ভেঙে নন্দীমশাইয়ের ঘুমন্ত কর্মচারীকে দোতলা থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সিন্দুক ভেঙে টাকা নিয়ে পালিয়েছে তো?

মানিক।। তবে তো পড়েছিস!

জয়ন্ত।। এ নতুন কী? এ ধরণের চুরি তো আজকাল হামেশাই হচ্ছে। এই তো মাস তিনেক আগে ভবানীপুরের এক জুয়েলারি শপ থেকে এ রকম করেই পঞ্চাশহাজার টাকার ওপর গয়না-টয়না চুরি হয়েছিল। এমনিভাবেই দরোয়ানকে তুলে ছুঁড়ে ফেলেছিল!

মানিক।। তাহলে তুই বলছিস সেই দলই কাল রাতে হানা দিয়েছিল মুকুন্দবাবুর গদিতে?

জয়ন্ত।। হতে পারে, আবার নাও পারে। কিন্তু এ কেসে তোমার এত ইনটারেস্ট কেন বন্ধু?

মানিক।। মুকুন্দবাবু আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড। আমি যে তোর মতো এক বিখ্যাত গোয়েন্দার সাকরেদ এটা উনি জানেন। নিজেই আসছিলেন তোর কাছে। একে বুড়ো মানুষ, তায় দিশেহারা অবস্থা, তাই আমিই দায়িত্ব নিয়ে চলে এলাম।

জয়ন্ত।। তবে আর কী? দায়িত্ব যখন নিয়েই ফেলেছ তখন চলো। পড়েছি যবনের হাতে—

মানিক।। (কৃতজ্ঞ হাসিতে) থ্যাঙ্ক য়্যু বস।

দৃশ্যান্তর

মুকুন্দবাবুর গদি।

মুকুন্দ।। অনেক অনেক ধন্যবাদ জয়ন্তবাবু, ওর নাম কী, নিজে যেতে পারিনি তবু মানিকের কথায় আপনি যে এসেছেন... শুনেছেন বোধহয় বড়ো বিপদ আমার— এখন আপনারাই ভরসা।

জয়ন্ত।। অত উতলা হবেন না নন্দীমশাই, দেখাই যাক না কদ্দূর কী করা যায়! পুলিশে খবর দেন নি?

মুকুন্দ।। দিয়েছি তো। তারা তো এসে দেখেশুনে গিয়েছে, ডাইরিও নিয়েছে, তবে ওর নাম কী— জানেন তো, ওদের আঠেরো মাসে বছর—

মানিক।। ঠিক আছে কাকাবাবু, আমরা বরং সময় নষ্ট না করে যে ঘরে ঘটনাটা

ঘটেছিল, চলুন জয়ন্তকে একবার—

মুকুন্দ।। বিলক্ষণ। আসুন জয়ন্তবাবু।

দৃশ্যান্তর

জয়ন্ত।। সাবাস! সাবেক আমলের এই ডবলব্রেস্ট আয়রনচেস্ট খোলা তো কম কথা নয় মানিক! কেউ টেরই পেলো না? আশ্চর্য!

মুকুন্দ।। সেটাই তো রহস্য। ওর নাম কি, এমনিতে আমার ঘুম খুব সজাগ। পাশের ঘরেই ছিলাম কাল রাতে— তবু কিছু টের পাইনি! ভাবতে পারেন?

জয়ন্ত।। আই সি। তারপর?

মুকুন্দ।। ভোরবেলায় রাস্তার লোকজনের চ্যাঁচামিচিতে আমার ঘুম ভাঙে। নিচে গিয়ে দেখি দীনবন্ধু, মানে আমার যে কর্মচারীটি এ ঘরে ঘুমোতো, একটা ঝোপের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ওই জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে তাকে, ভাবুন!

জয়ন্ত।। হ্যাঁ, সে তো কাগজেই পড়েছি। দীনবন্ধু তো এখন হাসপাতালে?

মুকুন্দ।। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই থেকে যমে-মানুষে টানটানি চলছে।

মানিক।। জ্ঞান ফেরেনি?

মুকুন্দ।। মাঝে একবার ফিরেছিল।

জয়ন্ত।। কিছু বলেছে?

মুকুন্দ।। না। তবে পড়ার সময়ে নাকি একঝলক দেখেছিল, ওর নাম কী, নিচে তিন চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে— ব্যাস।

জয়ন্ত।। দ্যাখ মানিক, জানলার এই শিকগুলো দেড় ইঞ্চি ডায়মেটারের। ছটার মধ্যে দুটো বেঁকে আছে দুপাশে আর বাকি চারটে হাওয়া?

মুকুন্দ।। না না, ওগুলো দোমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থায় নিচে পাওয়া গেছে।

মানিক।। ভাবছি, যে ভেঙেছে তার গায়ে কী সাংঘাতিক জোর! এ কী কোনো মানুষের কম্মো?

জয়ন্ত।। ঠিক আছে, আপাতত ফেরা যাক। নতুন কিছু ঘটলে জানাতে ভুলবেন না নন্দীমশাই।

মুকুন্দ।। না না, অবশ্যই। ওর নাম কী, এখন তাহলে—

জয়ন্ত।। পুলিশ যা করার করবে। তবে আমরাও আছি। দেখা যাক, সবাই মিলে চেষ্টা করে রহস্যের জট খোলা যায় কিনা। নমস্কার।

মুকুন্দ।। নমস্কার।

দৃশ্যান্তর

মানিক।। কেসটা কিন্তু বেশ ঘোরালো হয়ে উঠলো রে জয়ন্ত।

জয়ন্ত।। কী রকম?

মানিক।। আরে ভাই, বাড়ি ঢোকার মুখে একটা উটকো লোক এসে বললো, আপনি মানিকবাবু তো? আপনার নামে একটা চিঠি আছে। চিঠিটা খুলে পড়তে পড়তে তাকিয়ে দেখি– লোকটা হাওয়া।

জয়ন্ত।। চিঠিটা কি খুব দামি কাগজে লেখা?

মানিক।। হ্যাঁ, মোটা পার্চমেণ্ট কাগজে।

জয়ন্ত।। কালির রঙ সবুজ?

মানিক।। আশ্চর্য!

জয়ন্ত।। মুকুন্দ নন্দীর চুরির তদন্ত থেকে সরে না এলে তোর জিন্দেগি বরবাদ হবে বলে শাসিয়েছে নিশ্চয়ই?

মানিক।। তার মানে, তোর কাছেও এসেছে?

জয়ন্ত।। তা ভাই, একযাত্রায় কী আর পৃথক ফল হবে? ওইতো টেবিলে–

মানিক।। তাহলে? এখন কি করবি ঠিক করলি?

জয়ন্ত।। ভাবছি, বাঁশি বাজাবো। তুই তবলাটায় একটু ঠেকা দে তো।

মানিক।। ইয়ারকি মারিস না। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই আর হালকা নেই।

জয়ন্ত।। কিন্তু এই চিঠিটা পাবার পর বেশ হালকা হয়ে গেছে রে। বুঝলি না তো? ধর, প্রথমত লোকটা চিঠিটা লিখেছে বাঁহাতে। কী করে বুঝলাম?

মানিক।। না, ও বিদ্যেটা তোমার জানা?

জয়ন্ত।। আচ্ছা, এবার আন্দাজ করতো বাঁহাতে কেন লিখলো?

মানিক।। ধরা দিতে চায়নি বলে?

জয়ন্ত।। বেশ। কিন্তু লেখাটা যে খুব পাকা হাতের তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই? অনাভ্যাসের লেখা কী এত পাকা হয়?

মানিক।। এটা অবশ্য একটা পয়েণ্ট। তাহলে?

জয়ন্ত।। তাহলে এক নম্বর, ধরা যাক সে দুহাতেই সমানভাবে লিখতে পারে? দুই, ডানহাতের চেয়ে তার বাঁহাত চলে ভালো? কিংবা তিন নম্বর, ধরো হয়তো তার ডানহাতটাই নেই অথবা থাকলেও অকেজো বলে বাঁহাতে লেখে?

মানিক।। সাবাস!

জয়ন্ত।। চিঠি দুটো বল পেনে নয়, ফাউণ্টেন পেনে লেখা। সবুজ কালি আর দামি কাগজে। এতে বোঝা যায় লোকটি শুধু ধনী নয়, শৌখিনও বটে। তাহলে মোটমাট দাঁড়ালো : পত্রলেখক বাঙালি, বড়োলোক, বিলাসী এবং লেফট হ্যাণ্ডার, মানে বাঁহাতে লেখে। রাইট?

মানিক।। (বিস্ময়ে) গুরু!

জয়ন্ত।। দাঁড়া দাঁড়া, এর চেয়েও গুরুতর আরো কিছু খবর আছে।

মানিক।। আরো?

জয়ন্ত।। লোকটি, মানে যে চিঠি লিখেছে, সে বৈজ্ঞানিক কিনা জানি না, তবে মনে হয় কেমিস্ট্রিতে দখল আছে।

মানিক।। কী করে বুঝলি? কালির রঙ দেখে?

জয়ন্ত।। না। ওই খামের গায়ে এমন কিছু গুঁড়ো লেগেছিল যে খালি চোখে দেখা যায় না। আমার ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখেছি ওগুলো সব কেমিকেল পাউডার। সম্ভবত যেখানে বসে চিঠি লিখেছে সেই টেবিলে ওগুলো ছড়ানো ছিল। অন্যের বাড়ির টেবিলে বসে তো আর কেউ গোপন মৃত্যুর পরোয়ানা লেখে না?

মানিক।। এ যে আলিবাবার গল্পের মতো হলো রে— (হাসে) সেই যে কুনকেতে মোহর আটকে ছিল?

জয়ন্ত।। তা প্রায় সেইরকমই।

মানিক।। তা হলে বুঝতে হবে লোকটা আমাদের খুব একটা নাগালের বাইরে নেই। কেননা মুকুন্দকাকার গদিতে তো আমরা বেশিক্ষণ ছিলাম না, আর বাড়ি ফেরার পথেই চিঠি পেয়েছি? তার মানে সে কাছেপিঠেই ছিল?

জয়ন্ত।। ছিল। এবং কোনো বাড়িতে।

মানিক।। বাড়িতে কী করে বুঝলি?

জয়ন্ত।। ওরে বাবা, গাড়িতে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে লিখলে ওই গুঁড়োগুলো কি লেগে থাকতো চিঠিতে?

মানিক।। তার মানে বোঝা যাচ্ছে অপরাধী এই বাগবাজার অঞ্চলেই থাকে। তাহলে তো তাকে গ্রেপ্তার করা খুব কঠিন হবে না?

জয়ন্ত।। তাই? চারে মাছ এলেই কি ডাঙায় তোলা যায়? যাক, আপাতত ওই কাগজের মোড়কটা খুলে বলতো জিনিসটা কী?

মানিক।। এটা? মনে তো হচ্ছে খানিকটা গঙ্গামাটি।

জয়ন্ত।। রাইট। মুকুন্দ নন্দীর জানলায় লেগেছিল। তাও আবার বাইরের দিকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওখানে এলো কোত্থেকে এই মাটি?

মানিক।। নিশ্চয়ই চোরেদের পায়ে ছিল, জানালা দিয়ে ঢোকার সময়ে লেগেছে?

জয়ন্ত।। অসম্ভব নয়। আর গদি থেকে বাগবাজার অন্নপূর্ণার ঘাটও খুব বেশি দূরে নয়। ... আরে কী আশ্চর্য!

মানিক।। কী হলো?

জয়ন্ত।। ওই দ্যাখ, সেই যে লোকটা আমাকে চিঠি দিয়েছিল—

মানিক।। তাইতো!

জয়ন্ত।। ডাঁকবি?

মানিক।। যদি না আসে?

জয়ন্ত।। যা প্যাকাটি মার্কা চেহারা! দরকার হলে তুলে আনতেও কষ্ট হবে না। তবে ওকে ঠিক চোরেদের দলের লোক বলে তো মনে হচ্ছে না? (চেঁচিয়ে) এই যে ভাই— শুনছো?

লোকটি।। (দূর থেকে) আমাকে?

জয়ন্ত।। হ্যাঁ ভাই, একটা কথা শুনে যাও না?

লোকটি।। আসছি—

জয়ন্ত।। কী বললাম? উটকো লোক!

ডোর বেল। দরজা খোলার শব্দ।

লোকটি।। বলুন স্যার।

জয়ন্ত।। কোথায় থাকো ভাই? কী নাম?

লোকটি।। থাকি কুমোরটুলি। নাম শ্রী কেশবচন্দ্র সেন।

মানিক।। বাপরে, ব্রহ্মানন্দ নও তো? তুমি তো বিখ্যাত লোক হে! কী কর?

লোকটি।। একটা চায়ের দোকানে কাজ করি, আর খাই-দাই ডুগডুগি বাজাই।

জয়ন্ত।। বাঃ! তাহলে তো বেশ ফূর্তিতেই থাকো?

লোকটি।। (হাসে) একটা তো পেট।

মানিক।। আচ্ছা, তুমি আমাদের যে চিঠি দুটো দিলে— সেগুলো কার লেখা?

লোকটি।। কী করে বলবো মশাই? এক ভদ্রলোক চিঠি দুখানা দিয়ে বললেন, 'ওই যে ছোকরা দুটো যাচ্ছে— এই চিঠি দুখানা ওদের দিয়ে এসো,' বলে চিঠি আর দশটা টাকা দিলেন। আপনাদের চিঠি দিলুম আর ফোকোটে আমার দশটা টাকা গস্ত হয়ে গেল?

জয়ন্ত।। কেমন দেখতে ভদ্রলোককে?

লোকটি।। অতশত খেয়াল করিনি। তবে বেশ লম্বাচওড়া মতন। মাঝবয়সি। গায়ের রঙ মাজাঘষা। আর হ্যাঁ, ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা নেই।

মানিক।। এ্যাঁ? ডানহাতের বুড়ো আঙুল নেই? তুমি ঠিক দেখেছ?

লোকটি।। ঠিক-বেঠিক বুঝিনে মশাই, যা দেখেছি বললাম। চলি।

জয়ন্ত।। এসো। আর শোনো— এই নাও দশটা টাকা।

লোকটি।। কী করতে হবে?

জয়ন্ত।। কিচ্ছু না। এই যে তোমাকে ডাকলুম, এতক্ষণ গল্পসল্প করলে, এর একটা দাম নেই?

লোকটি।। গল্পের জন্যে টাকা? ক্যা বাত! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম মাইরি! এই জন্যেই কথায় বলে : খোদা যব দেতা হ্যায়— চলি স্যার, নমস্কার।

দরকার হলে আবার ডাকবেন, গপ্পো করে যাবো, হেঁ হেঁ—

দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

জয়ন্ত।। কী বুঝলে ব্রাদার মানিকচাঁদ?
মানিক।। রিয়েলি জয়ন্ত, য়্যু আর এ জিনিয়াস। আমি বলছি, একদিন তুই শার্লস হোমসের চেয়েও বড়ো ডিটেকটিভ হবি, মিলিয়ে নিস?
জয়ন্ত।। পরে মেলাবো। আপাতত চল, গঙ্গার ধারে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।

দৃশ্যান্তর

নদীর ছলছল শব্দ। দূরে ভাটিয়ালির সুর।

মানিক।। দ্যাখ জয়ন্ত, এই গঙ্গার পাড়ে এলে মনটা আজও কেমন উদাস-উদাস লাগে। এই ছলছল শব্দ আর দূরে ভাটিয়ালির সুর—
জয়ন্ত।। হ্যাঁ, নদীর জোলো হাওয়ায় শুনেছি কবিতার ভাইরাস উড়ে বেড়ায়। নইলে আমার মতো কাঠখোট্টা মানুষেরই বা মনে হবে কেন যে খড়ের নৌকোগুলো যেন কুঁড়েঘর সেজে ভেসে বেড়াচ্ছে?
মানিক।। মন্দ বলিস নি কিন্তু কথাটা।
জয়ন্ত।। আচ্ছা, এখন বলতো ওই বিশাল বজরাটা কার? আরে ওই যে— বয়ার কাছটায় বাঁধা রয়েছে?
মানিক।। ওটা? দেবী চৌধুরানির হতে পারে। যা ডেকোরেশান!
জয়ন্ত।। হা হা, তুইও মন্দ বলিসনি। তবে ভাই, দেবী চৌধুরানির না হলেও আধুনিক কোনো ভবানী পাঠকের হওয়াটা কিন্তু অসম্ভব নয়।
মানিক।। গোয়েন্দাগিরি করতে করতে তোর মাথাটা গেছে জয়ন্ত। ওরে ব্যাটা, বজরা সাজিয়ে ডাকাতি করার দিন অনেককাল আগেই শেষ হয়ে গেছে, বুঝলি?
জয়ন্ত।। কেন, বেশ একটা ভিনটেজ স্টাইলে করলে মন্দ কী? চল, মাঝিদের সঙ্গে একটু গল্প করে আসি।

দৃশ্যান্তর

জলের শব্দ স্পষ্ট। সামান্য কলগুঞ্জন।

জয়ন্ত।। আচ্ছা মাঝিভাই, এই খড়ের নৌকোটা কার?

মাঝি।। আজ্ঞে আমার বাবু। আপনারা কি পাইকার?

জয়ন্ত।। না ভাই, আমার চেনা একজন খড়ের ব্যবসা করবে, তাই একটু খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। তা তোমরা এখানে আছো তো কদিন?

১ম মাঝি।। তা বাবু, মাল খালাস না হওয়া পর্যন্ত তো থাকতেই হবে। এই তো চার-পাঁচ দিন ধরে বসে আছি, ঘাটের ভাড়া গুনে যাচ্ছি, আরো কদিন থাকতে হবে কে জানে? ব্যবসার দিনকাল আর আগের মতো নেই বাবু। বাজার খুব মন্দা।

জয়ন্ত।। আচ্ছা, ওই বজরাটা কার? ভারি সুন্দর দেখতে তো?

১ম মাঝি।। ওখানা কদিন ধরে এ ঘাটেই বাঁধা ছিল। পরশু থেকেই দেখছি ওই বয়ার কাছে নিয়ে গিয়ে নোঙর করেছে। কার কে জানে? তবে চারপাঁচজন বাঙালিবাবু আর একটা হাবসি থাকে ওটাতে।

জয়ন্ত।। (উত্তেজিত) কী বললে? হাবসি? তুমি ঠিক দেখেছ?

১ম মাঝি।। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। মাথায় বেজায় উঁচু। শরীর তো নয় যেন লোহার পাহাড়। আবলুস কাঠের মতো রঙ। দেখলেই গা ছমছম করে।

মানিক।। বাঙালিবাবুর নৌকোয় হাবসি? বলো কী?

১ম মাঝি।। লোকগুলো বোধহয় রাতে ঘুমোয় না বাবু। দিনেরবেলা কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু মাঝরাতে দেখেছি পাড়ে নেমে ঘোরাঘুরি করে। এদিক ওদিক চলে যায়—

জয়ন্ত।। ও। তা তোমরা তো এখন আছ কিছুদিন? মানে আমার সেই পরিচিত লোকটিকে নিয়ে আসতে পারি। তোমার নাম কী?

১ম মাঝি।। আজ্ঞে রতন সাঁপুই। কাল-পরশু পর্যন্ত আছি। নিয়ে আসবেন, ন্যায্য দরেই দেবো, ঠকবেন না।

দৃশ্যান্তর

ডোর বেল বাজলো।

হরি।। কে?

মানিক।। (বাইরে থেকে) আমি মানিক।

দরজা খোলার শব্দ।

হরি।। আসুন।

মানিক।। জয়ন্ত?

হরি।। দাদাবাবু তো দুপুরবেলা বেরিয়েছেন—

মানিক।। বারে! জরুরি দরকার বলে ফোন করে নিজেই হাওয়া?

হরি।। এসে যাবেন এক্ষুনি।

আবার ডোর বেল।

ঐ বোধহয়—

মানিক।। এলো?

হরি।। আজ্ঞে না। দারোগাবাবু। আসুন।

মানিক।। সুন্দরবাবু? আরে, আসুন আসুন স্যার। এমন অসময়ে?

সুন্দর।। যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, তা ভাবলাম ডুমুরফুলদের একটু দেখে যাই।

মানিক।। বেশ করেছেন। সত্যি অনেকদিন দেখা হয়নি। হরিদা, সুন্দরবাবুর জন্যে টোস্ট-ওমলেট আর আমার স্রেফ চা।

হরি।। বসুন স্যার। দাদাবাবু এক্ষুনি এসে পড়বেন।

সুন্দর।। হুম্। শুনলাম তোমরা নাকি মুকুন্দবাবুর কেসটা নিয়ে খুব ঘাম ঝরাচ্ছো?

মানিক।। কই তেমন তো কিছু—?

সুন্দর।। কে জানে বাবা, তোমাদের তো গুণের ঘাট নেই? তিলকে তাল বানিয়ে ছাড়বে। সামান্য একটা চুরির পেটি কেস নিয়ে এত তুলকালাম করার কী আছে হে?

মানিক।। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে তো অনেক সময়ে সাপও বেরিয়ে পড়ে সুন্দরবাবু? এমন তো কতবারই হলো বলুন?

সুন্দর।। হুম্।

ডোর বেল। দরজা খোলার শব্দ।

মানিক।। এই তো জয়ন্ত, দ্যাখ কে এসেছেন?

জয়ন্ত।। (উচ্ছ্বসিত) সুন্দরবাবু? আপনার কথাই ভাবছিলাম মনে মনে।

সুন্দর।। হুম্। তা মনে মনে না ভেবে সশরীরে একবার ভাবনাটা দেখিয়ে এলে পারতে থানায় গিয়ে? তাহলে আর পর্বতকে হাঁপাতে হাঁপাতে মহম্মদের কাছে ছুটে আসতে হতো না?

জয়ন্ত।। আপনি নিজে আমার ঘরে এলেন এ কী আমার কম সৌভাগ্য? হরিদা—

মানিক।। হরিদা দেখে গেছেন, তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

জয়ন্ত।। আচ্ছা, একটা খবর আমাকে দিতে পারেন সুন্দরবাবু?

সুন্দর।। কী?

জয়ন্ত।। সকালে বাগবাজার অন্নপূর্ণার ঘাটের কাছে দেখছিলাম একটা ভারি সুন্দর বজরা বাঁধা আছে। দিন তিন-চার ধরেই নাকি রয়েছে। ওটা কার জানেন?

সুন্দর।। বজরা? হবে কারো। আমি কি জলপুলিশ নাকি? কেন বলোতো? কোনো খবর আছে?

জয়ন্ত।। এখনো জানি না। তবে একটু যেন কটুগন্ধ পাচ্ছি। ইচ্ছে আছে—

সুন্দর।। একটু বনের মোষ তাড়াবে? তা তাড়াও গে যাও, আমাকে জ্বালিও না। এই যে হরি,— এসো। হ্যাঁ, এখানে রাখো। ... বাঃ! ছেলেবেলায় একটা গান শুনেছিলাম জানো হরি?

হরি।। কী গান দারোগাবাবু?

সুন্দর।। 'হরির কৃপায় দশ জনে খায়, আমরা কেন খাবো না?' তা,— তোমাকে দেখলেই আমার সেই গানটা মনে পড়ে।

সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

জয়ন্ত।। তা বেশ তো। হরির কৃপায় আপনি মন দিয়ে সেবা করুন, আমি বরং ততক্ষণ পাশের ঘরে গিয়ে গোটাকয়েক জরুরি টেলিফোন সেরে নিই।

সুন্দর।। হুম্। তথাস্তু।

দৃশ্যান্তর

জল ও পরিবেশানুগ শব্দ।

জয়ন্ত।। (চেঁচিয়ে) ও মাঝি, ভাড়া যাবে নাকি?

২য় মাঝি।। (দূর থেকে) কোনদিকে যাবেন বাবু? এদিকে আসুন।

জয়ন্ত।। (কাছে এসে) বিশেষ কোথাও না— এই একটু এদিক-ওদিক ঘুরে গঙ্গার হাওয়া খাবো দুই বন্ধু।

২য় মাঝি।। চলুন বাবু, এ সময়টায় গঙ্গার হাওয়া খুব মিঠে।

দাঁড় টানার শব্দ। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে দুই বন্ধু।

মানিক।। সকালে মাঝিদের মুখে যা শুনলাম জয়ন্ত, তাতে তো বজরার লোকগুলোর আচরণ বেশ গোলমেলে বলেই মনে হচ্ছে এখন। এ রকম একটা বজরা দিনের পর দিন এখানেই বা নোঙর করে আছে কেন? মুকুন্দকাকার গদি

তো এখান থেকে খুব দূরে নয়?

জয়ন্ত।। তাছাড়া একজন হাবসিও থাকে বজরায় শুনলি তো? ,

মানিক।। হ্যাঁ সেটাও আশ্চর্য! বাঙালি-হাবসি কমবিনেশন তো খুব একটা নজরে পড়ে না? তাছাড়া হাবসি শুনেই তুই যে রকম একসাইটেড হয়েছিলি—

জয়ন্ত।। ইয়েস, তোকে বলা হয়নি, মানে বলার তেমন কোনো কারণ খুঁজে পাইনি, সেটা হচ্ছে নন্দীমশাইয়ের জানলার গরাদে সেদিন আমি কয়েকগাছা চুল পেয়েছিলাম।

মানিক।। চুল?

জয়ন্ত।। হ্যাঁ কালো মোটা কোঁকড়ানো চুল। মাইক্রোস্কোপে দেখে ওগুলো তো কোনো কাফ্রিজাতের মাথার চুল বলেই মনে হচ্ছে।

মানিক।। বলিস কী? এতো সাংঘাতিক প্রমাণ?

জয়ন্ত।। কাল পর্যন্ত এর অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। সকালে মাঝির কথায় এবার যেন একটু আলো দেখতে পাচ্ছি।

মানিক।। ওই দ্যাখ জয়ন্ত, পাড়ে দাঁড়িয়ে একটা লোক ঘন-ঘন একটা লাল কাপড় ওড়াচ্ছে।

জয়ন্ত।। হুম্, সিগনালিং। আমরা বজরার দিকে যেতে পারি ভেবে মনে হয় সাবধান করে দিচ্ছে—

মানিক।। আই সি। তার মানে ডালমে কুছ কালা হ্যায়?

জয়ন্ত।। রিভলবারটা সঙ্গে এনেছিস তো?

মানিক।। হুঁ।

জয়ন্ত।। অ্যালার্ট থাকবি। যে কোনো মুহূর্তেই বিপদ আসতে পারে। (গলা তুলে) ও মাঝি—

২য় মাঝি।। বলুন বাবু—

জয়ন্ত।। ওই যে বজরটা দেখছ, ওর পাশ দিয়ে গিয়ে এগিয়ে চলো তো!

জল ও দাঁড়ের শব্দ আরো স্পষ্ট হয়।

মানিক।। এ কী বজরা রে জয়ন্ত, এতো 'ফ্লোটিং প্যালেস'? বাপের জন্মে তো এমন বজরা দেখিনি ভাই?

জয়ন্ত।। যা বলেছিস। কাশ্মীরের হাউস বোটগুলোও সুন্দর। কিন্তু সে শুধু ভেতরটা। তাছাড়া ওগুলো একতলা। এটি আবার দোতলা।

মানিক।। ছাদটা দেখেছিস কেমন চকচকে পেতলের রেলিং দিয়ে ঘিরে দিয়েছে? চারপাশে আবার কতোরকম ফুলের টব। বেশ রুচি আছে কিন্তু ভদ্রলোকের।

জয়ন্ত।। বাইরেটা যার এই— ভেতরটা না জানি কেমন।

ভবতোষ।। সেটা ভেতরে এলেই বুঝতে পারবেন।

মানিক।। কে?

ভবতোষ।। আমি। এ বজরার মালিক। বজরা দেখবেন তো? তা বাইরে কেন? ভেতরে আসুন? (গলা তুলে) ওরে কে আছিস— বাবুদের বজরায় তুলে নে। আসুন ভাই। অ্যা-অ্যা-অ্যাই— ব্যাস। যা— ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে ভালো করে দেখিয়ে দে। যান ওর সঙ্গে।

আবহসংগীতে আনন্দের সুর।

ভবতোষ।। (সামান্য বিরতির পরে) কেমন দেখলেন?

মানিক।। অসামান্য। বলা যায়, এ একটা অভিজ্ঞতা! কী নেই আপনার বজরায়? এতো প্যারাডাইস।

ভবতোষ।। হা হা— আপনাদের ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। আসলে এখনকার বাবুদের শখ হলো লঞ্চ বা মোটরবোট এই সব কেনা। ওসব কলকবজার জিনিস আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। একবার বিগরোলেই গেল। তাছাড়া এর মধ্যে কেমন একট বনেদি ভাবও আছে, বলুন? আশ্চর্য! আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন?

জয়ন্ত।। হ্যাঁ বসছি। আপনার এ ঘরটা তো দেখছি বইয়ে ঠাসা!

ভবতোষ।। হ্যাঁ, এটা আমার মোবাইল স্টাডি বলতে পারেন। যখন বজরায় থাকি—

জয়ন্ত।। আপনার খুব পড়াশোনার শখ, না?

ভবতোষ।। ওই একটুআধটু। ভালো লাগে।

মানিক।। চমৎকার। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর কমবিনেশান। রেয়ার স্পেসিমেন।

জয়ন্ত।। ওদিকের টেবিলে আবার বকযন্ত্র, মাইক্রোস্কোপ, টেস্টটিউব— এ সবও রয়েছে দেখছি!

ভবতোষ।। ওটাও বাতিক। অল্পসল্প কেমিস্ট্রির চর্চা—

জয়ন্ত।। হ্যাঁ, এখানে অনেকগুলো কেমিস্ট্রির বইও দেখছি। আসলে এই সাবজেক্টটা আমাকেও খুব টানে।

ভবতোষ।। তাই? বাঃ!

জয়ন্ত।। কিছু যদি মনে না করেন— দু-চারটে লেটেস্ট বইয়ের নাম লিখে দিলে—

ভবতোষ।। এ আর বেশি কী? এখুনি দিচ্ছি। ... এই নিন।

জয়ন্ত।। ধন্যবাদ। এতক্ষণ রইলাম, আলাপপরিচয় হলো, অথচ নামটা—

ভবতোষ।। ভবতোষ মজুমদার। নিবাস— বাগবাজার।

২য় মাঝি।। (বাইরে থেকে) বাবু শিগগির আসুন— আকাশে মেঘ জমেছে। ভীষণ ঝড়

উঠবে—

মানিক।। বলে কী? ঝড়? তাহলে চলি স্যার।

জয়ন্ত।। আলাপ করেও বেশ ভালো লাগলো। চলি, পরে আবার দেখা হবে? নমস্কার।

দৃশ্যান্তর

মেঘগর্জন। জলকল্লোল। ঝড়ের শব্দ।

২য় মাঝি।। শক্ত করে ধরে বসুন বাবু, ভীষণ ঝড় উঠেছে! আপনারা সাঁতার জানেন তো?

জয়ন্ত।। জানি, তুমি চালাও।

মানিক।। কাজটা বোধহয় বুদ্ধিমানের মতো হলো না রে জয়।

জয়ন্ত।। ওই বজরার চেয়ে এই ঝড় অনেক ভালো মানিক— যা হবার হবে।

মানিক।। ওই দ্যাখ জয়, একটা স্পিডবোট আমাদের লক্ষ করে ছুটে আসছে।

জয়ন্ত।। সর্বনাশ! ওই তো সেই কাফ্রি! জলে ঝাঁপ দে মানিক।

জলে ঝাঁপ দেবার শব্দ। স্পিড বোট এগিয়ে আসছে।

জয়ন্ত।। ডুব সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চল—

মানিক।। কতক্ষণ?

জয়ন্ত।। যতক্ষণ পারা যায়।

জলকল্লোল। ঝড়ের শব্দ। স্পিড বোট এগোচ্ছে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ। মাল্লাদের চিৎকার।

মানিক।। যাঃ! নৌকোটাকে গুঁড়িয়ে দিল বোটটা। আবার এদিকে আসছে—

জয়ন্ত।। ফায়ার, মানিক ফায়ার।

পরপর কয়েকটি গুলির শব্দ। ঝড় ও জলকল্লোল। স্পিড বোটের শব্দ দূরে সরে যাচ্ছে।

দৃশ্যান্তর

মানিক।। কীরে জয়ন্ত, ঘুমোচ্ছিস নাকি?

জয়ন্ত।। চোখ বুজে থাকলেই ঘুমোয় নাকি লোকে? কালকের ঘটনাটা ভাবছিলাম।

মানিক।। কালকের কথা আর মনে করাস নে ভাই। ওই ব্যাটা যমদূতের মতো কাফ্রির হাত থেকে যে জান নিয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছি এ আমাদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি। উঃ! ব্যাটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন! মানুষ খুন করার জন্যে শয়তানটা কিনা কাফ্রি পুষেছে?

জয়ন্ত।। উপায় কী? ওই মোটা শিক বাঁকিয়ে ঘরে ঢোকা, দোতলা থেকে মানুষ ছুঁড়ে ফেলা, ডবলব্রেস্ট সিন্দুক ভেঙে মাল হাতানো-- এ তো আর যার তার কম্মো নয়—

মানিক।। কিন্তু স্পিড বোট নিয়ে মুহূর্তে লোকটা কোথায় পালালো বলতো?

জয়ন্ত।। পোর্ট-পুলিশে খবর দিলেই ওটার হদিশ মিলবে।

মানিক।। তবু আমার মনে কিন্তু একটা খটকা থেকেই গেল জয়ন্ত।

জয়ন্ত।। কী?

মানিক।। বইয়ের নামগুলো কিন্তু ভবতোষ মজুমদার আমাদের সামনে বসে ডান হাতেই লিখলেন, কালো কালিতে এবং হাতে তার সব কটা আঙুলই আছে। ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে না?

জয়ন্ত।। না। আমি দেখে নিয়েছি ওর লেখা কাগজ আর আমাদের চিঠির সেই কাগজ একই। তবে হাতের লেখাটা অন্য লোকের।

টেলিফোনের শব্দ।

জয়ন্ত।। হ্যালো— কে? সুন্দরবাবু? ... থানা থেকে বলছেন? ... চুরি হয়েছে? ... আচ্ছা ... ও... হুঁ হুঁ... আচ্ছা। ... আপনি আসছেন? ... ঠিক আছে। ও. কে.।

মানিক।। কী বলছেন সুন্দরবাবু? কোথায় চুরি হয়েছে?

জয়ন্ত।। বাগবাজারে, সদানন্দবাবুর বাড়ি। চিনিস?

মানিক।। চিনি বইকি। বিরাট ধনী। হাড়কেপ্পন। জুয়েলারি ব্যবসা আছে। সুদে টাকা খাটায়। চুরি কবে হয়েছে?

জয়ন্ত।। কাল রাতে।

মানিক।। হবে না? অমন পেল্লায়বাড়িতে একটা চাকর আর একজন বুড়ো দরোয়ান ছাড়া জনমনিষ্যি থাকে না।

জয়ন্ত।। ছেলেমেয়ে?

মানিক।। একমাত্র মেয়ে— সে তো শ্বশুরবাড়িতে। আর বোসবাবু বহুকাল বিপত্নীক। শুনেছি রান্নার একজন ঠিকে লোক আছে, রেঁধেবেড়ে দিয়ে চলে যায়।

জয়ন্ত।। তুই তো দেখছি সদানন্দবাবুর কুষ্ঠি-ঠিকুজি সবই জানিস?

মানিক।। পাড়ার লোক তো?

জয়ন্ত।। ঠিক আছে চল, সুন্দরবাবুর জরুরি তলব।

দৃশ্যান্তর

সদানন্দ।। ভিমরতি মশাই, ভিমরতি! নইলে বুড়ো বয়েসে কেউ রাত জেগে থিয়েটার দেখতে যায়? ওই ব্যাটা বটুক পাকড়াশি, আমাদের পাড়ার হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, আমাকে খুব মানেগোনে— বল্লে, দাদা— থিয়েটারের দুখানা ফ্রি-পাশ পেয়েছি, চলুন— দেখে আসি।

জয়ন্ত।। কখন ফিরলেন বাড়িতে?

সদানন্দ।। তখন একটা-দেড়টা হবে বোধকরি। শিবরাত্তির ছিল তো? হোল নাইট থিয়েটার। তা আমার ভালো লাগছিল না, উঠে এলাম। তা এসে তো এই অবস্থা। হায় হায় হায়....

মানিক।। এত বড়ো একটা কাণ্ড ঘটে গেল, বাড়িতে কেউ টের পায়নি?

সদানন্দ।। তাই তো বলছে। দরোয়ান, চাকর সব ঘুমোচ্ছিল নিচে। উঠে দরজা খুলে দিলে। আমার ঘর তো দোতলায়? দরজা খুলে ঢুকতে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরলো সেই শেষরাত্তিরে। তখন তো যা হবার হয়ে গেছে। হায় হায় হায়....

সুন্দর।। এই যে শখের টিকটিকিরা এসে গেছ? থ্যাঙ্ক য়্যু। তা চোরের কোনো হদিশ করতে পারলে?

জয়ন্ত।। আপনার আগে আমরা চোর ধরবো? সেটা কি সম্ভব না সংগত?

সুন্দর।। (খুশি) হুম্, বাক্যবাগীশ।

স্বল্প বিরতির আবহসুর।

সদানন্দ।। দেখলেন তো সব? হায় হায় হায়....

সুন্দর।। ধ্যাত্তেরি। মহরমের মিছিলের মতন অমন হায় হায় করে বুক চাপড়াবেন না তো? কাজের কথা বলুন, কী কী চুরি গেছে?

সদানন্দ।। যথাস্বর্বস্ব স্যার, যথাসর্বস্ব। হায় হায় হায়...

সুন্দর।। ফের? যথাসর্বস্ব রেখেছিলেন কেন সিন্দুকে? চোরকে লোভ দেখিয়ে পুলিশকে দৌড় করবার জন্যে? যত্তোসব। লিস্টি দিন। তা হঠাৎ ঘরে ঢুকে কচি খোকার মতো অজ্ঞান হতে গেলেন কেন?

সদানন্দ।। কী করে জানবো স্যার? ঢুকতেই সারা শরীরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠলো। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

সুন্দর।। রাবিশ। কোনো লোক দেখতে পাননি?

সদানন্দ।। অন্ধকার ছিল যে! তায় আবার শিবরাত্তির।

সুন্দর।। দরোয়ান চাকরও বোধহয় কিছু জানে না?

সদানন্দ।। তাই তো বলছে।

সুন্দর।। হুম্। সব কটাকে চালান দেবো। আরে জয়ন্ত, তুমি আবার মেঝের উপরে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলে কেন?

জয়ন্ত।। এখানে কিছু কাচের টুকরো পড়ে আছে, কুড়িয়ে রাখছি।

সদানন্দ।। কাচের টুকরো? আমার ঘরে?

জয়ন্ত।। এই তো, দেখুন না?

সুন্দর।। এতো দেখছি হালকা পাতলা কিছু কাঁচের গুঁড়ো? টুকরো কই? এগুলো কি হীরকচূর্ণ ভাবলে নাকি হে?

জয়ন্ত।। হিরে ভাবলে কি আর এত যত্ন করে নিয়ে যেতাম? সদানন্দবাবু?

সদানন্দ।। বলুন?

জয়ন্ত।। আপনার ওই কুঁজোর পাশে দেখছি একটা কাচের গ্লাসে আধগ্লাস জল রয়েছে, আপনি খেয়েছেন?

সদানন্দ।। কই না? গ্লাসটা তো কুঁজোর মুখেই ঢাকা দেওয়া ছিল? ওখানে এলো কী করে?

জয়ন্ত।। মানিক, ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা একটু দে তো ভাই।

মানিক।। এই নে।

সুন্দর।। সাবাস শার্লক হোমস। এটা তো সত্যিই আমার মাথায় আসেনি? ওতে ছাপটাপ কিছু পেলে নাকি আঙুলের?

জয়ন্ত।। ছাপ আছে, তবে সেটা চোরের কিনা জানিনা। ওটা আপনি নিয়ে যান। পরীক্ষার রিপোর্টটা পেলে তখন বোঝা যাবে।

সুন্দর।। হুম্।

জয়ন্ত।। চলো হে মানিক। সুন্দরবাবু, সময় করে একবার যদি আমার ওখানে আসেন, মনে হয় আপনাকে কিছু নতুন খবর শোনাতে পারবো।

সুন্দর।। হুম্। তথাস্তু।

দৃশ্যান্তর

সুন্দর।। নাঃ, পুলিশের চাকরিটা এবার ছেড়েই দিতে হবে দেখছি, বুঝলে জয়ন্ত?

জয়ন্ত।। কেন আবার কী হলো?

সুন্দর।। দূর দূর— একি একটা জীবন? সকাল থেকে রাত অবধি তেত্রিশটা চুরি, বেয়াল্লিশটা রাহাজানি, ছেষট্টিটা ছেন্তাই— মাথা খারাপ করে দিলে ভায়া? মন দিয়ে যে একটু ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া করবো, ঠাকুরদেবতার নাম

করবো, তার উপায় আছে? লাইফটা আমার লা মিজারেবল করে ছাড়লে?

জয়ন্ত।। (গলা তুলে) হরিদা— সুন্দরবাবু এসেছেন— (সুন্দরকে) ঠাকুরদেবতার যোগান দিতে না পারি অন্ততঃ দারোগাভোজন করিয়ে একটু পুণ্যসঞ্চয় করতে দিন।

সুন্দর।। থ্যাঙ্ক য়্যু। তা তোমার মানিকজোড়টিকে দেখছি না?

জয়ন্ত।। আসবে এখুনি। একটা কাজে গেছে।

সুন্দর।। যাক, কিছু হদিশ করতে পারলে?

জয়ন্ত।। দেখুন সুন্দরবাবু, দেশে আজকাল বৈজ্ঞানিক চোরের উৎপাত বেড়েছে মানেন তো?

সুন্দর।। বৈজ্ঞানিক চোর? মানে, সোনার পাথরবাটি? শাকের আবার ক্যাশমেমো। হা হা, সত্যি জয়ন্ত, ওই বাজে ডিটেকটিভ বইগুলো পড়ে তোমার মাথাটি গেছে! হা হা, বৈজ্ঞানিক চোর! হা হা—

জয়ন্ত।। হাসছেন? আচ্ছা, বলুন তো, এই যে পেল্লায় পেল্লায় সিন্দুক ভেঙে সব চুরি হলো, কেউ টের পেলো না— সেটা কী ভাবে হলো? কী দিয়ে খুললো?

সুন্দর।। আরে চোরেদের কাছে কত রকম যন্ত্রপাতি থাকে— ছেনি হাতুড়ি বাটালি—

জয়ন্ত।। তাহলে তো শব্দ হতো, আর সিন্দুকও ভাঙাচোরা অবস্থায় থাকতো।

সুন্দর।। তা বটে।

জয়ন্ত।। ওগুলো খোলা হয়েছে অক্‌সি-অ্যাসিটাইলিন টর্চ দিয়ে। ওতে কোনো শব্দ হয় না, অথচ তালা খুলে যায়। বিদেশ থেকে আমদানি।

সুন্দর।। মাই গুডনেস! বলো কী?

জয়ন্ত।। আর সেদিন সদানন্দবাবুর ঘরে যে কাচের টুকরোগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো আমার ল্যাবে পরীক্ষা করেছি।

সুন্দর।। সেও সাংঘাতিক কিছু নাকি?

জয়ন্ত।। অবশ্যই। ছোটো বালবের মতো কাচের টিউবে ভরা ছিল হাইড্রোজেন আর্সেনাইড। মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস। বন্ধ ঘরে ছুঁড়ে মারলে এক পলকে দশ-বিশজন মানুষের জীবনহানি হতে পারে। তবে এর স্থায়ীত্ব খুব অল্প সময়ের, এই যা রক্ষে। হ্যাঁ, এটাও বাইরের।

সুন্দর।। হুম্। চাকরি তাহলে আমাকে—

জয়ন্ত।। পরে ছাড়বেন— আগে বলুন, আমার সেই কাচের গ্লাসের ফিঙ্গারপ্রিন্টের রিপোর্ট পেয়েছেন?

সুন্দর।। আজকেই পেয়ে যাবো মনে হচ্ছে। তা ওটাতেও কোনো গ্যাস-ট্যাস আন্দাজ করছ নাকি ভায়া?

জয়ন্ত।। আমার কাছে আন্দাজের কোনো দাম নেই সুন্দরবাবু, সবটাই প্রমাণ-

সাপেক্ষ।

সুন্দর।। তা কী প্রমাণ পেলে?

জয়ন্ত।। এখনো পাইনি, সেইজন্যেই তো রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছি। গ্লাসটা যে ধরেছিল, সে বাঁ-হাতে ধরেছিল যা আমরা সাধারণত করি না। অবশ্য লেফটহ্যাণ্ডার হলে আলাদা কথা।

সুন্দর।। হুম্। ধরো, যদি তাই হয়?

জয়ন্ত।। আমাদের যে চিঠি পাঠিয়েছিল সেও লিখেছিল বাঁ-হাতে। পরে অবশ্য জানতে পেরেছি তার ডানহাতের বুড়ো আঙুল নেই। ধরুন ওই হাতের সঙ্গে যদি পুরোনো কারো ছাপ মিলে যায় এবং প্রমাণ হয় (হঠাৎ চিৎকার করে) সুন্দরবাবু—

দড়াম করে একটা শব্দ হলো।

সুন্দর।। (আর্তনাদ করে) উঃ! আঃ! এটা কী রকম রসিকতা হলো জয়ন্ত? ধাক্কা মেরে আমাকে ঘরের বাইরে ফেলে দিলে? কপালটা এমন ঠুকে গেল... উঃ! না না, এসব আমি পছন্দ করি না।

জয়ন্ত।। স্যরি সুন্দরবাবু— উপায় ছিল না। আপনার কপাল ভালো, তাই এ যাত্রা ওই কপালঠোকার ওপর দিয়েই গেল।

সুন্দর।। মানে?

জয়ন্ত।। ওখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে আপনাকে আর জ্যান্ত দেখতে পেতাম না।

সুন্দর।। কী পাগলের মতো বকছ?

জয়ন্ত।। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে কী ছুঁড়েছিল জানেন? হাইড্রোজেন আর্সেনাইড।

সুন্দর।। এ্যাঁ?

জয়ন্ত।। হ্যাঁ, আড়াল থেকে কেউ আমাদের কথা শুনছিল—

সুন্দর।। সব্বোনাশ। দুগ্গা দুগ্গা।

জয়ন্ত।। চলুন, এখন ঘরে যেতে পারি।

সুন্দর।। না না ভায়া, ওর মধ্যে আমি আর নেই। পৈতৃক প্রাণ নিয়ে খেলা?

জয়ন্ত।। ভয় নেই। ওই গ্যাস কয়েক সেকেণ্ডের বেশি স্থায়ী হয় না। আসুন।

সুন্দর।। বলছ?

জয়ন্ত।। এই তো আমি ঢুকছি। ভয় নেই, আসুন। ওটা কী বলুন তো সুন্দরবাবু?

সুন্দর।। কী আবার, বেড়াল? হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে?

জয়ন্ত।। হ্যাঁ, তবে ওর ওই ঘুম আর ভাঙবে না। বেচারি বোধহয় ইঁদুরটিঁদুর ধরার জন্যে এ ঘরে ঢুকেছিল।

সুন্দর।। হুম্, বুঝলাম। তোমার ওই আর্সেনাইডের জন্যে এবার বোধহয় চাকরিটা—
জয়ন্ত।। ছাড়তেই হবে? হা হা হা—

দৃশ্যান্তর

আবহসুরে স্বল্প বিরতি।

মানিক।। মুকুন্দ আর সদানন্দ বসু, পরপর এই দুজনের বাড়িতে যে চুরি হলো— তোর ধারণা, এ দুটোর মূলেই রয়েছে ওই ভবতোষ মজুমদার?
জয়ন্ত।। ভেবে নিতে দোষ কী?
মানিক।। না, তা ঠিক নয়— তবে সেই চার-আঙুলের লোকটার হদিশ না পাওয়া পর্যন্ত— মানে সেটা তো আর ভবতোষ নয়!

ডোর বেল। বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে।

জয়ন্ত।। সুন্দরবাবু।
মানিক।। কী করে বুঝলি?
জয়ন্ত।। বাব্বা! হাতির পায়ে জুতো নেই, সুন্দরবাবুর পায়ে বুট আছে, তাও শুনতে পেলি না? আশ্চর্য!

দরজা খোলার শব্দ।

জয়ন্ত।। আসুন আসুন সুন্দরবাবু, আপনার কথাই হচ্ছিল। অনেক দিন বাঁচবেন।
সুন্দর।। আমার কথা বাদ দাও। কিন্তু তোমার মতো ম্যাজিশিয়ানের কিন্তু অনেকদিন বাঁচা দরকার হে!
মানিক।। ম্যাজিশিয়ান?
সুন্দর।। নিশ্চয়ই? হয় ম্যাজিশিয়ান, নয় গণৎকার। নইলে কী করে বললে, কাচের গ্লাসে যার হাতের ছাপ আছে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল নেই?
জয়ন্ত।। (উত্তেজিত) সত্যি বলছেন?
সুন্দর।। হুম্। আজই রিপোর্ট পেলাম। যার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে পুলিশের খাতায় সে খুব পুরোনো পাপী। তার নাম বলরাম চৌধুরী। সত্যিই তার ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা নেই। গ্লাসে তাই বাঁহাতেরই ছাপ ছিল।
মানিক।। তাহলে ভবতোষ মজুমদার নয়, বলরাম চৌধুরী? ব্যাপারটা যে আবার গুলিয়ে গেল রে জয়?

জয়ন্ত।। ধীরে বন্ধু ধীরে। রজনী এখনো বাকি। আগে বলরাম সম্পর্কে জানি? বলরাম-চরিতটা তাহলে একটু শোনান সুন্দরবাবু?

সুন্দর।। বলরাম একটা ভয়ংকর লোক। পঁচিশ বছর আগে সে একটা খুনের মামলার আসামি হয়। কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। বিশ বছর আগে একটা ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ে। সেখানেও খালাস পেয়ে গেল। উনিশ বছর আগে বড়োবাজারে এক রাহাজানি কেসে ধরা পড়ে তিন বছর জেল হয়। জেলে থাকতেই এক হাবসির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়।

মানিক।। (উত্তেজিত) হাবসি? হাবসির সঙ্গে বন্ধুত্ব?

সুন্দর।। হ্যাঁ। আর তাকে নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই জেল ভেঙে পালিয়ে যায়।

মানিক।। খুবই সম্ভব। ওটি যা চিজ।

সুন্দর।। চেনো নাকি?

জয়ন্ত।। পরে বলছি। আপনি বলে যান।

সুন্দর।। তারপর এক বছরের মধ্যে পরপর তিনটে খুন, চারটে ডাকাতি করেছে। কিন্তু আজও পুলিশ তাদের হদিশ পায়নি। গত ষোলো বছরের মধ্যে তেমন কোনো খবরও ছিল না। ভেবেছি, মরেটরে গেছে। কিন্তু এতকাল পরে আবার—

জয়ন্ত।। বলরামের কোনো ছবিটবি নেই পুলিশের খাতায়?

সুন্দর।। আছে বই কী? সব এনেছি তোমার জন্যে। ছবি, ইতিহাস— সব। শুধু ওর ভূগোলটা বুঝতে পারছি না, কোন অঞ্চলে বিরাজ করছিল এতকাল! চেহারা দেখলে আঁতকে উঠবে হে! এই দ্যাখো।

জয়ন্ত।। আরি ব্বাস! এ কী বীভৎস চেহারা রে মানিক?

মানিক।। এ তো ভবতোষ নয় জয়?

জয়ন্ত।। না। বলরাম চৌধুরী। কিন্তু এতো অসম্ভব, সুন্দরবাবু?

সুন্দর।। কোনটা?

জয়ন্ত।। এই ছবিটা দ্যাখ মানিক? পঁচিশ বছর আগে তোলা। পিছনে লেখা আছে, তখনই নাকি ওর বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর।

মানিক।। তার মানে, এখন সত্তর? তাহলে সেই কাফ্রির বয়সও তো ওরই কাছাকাছি?

জয়ন্ত।। হিসেবে তো তাই বলে?

সুন্দর।। কিন্তু আঙুলের ছাপ তো আর মিছে কথা বলবে না ভায়া। দুজনের ফিঙ্গার প্রিন্ট কি কখনো এক রকম হয়?

জয়ন্ত।। সে তো বটেই। সেইখানেই তো ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

সুন্দর।। আরে, এইসব ক্রিমিন্যাল একশো বছর বয়েসেও ডাকাতি করতে পারে।

জয়ন্ত।। সে কথা হচ্ছে না। যে লোকটা ওই আঙুলকাটা বলরামকে দেখেছে, সে

কিন্তু মোটেই ওকে বুড়ো বলেনি। বলছে মাঝবয়েসি।

সুন্দর।। তাহলে ধরে নাও সেটা ছিল ওর ছদ্মবেশ?

জয়ন্ত।। তাই কি?

মানিক।। (হঠাৎ চিৎকার করে) জয়ন্ত— সাপ!

জয়ন্ত।। সে কী?

সুন্দর।। বাপরে!

হুড়মুড় করে কিছু পড়ে যাবার শব্দ। পরপর দুবার গুলি।

জয়ন্ত।। কী ভয়ংকর! এতো পাহাড়ি পাইথন! সরে যা মানিক। মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেছে কিন্তু শরীরটা এখনো বেঁচে আছে। ল্যাজের চাপে গুঁড়িয়ে দেবে।

আবার গুলির শব্দ। কিছুক্ষণ যেন ভাঙচুর চলতে থাকে।

মানিক।। সুন্দরবাবু কোথায়? সুন্দরবাবু? (চিৎকার করে) সুন্দরবাবু—

সুন্দর।। (ক্ষীণস্বরে) মরেছে?

মানিক।। হ্যাঁ। আপনি কোথায়?

সুন্দর।। এইতো খাটের নিচে। আটকে গেছি, বেরোতে পারছি না।

মানিক।। ঠিক আছে, আমি ধরছি, আসুন।

সুন্দর।। (হাঁপাতে হাঁপাতে) এ তোমার কী ধরনের রসিকতা জয়ন্ত?

জয়ন্ত।। রসিকতা?

সুন্দর।। বাড়ির মধ্যে এরকম পাইথন পুষে রেখেছ?

জয়ন্ত।। আমি পুষবো কেন? পিছনের বাগান দিয়ে কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে। আসলে আমাদের খুন করতে চেয়েছিল।

সুন্দর।। দেড়-দু মন ওজনের এই অজগর দোতলায় ঢুকিয়ে দেওয়া তো যে সে লোকের কম্মো নয়?

মানিক।। মনে হয়, এখানেও সেই কাফ্রি!

সুন্দর।। আমি চললুম জয়ন্ত, তোমার বাড়ি আর আসছি না।

জয়ন্ত।। কেন?

সুন্দর।। আবার জিগ্যেস করছ? এ তো জতুগৃহ হে! সেদিন গেল হাইড্রোজেন আর্সেনাইড না কি বললে... আজ আবার হ্যারিসন রোডের মতো ময়াল। এরপর কোনদিন দেখবো আফ্রিকার সিঙ্গি গণ্ডার হাতি হিপো ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। দু-দুবার ফাঁড়া কেটেছে, এবার লাস্ট স্ট্রোকটা বাকি। কথায় বলে, বারবার তিনবার। না হে— আর নয়, নমস্কার।

হরি।। এত গুলিগোলার শব্দ কেন দাদাবাবু? ওরে বাব্বা! এ কী!

জয়ন্ত।। মৃত্যুদূত। খুব জোর বেঁচে গেলাম হরিদা।

হরি।। এত বড়ো সাপ?

সুন্দর।। সাপ নয় হে হরি, ওকে বলে অভিশাপ!

মানিক।। চামড়াটা ট্যান করিয়ে জুতো বানাবেন নাকি সুন্দরবাবু?

সুন্দর।। রসিকতার একটা সময় আছে মানিক? আমি চললুম।

জয়ন্ত।। বসুন বসুন সুন্দরবাবু, হরিদার হাতের চা ফেলে চলে গেলে নরকে পচতে হবে। বসুন।

হরি।। কিন্তু বাগানের দিকের গেটটা তো বন্ধ থাকে দাদাবাবু? খুললো কে?

জয়ন্ত।। সেটাই তো ভাবছি। মালি এসেছিল?

হরি।। না? সে তো দেশে গেছে!

হঠাৎ গুলির শব্দ।

জয়ন্ত।। (আর্তনাদ) আঃ!

সকলে।। গুলি চলছে, গুলি!

জয়ন্ত।। শুয়ে পড়ো সবাই।

স্বল্পবিরতির আবহ সুর।

জয়ন্ত।। না, থেমে গেছে।

মানিক।। এ কী, তোর গাল দিয়ে যে রক্ত পড়ছে রে জয়ন্ত?

জয়ন্ত।। হ্যাঁ, ওইটুকুর ওপর দিয়েই বোধহয় এ যাত্রা বেঁচে গেলাম রে মানিক। কপালে লাগলেই হয়েছিল আর কী! ... আমারই বোকামি। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বাগানটা দেখতে গেলাম। কী করে বুঝবো বল, অত বড়ো পাইথন ছেড়ে দেবার পরেও ব্যাটারা ঘাপটি মেরে বসে থাকবে?

সুন্দর।। আমি এক্ষুনি থানা থেকে পুলিশ পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করছি। না না, এ রকম অরক্ষিত অবস্থায় থাকার কোনো মানে হয় না। দেখি টেলিফোনটা? (ডায়াল করে) হ্যালো, হ্যালো... শ্যামপুকুর পি. এস.? ... হ্যাঁ, আমি বড়বাবু বলছি..... হ্যালো...

দৃশ্যান্তর

জয়ন্ত।। তুমি ভূত দেখেছ হরিদা?

হরি।। ভূত। কী রকম ভূত দাদাবাবু?

জয়ন্ত।। ভূত ভূতই। তার আবার রকমসকম কী?

হরি।। আছে না? গেছো-ভূত, মেছো-ভূত, মামদো-ভূত, শাকচুন্নি— সে কী এক রকম?

জয়ন্ত।। এ সব তুমি দেখেছ?

হরি।। অনেককাল তো দেশে যাইনি—

জয়ন্ত।। তাতে কী?

হরি।। কলকাতায় এত হট্টগোলে ভূত টিকতে পারে নাকি? নির্জন জায়গা ছাড়া ওনারা থাকবেনই না। পোড়োবাড়ি, শ্মশান, বাঁশবন, এইসব হল গে ওনাদের ক্ষেত্তর।

জয়ন্ত।। তুমি দেখেছ কখনও?

হরি।। সে কপাল কী আর করেছি দাদাবাবু? তবে যারা দেখেছে তাদের কাছ থেকে শুনেছি। আপনজন— তারাই বা মিথ্যে বলবে কেন? কিন্তু এত কথা জিগ্যেস করছ কেন?

জয়ন্ত।। খুব শিগগিরই দু-তিনটে ভূতের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। যদি কোনো ভাবে বেঁধে ফেলতে পারি, তোমাকে দেখাবো।

ডোর বেল। দরজা খোলার শব্দ।

মানিক এলি? আয় আয়, বোস। হরিদার সঙ্গে এতক্ষণ একটু প্রেতচর্চা করছিলাম। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কত অভিজ্ঞতা!

মানিক।। তা ভালো। যা ঘটছে পরপর, উপায় কী? চল, বরং সব ছেড়ে আমরা থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে ভর্তি হই। কত প্রেতাত্মার সঙ্গে আলাপ হবে!

জয়ন্ত।। হা হা হা—

মানিক।। হরিদা, আমার চায়ে আজ একটু আদা দিও তো? বড়ো ম্যাজম্যাজ করছে।

হরি।। ঠিক আছে।

জয়ন্ত।। দেখিস বাবা, আবার জ্বরটর বাধাস নি। সুন্দরবাবু যা ঝামেলা পাকাচ্ছে, এখন কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াবে কে জানে।

মানিক।। তুই কি সত্যিই কিছু ধরতে পারছিস না জয়?

জয়ন্ত।। কী করে ধরবো বল? জ্যান্ত মানুষ হলে লড়াই করা যায়, ভূতের সঙ্গে কি মামদোবাজি চলে?

মানিক।। সত্যি, ব্যাপারটা কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত।। যাচ্ছে না? প্রথমে, ধর বলরাম চৌধুরী। সুন্দরবাবুর মতে মারা গেছে পঁচিশবছর আসে। তখন তার বয়েস ছিল পঁয়তাল্লিশ। ঠিক?

মানিক।। অ্যাজ পার পুলিশ রিপোর্ট— ঠিক।

জয়ন্ত।। কিন্তু পঁচিশবছর পরে তাকে চোখে না দেখলেও তার হাতে লেখা চিঠি পেয়েছি? সদানন্দবাবুর গ্লাসে তার আঙুলের ছাপ পেয়েছি? তখনও তার বয়েস বাড়েনি। ঠিক?

মানিক।। কেশবের রিপোর্ট অনুযায়ী— ঠিক।

জয়ন্ত।। তার সঙ্গী কাফ্রিটা আর একটু হলে আমাদের খুন করেছিল, সেটা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি?

মানিক।। উঃ! সে কথা ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়! তাহলে ভবতোষ মজুমদারটা কে? যার সঙ্গে বজরায় গল্প করে এলাম?

জয়ন্ত।। সেইখানেই তো রহস্যের জট। এতগুলো ডেডবডি একসঙ্গে অ্যাপিয়ার করেই তো ম্যাকবেথের প্রথম দৃশ্য বানিয়ে তুললো! জট ছাড়াতে দিচ্ছে কই?

মানিক।। আচ্ছা জয়, সেদিন যে কাফ্রিটা আমাদের আক্রমণ করেছিল, পোর্ট-পুলিশ তার সেই স্পিড বোটটার খোঁজ বের করতে পারলো না?

জয়ন্ত।। ওহো, তোকে বলা হয়নি, না? ওই স্পিড বোটটা ভবতোষেরই ছিল।

মানিক।। সেটা প্রমাণ হলে তো অ্যাটেমপ্ট টু মার্ডার চার্জে ওকে গ্রেপ্তার করা যায়?

জয়ন্ত।। মানিকরে, তুই চলিস ডালে ডালে, ভবতোষ পাতায় পাতায়। ওই ঘটনার পরদিনই কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে ছিল ঃ ত্রিবেণীর ঘাট থেকে ভবতোষের স্পিড বোট চুরি হয়ে গেছে দু-দিন আগে। যে খোঁজ দিতে পারবে তাকে ইত্যাদি এবং ইত্যাদি...

মানিক।। তারপর?

জয়ন্ত।। তারপর আর কি? বাগবাজার খালের ভিতর থেকে ফাঁকা স্পিড বোটটা উদ্ধার করে পোর্ট-পুলিশ তার মালিককে ফেরত দিয়েছে, ব্যাস?

হরি।। চা নিন। আদা দিয়েছি।

মানিক।। চমৎকার। তবে আর কী? আয়, আপাতত নিশ্চিন্ত মনে দুজনে আদা দেওয়া চা খেতে খেতে সন্ধেটা কাটিয়ে দিই? (চায়ে চুমুক দিয়ে) আঃ! জয় হোক হরিদা!

দৃশ্যান্তর

সুন্দর।। হুম্। শুনছিলাম বটে! কথাটা খেয়াল করা উচিত ছিল।

মানিক।। এটাও কি তাহলে ভবতোষ মজুমদার?

জয়ন্ত।। সেটা কি খুব অস্বাভাবিক?

সুন্দর।। আচ্ছা কদিন ধরে ভবতোষ ভবতোষ করে মুণ্ডু খারাপ করছ কেন বলো তো? কে লোকটা?

জয়ন্ত।। নাটের গুরু।

সুন্দর।। (হঠাৎ চিৎকার) হ্যাণ্ডস্ আপ। এক পা এগোলে তোমার মাথার খুলি আমি উড়িয়ে দেবো।

জয়ন্ত।। থামুন থামুন সুন্দরবাবু, ও আমার লোক। খবরটবর দেয়।

সুন্দর।। হুম্।

মানিক।। বিখ্যাত লোক সুন্দরবাবু— কেশবচন্দ্র সেন। না না ব্রহ্মানন্দ নন, ইনি কুমোরটুলির চায়ের দোকানে কাজ করেন।

সুন্দর।। হুম্। কী করে বুঝবো— যা উচ্চিংড়ের মত চেহারা। তাছাড়া তোমার এ বাড়ি তো বাঘের খাঁচার চেয়েও ডেঞ্জারাস। কী নেই হে? হাইড্রোজেন, অজগর... বাপরে!

জয়ন্ত।। কিছু খবর আছে কেশববাবু?

কেশব।। এখানে বলবো?

মানিক।। বলো বলো। দারোগাবাবু আমাদের বন্ধুলোক।

কেশব।। সেই বজরাখানা ঘুসুড়ির কাছে নোঙর করেছে, সঙ্গে সেই মোটরবোট-খানাও আছে।

জয়ন্ত।। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও, পরে কথা হবে।

কেশব।। তাহলে চলি স্যার? সেলাম দারোগাবাবু।

সুন্দর।। হুম্।

জয়ন্ত।। আপনি বরং এখানে একটু জিরিয়ে নিন সুন্দরবাবু, যা হাঁপিয়ে গেছেন। হরিদা আছে, যখন যা লাগবে বলবেন—

সুন্দর।। হুম্। তা তোমরা চললে কোথায়? সেই ঘুসুড়ি?

জয়ন্ত।। দেখা যাক। আপাতত একটু নৌকোয় চড়ে গঙ্গায় হাওয়া খাবো। আমি বাঁশি বাজাবো আর মানিক গান গাইবে।

সুন্দর।। হুম্। বলবো কাকে? দুটোই সমান চ্যাংড়া। ধুত্তোর।

দৃশ্যান্তর

জলকল্লোল ও দাঁড় টানার শব্দ।

মানিক।। মাইণ্ড ইউ জয়ন্ত, সেদিন কিন্তু এই বজরা দেখতে এসেই বিপদে পঁড়েছিলাম।

জয়ন্ত।। তবু যেতে হবে। দরকার হলে অনেকবার। সেদিন গিয়ে কালপ্রিটকে দেখে এসেছি, আজ দেখতে হবে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা।

মানিক।। কিন্তু কোন ছুতোয় উঠবি বজরায়?

জয়ন্ত।। দেখি, একটা লাগসই আইডিয়া ভাবতে হবে।

মানিক।। যদি আমাদের বিশ্বাস না করে।

জয়ন্ত।। মনে মনে না করলেও ভালোমানুষ সাজার জন্যে মুখে কিছু বলবে না। আর যদি বিপদে পড়ি, আমরা তো তৈরিই থাকছি।

মানিক।। ওই দ্যাখ, বজরার ওপর দাঁড়িয়ে একটা লোক আমাদের দেখছে।

জয়ন্ত।। (চেঁচিয়ে) এই যে ভাই, ভবতোষবাবু আছেন?

১৭নং।। আছেন।

মানিক।। আমরা একটু দেখা করবো।

১৭নং।। ওপরে উঠে আসুন।

জয়ন্ত।। মাঝি, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমরা আসছি। চলো ভাই।

১৭ নং।। এদিক দিয়ে আসুন।

ধস্তাধস্তির শব্দ।

জয়ন্ত।। একি! একি! এ ভাবে আমাদের বাঁধছ কেন?

২৩নং।। ন্যাকা? ব্যাটা টিকটিকি! আমাদের সঙ্গে চালাকি? শক্ত করে বাঁধ।

১৭নং।। কত্তা আসুন, তোদের ব্যবস্থা হচ্ছে। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দ্যাখোনি?

২৩নং।। থাক এখানে পড়ে কুত্তার দল।

১৭নং।। হ্যাঁ রে, পানসিওলা যদি খোঁজে?

২৩নং।। ভাড়া মিটিয়ে বলে দে, বাবুরা পরে যাবে। তালা মার দরজায়।

দরজা বন্ধ হবার শব্দ। আবহসুরে স্বল্প বিরতি।

মানিক।। দেখলি তো? ব্যাটারা ঠিক তক্কেতক্কে ছিল।

জয়ন্ত।। হুঁ, ক্যালকুলেশানে একটু গোলমাল হয়ে গেল। কোই বাত নহি। ভবতোষ আসার আগে ঘরটা একটু ভালো করে দেখে নিতে হবে।

মানিক।। কিন্তু দেখবি কী করে? দড়ি দিয়ে যা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে!

জয়ন্ত।। ম্যাজিক জানিস? এই দ্যাখ।

মানিক।। একি! খুললি কী করে?

জয়ন্ত।। একে বলে মাসল কনট্রোল। বাঁধার সময়ে ফুলিয়ে রেখেছিলাম, এখন ছেড়ে দিতেই আলগা হয়ে গেল!

মানিক।। সাবাস।

জয়ন্ত।। দাঁড়া, তোরটাও খুলে দিচ্ছি। অ্যা— অ্যা— অ্যাই। নাউ ইউ আর ফ্রি। চল খুঁজে দেখি। সময় কম।

স্বল্প বিরতির আবহসুর।

১৭ নং।। কত্তার ঘরে কিন্তু ওদের রাখাটা ঠিক হলো না রে।

২৩নং।। কী করবো? ব্যাটারা যে প্রথমেই ওই ঘরটায় ঢুকে পড়লো।

১৭নং।। কত্তাকে খবর দিতে লোক গেছে তো?

২৬নং।। কখন? লঞ্চ নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এসে পড়লেন বলে।

স্বল্প বিরতির আবহসুর।

মানিক।। এটা কী রে জয়ন্ত?

জয়ন্ত।। তাই তো। এতো দুটো কাচের কফিন দেখছি!

মানিক।। দ্যাখ, এর মধ্যে দুটো মোমের মূর্তি।

জয়ন্ত।। কই দেখি? আরে এতো দুটি ডেডবডি দেখছি। আশ্চর্য।

মানিক।। ওরে জয়, এতো সেই হাবসিটারে, যে আমাদের তাড়া করেছিল!

জয়ন্ত।। তাই তো। আর এপাশের লোকটা কে বলতো? মুখখানা কী ভয়ংকর।

মানিক।। ওর ডান হাতে দ্যাখ, বুড়ো আঙুল নেই।

জয়ন্ত।। আচ্ছা, তার মানে ইনিই সেই কুখ্যাত বলরাম চৌধুরী?

মানিক।। কিন্তু এতো সত্তর বছরের বুড়ো নয়? ৪০/৪৫-ই তো মনে হচ্ছে?

জয়ন্ত।। সেটাই তো রহস্য। কিন্তু কথা হচ্ছে এরা মরলো কী করে? অসুখ-বিসুখে? নাকি কেউ খুন করলো?

মানিক।। কফিনের মধ্যে যেন খানিকটা জলও রয়েছে?

জয়ন্ত।। হুম্।

দূরে মোটর বোটের শব্দ।

মানিক।। দূরে একটা মোটরবোটের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস জয়?

জয়ন্ত।। হ্যাঁ, ভবতোষ আসছে।

মানিক।। কী হবে এখন?

জয়ন্ত।। লোকগুলো মনে হয় কর্তাকে রিসিভ করতে বজরার সামনের দিকে গেছে। আয়, পিছনদিকের ওই জানলাটা খুলে জলে ঝাঁপ দিই। ওরা টের পাবে

না।

মানিক।। তারপর?

জয়ন্ত।। ডুবসাঁতার। ধরতে এলেই গুলি চালাবি। এছাড়া আপাতত বাঁচার আর কোনো পথ নেই। লেট আস মুভ।

জলে ঝাঁপ দেবার পরপর দুটি শব্দ হল। স্পিড বোটের শব্দ ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে।

দৃশ্যান্তর

জয়ন্ত।। বসুন সুন্দরবাবু. আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন। হরিদা আজ বারবার আপনার নামই করছিল।

সুন্দর।। আমার নাম? হরি? কেন?

জয়ন্ত।। চমৎকার চিকেন কাটলেট বানিয়েছে হরিদা। বলছে, আপনাকে চাখাতে না পারলে ওর নাকি তৃপ্তি হয় না।

সুন্দর।। আহা, গাঁয়ের সরল মানুষ তো? সদিচ্ছে-টদিচ্ছেগুলো তোমাদের মতো এখনো মরে যায়নি। গুড, ভেরি গুড।

জয়ন্ত।। কিন্তু খেতে খেতে আপনাকে যে আমার একটা বক্তৃতা শুনতে হবে?

সুন্দর।। বক্তৃতা? আই মিন লেকচার? তোমার?

জয়ন্ত।। খুব জরুরি।

সুন্দর।। ক্রিমিনালদের খবর পেয়েছো বলে ডেকে আনলে, আর এখন শুকনো লেকচার?

জয়ন্ত।। শুকনো না, সঙ্গে চা-ও থাকবে, যতবার খুশি।

সুন্দর।। ঠিক আছে। তোমার লেকচারের ভয়ে তো আর কাটলেট ফেলে পালাতে পারি না? অল রাইট। স্টার্ট।

হরি।। দুখানা কাটলেট খেয়ে দেখুন দারোগাবাবু, আপনার নাম করে ভেজেছি।

সুন্দর।। থ্যাঙ্ক য়্যু হরি।

জয়ন্ত।। আচ্ছা সুন্দরবাবু, আপনি জন্মমৃত্যুর রহস্য নিয়ে কখনো নাড়াচাড়া করেছেন? না না, কথা বলতে হবে না, আপনার মাথা নাড়া দেখেই বুঝেছি করেন নি। করলে দেখতে পেতেন মৃত্যু নিশ্চিত হলেও— ইচ্ছে করলে জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়।

সুন্দর।। যেতেই পারে।. পুরোনো মেশিনের কলকব্জা পালটে ফেললেই তো ব্র্যাণ্ড নিউ?

জয়ন্ত।। বাঃ! চমৎকার ধরেছেন। তবে ডাক্তাররা এখনো সবটা শিখতে না পারলেও সায়েন্টিস্টদের গবেষণা কিন্তু থেমে নেই। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে

কোনো জীবন্ত পদার্থই একরকম অমর। তরুণ জীবের দেহ থেকে 'টিস্যু' বা বিধানতন্তু তুলে নিয়ে বেশ কিছুকাল রেখে দিলে, দেখা যাবে তার ভিতরকার সেল বা অনুকোষ মরে না, বরং দিনে দিনে বেড়েই চলে। তবে অসম্পূর্ণ দেহের ত্রুটির জন্যে কখনো কখনো মরে বটে, নইলে ওগুলো প্রায় অমর।

সুন্দর।। উঃ! হরি হে, আরো কাটলেট আনো, এ যন্ত্রণা আর যে সয় না।

জয়ন্ত।। এক্ষুণি আসবে। ভাজছে, গরম গরম দেবে। ... আচ্ছা সুন্দরবাবু, আপনি রজনীগন্ধার গাছ দেখেছেন অথবা লিলি ফুলের?

সুন্দর।। যাও না আমার বাড়িতে। কত রকম ফুলের বাগান করেছি দেখে এসো। আমাকে ফুল চেনাচ্ছে!

জয়ন্ত।। তাহলে তো অবশ্যই জানেন, এর মূল রোদে শুকিয়ে রাখলে মরে না? পরের বছর পুঁতলে আবার যে কে সেই?

সুন্দর।। সে আর নতুন কী? যত বালখিল্য কথাবার্তা!

জয়ন্ত।। আপনি শুনেছেন কিনা জানিনা, ভোরোনফ (Voronoff) নামে এক বৈজ্ঞানিক একটি তরুণ বানরের টিসু এক বৃদ্ধমানুষের শরীরে ঢুকিয়ে তাকে প্রায় যুবক বানিয়ে তুলেছিলেন অনেককাল আগে। আচ্ছা, আপনি ক্যারল সাহেবের নাম শুনেছেন?

সুন্দর।। পুলিশ কমিশনার মিঃ ক্যারল তো? উনি তো রিটায়ার করে গেছেন?

জয়ন্ত।। না না, আমি এক জগতবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কথা বলছি। উনি ১৯১২ সালে নোবেলপ্রাইজ পেয়েছিলেন।

সুন্দর।। তা হবে। চিনি না।

জয়ন্ত।। তাঁর মতে, মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। মানুষের দেহকে মাঝে মাঝে ঘুম পাড়িয়ে যদি অনেককালের জন্যে গুদামজাত করে রাখা হয় এবং মাঝে মাঝে বের করে ওই রজনাগন্ধা বা লিলির মতো এই পৃথিবীতে লীলাখেলা করতে দেওয়া হয়, তাহলে মানুষের পরমায়ু শত শত বছরও হতে পারে।

সুন্দর।। যথেষ্ট হয়েছে। এবার তোমার ওই গাঁজাখুরি গপ্পো বন্ধ করো তো জয়ন্ত। রাবিশ।

জয়ন্ত।। আচ্ছা সাধুসন্ন্যাসীরা সমাধিস্থ হন মাঝে মাঝে, শোনেন নি?

সুন্দর।। হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ দেবের কথা শুনেছি। ওঁর নাকি এমনি সমাধি হতো।

জয়ন্ত।। কেন, যোগী হরিদাসের কথা শোনেননি? সমাধিস্থ অবস্থায় মাটির নিচে চল্লিশ দিন পুঁতে রাখা হয়েছিল, তারপর যখন তুলে আনা হলো আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলেন?

সুন্দর।। হ্যাঁ, ছেলেবেলায় কিসে যেন পড়েছিলাম—

জয়ন্ত।। এসব যদি সত্যি হয়, তবে গুদামজাত করলে শরীর নষ্ট হবে কেন? যোগীরা যোগবলের সাহায্যে করতেন আর বিজ্ঞানীরা করেন রসায়নের সাহায্যে। হয় না?

মানিক।। এতক্ষণে আমি তোর বক্তৃতার মানে বুঝতে পারছি জয়। তার মানে, তুই বলছিস ভবতোষ ওই রকম কোনো মেডিসিনের সাহায্যে বলরাম আর কাফ্রিটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে? কফিনের মধ্যের জলগুলো ছিল আসলে কেমিকেল?

জয়ন্ত।। রাইট। আর ভবতোষ যে একজন কেমিস্ট সে তো আগেই জেনেছি।

সুন্দর।। উঃ! আবার সেই ভবতোষ। হচ্ছিল ক্যারল সাহেবের কথা, এর মধ্যে ভবতোষ আসে কোত্থেকে?

জয়ন্ত।। মানিক, সুন্দরবাবুকে একটু বুঝিয়ে বল তো কোত্থেকে আসে? ওই তো, হরিদাও কাটলেটের থালা আনছে। আমি ততক্ষণ কটা জরুরি কাজ সেরে নিই চটপট, কেমন?

স্বল্প বিরতির আবহসুর।

জয়ন্ত।। শুনলেন তো?

সুন্দর।। হ্যাঁ, কিন্তু এ তো অবিশ্বাস্য হে? তা ছাড়া ভবতোষের এতসব করতে যাবার কারণটাই বা কী?

জয়ন্ত।। ধরুন, যে সব আসামি প্রাণদণ্ড বা গুরুতর শাস্তি পেয়েছে, ভবতোষের আশ্রয়ে তারা কিছুকাল ঘুমিয়ে নিতে পারে। কেননা, সেখানে মৃত্যুভয়ও নেই আর পুলিশের তাড়াও নেই? আর ভবতোষের সুবিধে তার পাপকাজ হাসিল করার জন্যে সে বেশ কিছু একসপার্ট লোক বা ক্রিমিনাল পেয়ে যাচ্ছে। অথচ যখনই পুলিশ খোঁজ করছে, অথবা নিজের দরকারে— ওদের ঘুম পাড়িয়ে রাখছে তরল ওষুধভরা কাচের কফিনে।

সুন্দর।। স্পেলনডিড!

জয়ন্ত।। ভাবছি, লোকটা যদি ওর ওই অসামান্য আবিষ্কার কোনো মহৎ কাজে লাগাতো...

সুন্দর।। না, আর কোনো কথা নয়। আজই পোর্ট-পুলিশের সঙ্গে কথা বলে লঞ্চের ব্যবস্থা করছি। ভবতোষ কিছু টের পাবার আগেই ওর খেলখতম। হা হা...

দৃশ্যান্তর

আবহসুরে স্বল্প বিরতি। জল কেটে একটা মোটর লঞ্চ ও একটি স্পিড বোট ছুটছে।

বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সুন্দর।। (উত্তেজিত) আঃ! এটা কী চালাচ্ছে বলো তো জয়ন্ত? এটা কি মোটর লঞ্চ না গাধাবোট? স্পিড কই? এ্যাঁ?

জয়ন্ত।। খুব জোরেই তো চালাচ্ছে সুন্দরবাবু? আপনি এত উত্তেজিত হবেন না। আপনার আবার প্রেসারের ধাত। আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে সব পণ্ড।

সুন্দর।। অসম্ভব। এখন আমার উত্তেজনার ব্যারোমিটার হু হু করে চড়ে যাচ্ছে। ওই ভবতোষের ভবলীলা শেষ না করা পর্যন্ত এ পারদ আমি নামাতে পারবো না জয়ন্ত। মানিক কোথায়?

জয়ন্ত।। ওই তো দূরবিনটা চোখে দিয়ে চারদিকে নজর রাখছে।

সুন্দর।। হুম্। ঘুসুড়ি আর কতদূর?

জয়ন্ত।। এই তো এলো বলে। আপনি বরং ফ্লাস্কে চা রাখা আছে, গলাটা ভিজিয়ে নিন, এনার্জি পাবেন।

সুন্দর।। রাইট। এখন অনেক এনার্জি স্টোর করা দরকার। থ্যাঙ্ক ইউ।

চায়ে চুমুক দেবার শব্দ। আবহসুরে একটুকাল উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

জয়ন্ত।। কি রে মানিক, কিছু দেখতে পাচ্ছিস?

মানিক।। ঘুসুড়ি তো এসে গেল রে! ভবতোষের বজরার তো টিকিটিও দেখতে পাচ্ছি না?

জয়ন্ত।। তাইতো!

মানিক।। আমরা আসছি খবর পেয়ে আবার জলে ডুবিয়ে দেয়নি তো?

জয়ন্ত।। সেটাও অসম্ভব নয়। আচ্ছা, ওই যে নৌকোটা আসছে ওকে একটু জিগ্যেস করে দ্যাখ তো— ওদিকে কোনো বজরা যেতে দেখেছে কিনা?

মানিক।। (চিৎকার করে) এই যে— ও মাঝি ভাই, শুনছো? তোমাদের ওদিকে কোনো বজরা দেখতে পেয়েছো?

মাঝি।। (দূর থেকে চিৎকার করে) ত্রিবেণীর ঘাটে বাঁধা আছে।

মানিক।। ওরে বাবা। এরই মধ্যে ত্রিবেণীতে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে ব্যাটা?

জয়ন্ত।। শুনেছি, ত্রিবেণীতেই নাকি ভবতোষের একটা বাগানবাড়ি আছে?

মানিক।। কে জানে, হয়তো ওটাই ওর সেই ডেডবডি প্রিজার্ভ করার গোডাউন?

জয়ন্ত।। খুব অসম্ভব নয়। কত ক্রিমিনাল যে সেখানে জমা আছে কে জানে?

সুন্দর।। আরে এই তো মানিকজোড়, ঘুসুড়ি আর কতদূর?

জয়ন্ত।। সে তো আমরা অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছি?

সুন্দর।। এ্যাঁ? এ কেমন রসিকতা হে? ঘুসুড়িতে যাচ্ছি ক্রিমিনাল ধরতে, আর সেই

ঘুসুড়িই পিছনে ফেলে চলে এলাম? এই সারেং, রোক্‌কে, রোক্‌কে—

জয়ন্ত।। না না ঠিক আছে, আপনি চালান।

সুন্দর।। তার মানে? আমি যেখানে থামতে অর্ডার দিচ্ছি—

মানিক।। সে তো ভবতোষকে ধরবেন বলে?

সুন্দর।। সার্টেনলি ইয়েস।

মানিক।। তা এতক্ষণ যে এলেন, ওর বজরা দেখতে পেলেন কোথাও?

সুন্দর।। না তো! সেপাই—

জয়ন্ত।। সেপাই কী করবে? বজরা তো আর বটবৃক্ষ নয় যে এক জায়গায় শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? ওটা আপাতত ত্রিবেণীর ঘাটে বাঁধা আছে খবর পেয়েছি। আমাদের লঞ্চ সেদিকেই যাচ্ছে—

সুন্দর।। তাহলে তো ঠিকই যাচ্ছে। থামাতে বলছ কেন?

মানিক।। আমরা কোথায়? আপনিই তো বলছেন!

সুন্দর।। ও, আমি বলেছিলাম? হুম্‌।

আবহসুরে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায়।

মানিক।। জয়ন্ত, আমরা তো ত্রিবেণীর কাছাকাছি এসে পড়েছি, কিন্তু আকাশের গায়ে দ্যাখ তো ওই আগুনের শিখা কিসের?

জয়ন্ত।। কই? দূরবিনটা দে। ... হুঁ। নিশ্চয়ই ওখানে কোথাও আগুন লেগেছে। ওরে বাপরে! কী দাউদাউ করে জ্বলছে রে?

সুন্দর।। (হঠাৎ চেঁচিয়ে) ওরে আমাকে কেউ দুখানা ডানা দিবি রে— আমি বাজপাখির মতো উড়ে গিয়ে ভবতোষের ঘাড়ে গিয়ে ছোঁ মারি?

জয়ন্ত।। (চেঁচিয়ে) ড্রাইভার সাহেব, যেখানে আগুন লেগেছে লঞ্চ সেখানে নিয়ে চলুন।

সুন্দর।। খবরদার! সিধে চলো। ওইসব বাজে আগুনটাগুন দেখার সময় নেই আমাদের।

জয়ন্ত।। কী মুশকিল, দেখতে পাচ্ছেন না, যেখানে আগুন লেগেছে তার সামনের ঘাটেই সেই বজরা আর স্পিড বোটটা বাঁধা রয়েছে? তার মানে, ওটাই ভবতোষের সেই বাগানবাড়ি।

সুন্দর।। এ্যাঁ!

মানিক।। সম্ভবত আমরা আসছি বুঝতে পেরেই ভবতোষ পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে পথ বন্ধ দেখে তাড়াতাড়ি এখানে এসে নিজের বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

সুন্দর।। কিন্তু কেন?

জয়ন্ত।। কারণ, তার বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ, তাকে সে মুছে দিতে চায়। এতো খুব সহজ কথা।

সুন্দর।। হুম্।

আবহসুরে স্বল্প বিরতি ও উৎকণ্ঠা।

মানিক।। ইস্, বাতাসে কী পেট্রোলের গন্ধ! যত এগোচ্ছি—

জয়ন্ত।। পেট্রোল ছড়িয়েই তো আগুন লাগিয়েছে বাড়িতে।

সুন্দর।। (চিৎকার করে) সেপাইরা শোনো, সবাই যে যার বন্দুক লোড করে নাও। লঞ্চ পাড়ে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িটা ঘিরে ফেলবে। কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করলেই ফায়ার করবে। আমার অর্ডার।

আবহসুরে স্বল্প বিরতি ও উৎকণ্ঠা।

সুন্দর।। ইস, কী বদ গন্ধরে বাবা, যেন শ্মশানে এসে পৌঁছেছি—

জয়ন্ত।। এক রকম তাই তো। যতগুলো ডেডবডি মজুত ছিল ওর গোডাউনে, সব এই আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

মানিক।। হায়রে, কত পাপ না জানি করেছিল ওরা। সৎকারও হল না!

জয়ন্ত।। তবে একটাই সান্ত্বনা, জীবন্ত পুড়লেও অচেতন বলে কোনো যন্ত্রণা ভোগ করলো না।

মানিক।। (চিৎকার করে) জয়ন্ত, ওই দ্যাখ—

জয়ন্ত।। আরে, ওই তো ভবতোষ! জামাকাপড়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে—

মানিক।। ওর আগুনই ওকে বাড়ির বাইরে ঠেলে দিয়েছে। ও কী সুন্দরবাবু, ওর দিকে যাবেন না—

ভবতোষ।। খবরদার! কেউ যদি বাঁচতে চাও, আমার দিকে আসার চেষ্টা কোরো না। আমার হাতে ভয়ংকর বোমা রয়েছে, তোমরা কেউ প্রাণে বাঁচবে না। সরে দাঁড়াও সব। আমাকে যেতে দাও।

সুন্দর।। মরলে তো একবারই মরবো রে শয়তান, কিন্তু তার আগে—

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

জয়ন্ত।। যাঃ! নিজের বোমাতে নিজেই উড়ে গেল ভবতোষ! সত্যি সুন্দরবাবু, আপনার সাহস দেখে আমি মুগ্ধ।

মানিক।। সত্যি, বন্দুক হাতে আপনি যে ভাবে ছুটে গেলেন ভবতোষের দিকে—

সুন্দর।। হা হা— ধর্মের কল। আমাকে কিছুই করতে হলো না, অথচ ভবতোষের ভবলীলা সাঙ্গ হলো। একে কী বলে জানো?

জয়ন্ত।। কী?

সুন্দর।। বাইবেল পড়োনি? একেই বলে— পাপের বেতন মৃত্যু। হা হা...

সকলে হাসে। আবহসুরে আনন্দের প্রকাশ।

অ ভি ন য়া ং শে

তরুণকুমার, গৌতম চক্রবর্তী, অরুময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সমরকুমার, অজিত গাঙ্গুলী।

প্রযোজনা / বিশ্বনাথ দাস

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত

মৃ ত্যু বি ষ

মাইকেল. জর্জ. রবার্ট. টমাস. হেনরি. জোনস. টম. প্যাটারসন. যোসেফ.
মহিলা. লাইকা. লেসলি. মরিয়ম

ঝোড়ো বাতাসের শব্দ। তাকে ছাপিয়ে হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। কেউ রিসিভার তোলে।

মাইকেল।। ইয়েস, পুলিশস্টেশন—

জর্জ।। দেখুন স্যার, খুব বিপদে পড়ে ফোন করছি। দয়া করে থানার ও. সি.-কে একটু লাইনটা দেবেন?

মাইকেল।। স্যরি, উনি ব্যস্ত আছেন। আমি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইনচার্জ বলছি— কোনো পার্সোনাল কথা না হলে আমাকে বলতে পারেন।

জর্জ।। ও আচ্ছা— ধন্যবাদ। শুনুন স্যার, আমার বাড়িতে একটা খুন হয়েছে—

মাইকেল।। কী হয়েছে? খুন? কবে?

জর্জ।। আজ। একটু আগে।

মাইকেল।। কে খুন হয়েছে?

জর্জ।। আমার স্ত্রী।

মাইকেল।। জাস্ট এ মিনিট। হোল্ড দ্য লাইন প্লিজ। (কাগজের শব্দ) ইয়েস, আপনার নাম বলুন—

জর্জ।। জর্জ ম্যাশন।

মাইকেল।। অ্যাড্রেস?

জর্জ।। ১২/১ কেন্ট স্ট্রিট।

মাইকেল।। অলরাইট, আপনি বাড়িতেই ওয়েট করুন, আমরা যাচ্ছি।

জর্জ।। থ্যাঙ্ক য়্যু।

মাইকেল।। বাই-দ্য-বাই, ডেড বডি কি আপনারা কেউ ধরেছেন?

জর্জ।। না স্যার।

মাইকেল।। গুড। ধরবেন না। আর দয়া করে লক্ষ রাখবেন, কেউ যেন কোনো কিছুতে হাত না দেয়। ও. কে.?

টেলিফোন রেখে দেবার শব্দ। বিদেশি সুরে রচিত আবহসংগীত। তার উপরে ঘোষিত হয় নাট্যানুষ্ঠান সম্পর্কীত ঘোষণা। দূর থেকে একটা জিপগাড়ি এসে থামলো। একটু পরে দরজায় টোকা।

জর্জ।। ইয়েস, কাম ইন।

মাইকেল।। হ্যালো, আমি মাইকেল হোবার্ট। থানা থেকে আসছি।

জর্জ।। ওয়েলকাম। আমি জর্জ ম্যাশন।

মাইকেল।। ডেড বডি কোথায়?

জর্জ।। পাশের ঘরে। আসুন।

অনেকগুলো জুতো পরা পায়ের শব্দ এগিয়ে গেল। ঢং ঢং করে ছ-টা বাজলো ঘড়িতে।

মাইকেল।। ওয়েল, হ্যারিস— তুমি ডিফারেণ্ট অ্যাঙ্গেল থেকে ডেড বডির ছবি তোলো। বিল, তুমি ফিঙ্গারপ্রিণ্ট সংক্রান্ত কাজগুলো সেরে নাও চটপট। আর রবার্ট, তোমরা সমস্ত ঘরগুলো ভালো করে চেক আপ করো, তেমন কিছু নজরে পড়লে আমাকে জানাবে। ক্লিণ্টন তো স্টেনোগ্রাফার? ওই-ই শুধু আমার সঙ্গে থাকবে। চলুন মিঃ ম্যাশন, আমরা বরং ড্রইংরুমে একটু বসি? আপনার কাছ থেকে আমার কিছু জানার আছে।

জর্জ।। অ্যাজ য়্যু প্লিজ, আসুন।

একটুকাল বিরক্তিকর কাকের ডাক শোনা যাবে।

মাইকেল।। ওয়েল, আপনার স্ত্রীর নাম?

জর্জ।। মেরিনা ম্যাশন।

মাইকেল।। কত বছর বিয়ে হয়েছিল আপনাদের?

জর্জ।। তা বছর চারেক হবে।

মাইকেল।। কোনো বাচ্চাকাচ্চা?
জর্জ।। না।
মাইকেল।। ম্যাডামের বয়স কত ছিল?
জর্জ।। ২৩/২৪ হবে।
মাইকেল।। আপনার?
জর্জ।। ফরটি প্লাস।
মাইকেল।। দু-জনের মধ্যে তো দেখছি বয়সের অনেক তফাত। ... আচ্ছা মিঃ ম্যাশন, এটাকে আপনি খুন বলছেন কেন? আত্মহত্যাও তো হতে পারে? আর য়্যু শিওর ইটস্ এ মার্ডার কেস?
জর্জ।। না, তা ঠিক নয়। তবে আত্মহত্যারও তো কোনো কারণ দেখছি না।
মাইকেল।। ওয়েল, আপনি কী করেন?
জর্জ।। বিজনেস।
মাইকেল।। কিসের?
জর্জ।। লেদের। আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে।
মাইকেল।। আপনি একাই মালিক না, অন্য কোনো পার্টনার—
জর্জ।। না, একাই।
মাইকেল।। আচ্ছা, ধরা যাক, এটা যদি মার্ডার কেসই হয়, সেক্ষেত্রে এই খুনের ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?
জর্জ।। কই, তেমন তো কাউকে—
মাইকেল।। আপনাদের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাঁটি বা মনোমালিন্য হয়েছিল এই দু-চার দিনের মধ্যে?
জর্জ।। ঝগড়াঝাঁটি? কই না তো?
রবার্ট।। স্যার—
মাইকেল।। কী ব্যাপার রবার্ট?
রবার্ট।। এই পিস্তলটা পাশের ঘরে পাওয়া গেছে। এতে এখনো দুটো গুলি আছে, রুমালে মুড়িয়ে এনেছি।
মাইকেল।। গুড। মিঃ ম্যাশন, এটা কি আপনার?
জর্জ।। কই দেখি? না। কিন্তু এটা এলো কোত্থেকে?
রবার্ট।। মনে হচ্ছে, এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে স্যার।
মাইকেল।। কিপ ইট। ওটা ফরেনসিক ল্যাবে পাঠাতে হবে।
রবার্ট।। একটা অ্যাসট্রেতে কিছু পোড়া সিগারেটের টুকরোও পাওয়া গেছে। ব্র্যাণ্ডের নাম মেরি গোল্ড।
জর্জ।। দামি সিগারেট। কিন্তু আমি তো স্মোক করি না? এগুলো কি তাহলে—
মাইকেল।। হ্যাঁ, ওগুলোও পরীক্ষার জন্যে পাঠাতে হবে।

রবার্ট।। ইয়েস স্যার। ও ঘরে স্যার, টেলিফোনের তারটাও ছেঁড়া!

জর্জ।। সে কী? তার ছেঁড়া? খেয়াল করিনি তো! হঠাৎ ফোনটা ডেড দেখে তাড়াহুড়ো করে পাবলিক বুথ থেকে আপনাকে ফোন করতে গিয়েছিলাম—

মাইকেল।। তার যখন ছিঁড়েছে, তখন তো ওখানে জুতোর ছাপ থাকা স্বাভাবিক। রবার্ট—

রবার্ট।। স্যার—

মাইকেল।। বিলকে বলো— পায়ের ছাপ থাকলে, থাকলে কেন নিশ্চয়ই থাকবে, যেন নিয়ে নেয়—

রবার্ট।। ও. কে. স্যার।

মাইকেল।। হুম্। ব্যাপারটা তাহলে বেশ প্ল্যানড্ ওয়েতেই হয়েছে। ...আচ্ছা আপনার স্ত্রীর নিশ্চয়ই বয় ফ্রেণ্ড ছিল? ইয়াং লেডি, থাকাটাই স্বাভাবিক। ক-জন?

জর্জ।। হবে ৫/৭ জন। তবে তাদের মধ্যে ২/৩ জন খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল।

মাইকেল।। তাদের নাম?

জর্জ।। মার্টিন, টম আর হেনরি?

মাইকেল।। মার্টিন কোথায় থাকে?

জর্জ।। ৩০ নম্বর এডোয়ার্ড রোড।

মাইকেল।। আর টম?

জর্জ।। টম থাকে কিংস রোডে। অন্য একজনের সঙ্গে একই অ্যাপার্টমেণ্টে।

মাইকেল।। এরা কি সবাই ম্যারেড?

জর্জ।। না। অবশ্য টমকে কে-ইবা বিয়ে করবে বলুন? যা উড়োনচণ্ডী, লক্ষ্মীছাড়া!

মাইকেল।। আর হেনরি?

জর্জ।। হেনরি তো আমার পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে। বাচ্চা ছেলে। ১৫/১৬ বছর বয়েস।

মাইকেল।। আই সি। আচ্ছা মিঃ ম্যাশন, আপনি কি আজ অফিস থেকে সোজা বাড়িতে এসেছিলেন?

জর্জ।। না। ইয়ে, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে রোজ তাস খেলতে যাই।

মাইকেল।। আজও গিয়েছিলেন?

জর্জ।। হ্যাঁ।

মাইকেল।। একলা ব্যবসা চালানোর পরেও এত সময় পান কী করে?

জর্জ।। করে নিতে হয়। ওটাই যে আমার একমাত্র রিল্যাকসেশান মিঃ হোবার্ট?

মাইকেল।। তা আজ সাড়ে-পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ফিরে এলেন? এত তাড়াতাড়ি খেলা শেষ হয়ে গেল আপনাদের?

জর্জ।। .না, খেলা হয়নি। আমার বন্ধুটি আজ বাড়ি ছিলেন না।

মাইকেল।। বন্ধুর নাম কী?

জর্জ।। বব হোবার্ট। সার্কাস স্কোয়ারে থাকেন। নম্বরটা মনে নেই, বাড়িটা চিনি।
মাইকেল।। আপনার বাড়িতে এখন কে কে আছেন?
জর্জ।। একজন কাজের লোক। টমাস।
মাইকেল।। ওকে ডাকুন, কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

দরজায় টোকা।

জর্জ।। ইয়েস কাম ইন। ... হ্যালো টমাস—
টমাস।। স্যার, মাফ করবেন, আমি জানতে এসেছিলাম আপনাদের জন্যে কি একটু কফি বা অন্য কোনো ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা করবো?
মাইকেল।। নো থ্যাঙ্কস। ডিউটি চলাকালীন আমি কোনোরকম ড্রিঙ্ক করি না।
জর্জ।। টমাস, ইনি মিঃ মাইকেল হোবার্ট। থানার ইনচার্জ। ইনি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।
টমাস।। নিশ্চয়ই। বলুন স্যার?
মাইকেল।। মিঃ ম্যাশন, আমি এবার একটু আলাদাভাবে ওর সঙ্গে—
জর্জ।। নিশ্চয়ই। আমি পাশের ঘরেই আছি।
মাইকেল।। ধন্যবাদ। ক্লিন্টন, নোট করো। ... তোমার নাম?
টমাস।। জন টমাস, স্যার।
মাইকেল।। কতদিন কাজ করছ এ বাড়িতে?
টমাস।। তা ধরুন প্রায় ৬/৭ বছর হবে।
মাইকেল।। এর আগে কোথায় ছিলে?
টমাস।। জ্যাকসন রোডে মিঃ মিলটনের বাড়িতে।
মাইকেল।। ছাড়লে কেন?
টমাস।। এখানে মাইনে অনেক বেশি।
মাইকেল।। এ ছাড়া অন্য কোথাও কাজ করো?
টমাস।। হ্যাঁ স্যার, একটা বারে।
মাইকেল।। কোথায়?
টমাস।। ওয়াটার ফোর্ড স্ট্রিটে। রবসন বার।
মাইকেল।। রবসন বার?
টমাস।। খুব ভালো বার— স্যার। দুপুরে, রাতে অনেকেই ওখানে লাঞ্চ, ডিনার খেতে আসেন। খুব পশার।
মাইকেল।। জানি। আচ্ছা টমাস, আজ দুপুরে কি তুমি বারে গিয়েছিলে?
টমাস।। সে তো রোজই যাই।
মাইকেল।। রোজের কথা হচ্ছে না। আজ গিয়েছিলে?

টমাস।। হ্যাঁ স্যার, সেখান থেকে ডিউটি সেরেই তো এখানে এসেছি।

মাইকেল।। এখানে এসে তুমি কী দেখলে?

টমাস।। দেখলাম, ওই কোনের চেয়ারটায় সাহেব চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখলেন কিন্তু কোনো কথা বললেন না, শুধু ইসারায় পাশের ঘরটা দেখালেন। মনে হল খুবই মুষড়ে পড়েছেন। আমিও স্যারকে বিরক্ত না করে পাশের ঘরে গিয়ে দেখলাম-- ম্যাডাম আর বেঁচে নেই।

মাইকেল।। বেঁচে নেই কী করে বুঝলে?

টমাস।। না মানে, যে ভাবে পড়ে আছেন-- চারদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে...

মাইকেল।। আচ্ছা টমাস, তোমার সাহেবের সঙ্গে তোমার ম্যাডামের সম্পর্ক কেমন ছিল? ঠিকঠাক উত্তর দেবে। মনে রেখো, কোনো কিছু গোপন করার অর্থই হল আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া।

টমাস।। আমি তো স্যার, এখানে পার্ট-টাইমার। তবে যেটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে ভালোয়-মন্দয় মেশানো। আসলে-- সাহেব হিসেবি মানুষ আর ম্যাডাম পুরো বেহিসেবি। সাহেব ভারভাত্তিক, ম্যাডাম ছটফটে। অবশ্য দুজনের মধ্যে বয়েসেরও তো ফারাক ছিল-- হয়তো সে জন্যেই মাঝেমধ্যে একটুআধটু... তা নইলে এমনিতে বেশ ভালো।

মাইকেল।। আচ্ছা টমাস, তোমাদের পাশের ফ্ল্যাটে যে ছেলেটি থাকে...

টমাস।। হেনরি স্যার।

মাইকেল।। ছেলেটি কেমন?

টমাস।। ভালো ছেলে স্যার।

মাইকেল।। ভালো মানে?

টমাস।। মানে, পড়াশুনোয় ভালো, খেলাধুলোয় ভালো--

মাইকেল।। তোমার ম্যাডামের সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল, তাই না?

টমাস।। তা ছিল। ম্যাডাম খুব ভালোবাসতেন ওকে।

মাইকেল।। ঠিক আছে-- ও বাড়িতে থাকলে একটু ডেকে আনোতো।

টমাস।। এক্ষুনি যাচ্ছি স্যার।

মাইকেল।। আর শোনো, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি এ শহর ছেড়ে কোথাও যাবে না, কেমন?

দরজায় টোকা।

ইয়েস-- এসো রবার্ট, কিছু খবর আছে?

রবার্ট।। আমাদের এদিককার কাজ মোটামুটি শেষ স্যার।

মাইকেল।। ও.কে.। তাহলে ডেড বডি পোস্টমর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। তাছাড়া

ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফুটপ্রিন্ট, রিভলবার, অ্যাশট্রে— মানে যা যা পেয়েছ, একটা লিস্ট করে ফরেনসিকের জন্যে রেডি করো।

রবার্ট।। অলরাইট স্যার।

দরজায় টোকা।

মাইকেল।। কাম ইন। ... ও টমাস?

টমাস।। হেনরিকে ডেকে এনেছি স্যার।

মাইকেল।। গুড। বোসো হেনরি। টমাস, তুমি এবার যেতে পারো, দরকার হলে ডাকবো।

টমাস।। ঠিক আছে স্যার, আমি বাড়িতেই আছি।

আবার একটুকাল সেই বিরক্তিকর কাকের ডাক শোনা যাবে।

মাইকেল।। ওয়েল, হেনরি— তুমি তো পাশের ফ্ল্যাটেই থাকো?

হেনরি।। ইয়েস স্যার।

মাইকেল।। আর কে থাকেন তোমার সঙ্গে?

হেনরি।। আমার মা।

মাইকেল।। তিনি কি এখন বাড়িতে আছেন?

হেনরি।। না, বেরিয়েছেন একটু আগে।

হেনরি।। আই সি। তুমি কী করো?

হেনরি।। স্কুলে পড়ি।

মাইকেল।। কোন স্কুল?

হেনরি।। সেণ্ট জোনস।

মাইকেল।। কোন ক্লাস?

হেনরি।। ক্লাস টেন।

মাইকেল।। গতবারে তুমি কোনো প্লেস পেয়েছিলে?

হেনরি।। হ্যাঁ, ফোর্থ হয়েছিলাম।

মাইকেল।। শুনেছি, তুমি খেলাধুলো করো?

হেনরি।। হ্যাঁ, ফুটবল খেলি।

মাইকেল।। আজও গিয়েছিলে?

হেনরি।। হ্যাঁ।

মাইকেল।। কোথায়?

হেনরি।। ওই জিমখানার মাঠে।

মাইকেল।। আচ্ছা, এই ম্যাডাম তোমাকে খুব ভালবাসতেন, না?

হেনরি।। হ্যাঁ, খুব স্নেহ করতো। ওর জন্যে এখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

মাইকেল।। কেন?

হেনরি।। পাশের ফ্ল্যাটে থাকতো। কত গল্পসল্প হতো আমাদের। মাকে তো কাছে পাই না। মা তো সেই সকালে ব্রেকফাস্ট করে অফিসে বেরিয়ে যায় আর ফেরে সন্ধের পর।

মাইকেল।। আচ্ছা আচ্ছা। তা তুমি এখন কী করছিলে?

হেনরি।। পড়ছিলাম।

মাইকেল।। গুড। তাহলে যাও, পড়ো গিয়ে। এবারে যাতে ফার্স্ট হতে পারো সেই চেষ্টা করো।

হেনরি।। থ্যাঙ্ক য়্যু, স্যার।

আবার সেই বিরক্তিকর কাকের ডাক একটুকাল শোনা যাবে।

মাইকেল।। মিঃ ম্যাশন, আপাতত এখানকার কাজ আমাদের শেষ। তবে বলা যায়, কাজের এখান থেকেই শুরু।

জর্জ।। ধন্যবাদ।

মাইকেল।। হ্যাঁ, ভালো কথা, এই তদন্তের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি লণ্ডন ছেড়ে কোথাও যাবেন না মিঃ ম্যাশন। প্লিজ। অবশ্য নিতান্ত অপারগ হলে থানা থেকে লিখিত অনুমতি আনিয়ে দিতে হবে আপনাকে।

জর্জ।। সে কী? আপনি কি আমাকেই সন্দেহ করছেন নাকি?

মাইকেল।। আসল অপরাধী ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত সন্দেহের তালিকায় সকলেরই নাম লেখা হয়ে যায় মিঃ ম্যাশন। কিছু মনে করবেন না স্যার, ওটাই পুলিশি তদন্তের পদ্ধতি। গুড নাইট।

জর্জ।। গুড নাইট।

একটা জিপ গাড়ি দূরে চলে গেল।

দৃশ্যান্তর

দূর থেকে একটা জিপ এসে থামলো।

রবার্ট।। স্যার—

মাইকেল।। ইয়েস—

রবার্ট।। এই তো এডওয়ার্ড স্ট্রিট। ওই যে 'সানশাইন ম্যানশন'।

মাইকেল।। হুম্। এটা তো খুবই পশ্ এরিয়া দেখছি— এখানে যখন থাকে তখন বোঝা যাচ্ছে মার্টিন বেশ অবস্থাপন্ন লোক!

রবার্ট।। সে তো বটেই। এখন তো রাত প্রায় নটা। এত রাতে এমন একজন সম্ভ্রান্ত লোককে বিরক্ত করা কি উচিত হবে স্যার?

মাইকেল।। পুলিশের চাকরিতে সময়-অসময় বলে কিছু নেই রবার্ট। উই আর অল ডিউটিবাউণ্ড।

রবার্ট।। ইয়েস স্যার।

মাইকেল।। লেট আস মুভ।

দৃশ্যান্তর

সিম্ফনি বাজছে। গ্লাসে মদ ঢালার শব্দ। ঘড়িতে ন-টা বাজালো। দরজায় টোকা।

জোনস।। ইয়েস, কাম ইন। ... একি! আপনারা?

মাইকেল।। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি মাইকেল হোবার্ট, থানা থেকে আসছি।

জোনস।। সেটা অনুমান করছি। কিন্তু আপনারা বোধহয় বাড়ি ভুল করেছেন।

মাইকেল।। আপনার নাম তো মিঃ মার্টিন জোনস? এটা এডওয়ার্ড স্ট্রিটের 'সানশাইন ম্যানশান' এবং আপনার অ্যাপার্টমেণ্ট ৬ তলার ২০ নম্বরে। ঠিক?

জোনস।। সবই ঠিক। কিন্তু—

মাইকেল।। আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু জরুরি কথা আছে মিঃ জোনস, অসময়ে তাই বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।

জোনস।। দ্যাটস অলরাইট। কিন্তু আমার সঙ্গে পুলিশের জরুরি কথা? আশ্চর্য!

মাইকেল।। রবার্ট, তোমরা এবার ঘরগুলো একটু ভালো করে দেখে নাও।

রবার্ট।। অলরাইট স্যার।

জোনস।। কিন্তু আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না মিঃ অফিসার, আমার ঘর আপনারা সার্চ করবেন কেন? কী করেছি আমি?

মাইকেল।। সেই বিষয়েই তো কথা বলতে এসেছি। আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন।

জোনস।। বসেছি। বলুন কী জানতে চান?

মাইকেল।। বলছি। ক্লিণ্টন, তুমি নোট করো। ... ওয়েল, আপনার নাম তো মিঃ মার্টিন জোনস?

জোনস।। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাইকেল।। আপনি কোন অফিসে কাজ করেন?

জোনস।। 'হারভার্ট অ্যাণ্ড স্মিথ', একটা প্রাইভেট ফার্ম।
মাইকেল।। কত বছর করছেন?
জোনস্।। তা ৬/৭ বছর হবে। আমি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টে আছি।
মাইকেল।। আপনাদের ছুটি কটায় হয়?
জোনস।। সাড়ে-পাঁচটায়।
মাইকেল।। আজ কটায় আপনি বাড়ি ফিরেছেন?
জোনস।। তা ধরুন, সাড়ে-সাতটা হবে।
মাইকেল।। মাঝের সময়টা কোথায় ছিলেন?
জোনস।। গাড়ি খারাপ হয়েছিল পথে, তাই—
মাইকেল।। গাড়ি কি সারালেন?
জোনস।। না, মিস্ত্রি ডেকে গ্যারাজে পাঠিয়ে দিয়েছি।
মাইকেল।। গাড়ি তো আপনার নিজের? এ অ্যাপার্টমেণ্টটাও তো আপনিই কিনেছেন?
জোনস।। হ্যাঁ, কিন্তু—
মাইকেল।। আপনি কোন ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খান?
জোনস।। মেরি গোল্ড।
মাইকেল।। মেরিনা ম্যাশনকে চেনেন?
জোনস।। হ্যাঁ, খুব ভালোভাবেই চিনি।
মাইকেল।। তার ফ্ল্যাটে আপনি কি প্রায়ই যান?
জোনস।। হ্যাঁ, তা মাঝেমধ্যে গিয়েছি বইকি!
মাইকেল।। আজ গিয়েছিলেন?
জোনস।। আজ? না? গত সাতদিন আমার সঙ্গে ওর দেখাই হয়নি।
মাইকেল।। আপনি তাকে ভালোবাসেন?
জোনস।। এ কী বলছেন? তিনি অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী!
মাইকেল।। তবু তো অনেকে বাসে?
জোনস।। না, আমাকে দয়া করে সেই দলে ফেলবেন না। কিন্তু এত কথা জিগ্যেস করছেন কেন?
মাইকেল।। শুনলে হয়তো আপনি দুঃখ পাবেন।
জোনস।। তবু আমি শুনতে চাই।
মাইকেল।। তাহলে শুনুন মিঃ মার্টিন জোনস, আজ সন্ধের মুখে আপনার পরিচিত মিসেস মেরিনা ম্যাশন মারা গেছেন।
জোনস।। কী বলছেন আপনি? মেরিনা মারা গেছে? কী হয়েছিল?
মাইকেল।। তাকে খুন করা হয়েছে।
জোনস।। খুন? মেরিনা খুন হয়েছে?

সিম্ফনির রেকর্ডটা শেষ হয়ে গিয়ে একটা বিরক্তিকর ঘ্যাসঘ্যাসে আওয়াজ চলতে থাকে।

মাইকেল।। আপনার রেকর্ডটা শেষ হয়ে গেছে, মিঃ জোনস, দয়া করে ওটা বন্ধ করে দিন। একটা অর্থহীন শব্দ, বড়ো বিরক্তিকর।

জোনস।। হ্যাঁ, ঠিক যেমন আপনার প্রশ্নের সামনে আমার মনের অবস্থা...

মাইকেল।। হা হা– মন্দ বলেন নি। যাক, আবার আমাদের আলোচনায় ফেরা যাক। মিস্টার জোনস, আপনি বিয়ে করেননি কেন?

জোনস।। সময় করে উঠতে পারিনি।

রবার্ট।। স্যার, মিঃ জোনসকে লেখা মিসেস ম্যাশানের এই চিঠিগুলো ওই দেরাজের মধ্যে পাওয়া গেল।

মাইকেল।। ঠিক আছে, রেখে দাও। ওগুলো এগ্‌জিবিট হিসেবে লাগবে। আচ্ছা মিঃ জোনস, ওগুলো কি প্রেমপত্র?

জোনস।। ঠিক তা নয়। চিঠি লেখা মেরিনার একটা হবি ছিল। আবোলতাবোল লিখতো। স্বামীর সঙ্গে প্রেম করতে পারলাম না, তাই তোমার সঙ্গে করছি — এরকম চিঠিও আছে। তবে ওগুলো নেহাতই কথার কথা।

মাইকেল।। ওর স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হতো না কেন?

জোনস।। ওর স্বামী বড্ডো হিসেবি। ব্যবসায়ী মানুষ, তায় বয়েসের অনেক তফাত।

মাইকেল।। ও কি ডির্ভোসের কথা ভাবছিল?

জোনস।। দুঃখ করে এমন কথা বলতো বটে কখনোসখনো।

মাইকেল।। আচ্ছা মিঃ জোনস, আপনি পিস্তল ব্যবহার করেন?

জোনস।। করি।

মাইকেল।। লাইসেন্স আছে?

জোনস।। অবশ্যই।

মাইকেল।। পিস্তলটা একটু দেখাবেন?

জোনস।। নিশ্চয়ই। ... কী আশ্চর্য! এই ড্রয়ারেই তো ছিল। ... তাহলে বোধহয় অফিসের দেরাজে ফেলে এসেছি।

মাইকেল।। এতটা অসাবধান হওয়া উচিত হয়নি। পিস্তল বলে কথা! কিন্তু অফিসের ড্রয়ারে যে রেখেছেন, সেটা মনে আছে তো?

জোনস।। হ্যাঁ মানে...

মাইকেল।। মেরিনার ফ্ল্যাট থেকে কিন্তু আমরা একটা পিস্তল পেয়েছি।

জোনস।। পেতেই পারেন। জর্জের পিস্তল আছে, আমি জানি।

মাইকেল।। না, ওটা ওর নয়।

জোনস।। তা হবে।

মাইকেল।। আচ্ছা– বয় ফ্রেণ্ডদের মধ্যে কার ওপর মেরিনার বেশি দুর্বলতা ছিল?

জোনস।। আমার যতদূর ধারণা— টম যোসেফের ওপর।

মাইকেল।। শিওর?

জোনস।। আমার ধারণা। তবে মেয়েদের কে কবে বুঝতে পেরেছে বলুন?

মাইকেল।। ধন্যবাদ মিঃ জোনস, আবার দেখা হবে।

জোনস।। আবার?

মাইকেল।। হ্যাঁ আবার। হয়তো বা আরো অনেকবার। গুড নাইট।

জোনস।। গুড নাইট।

ঝড়ের শব্দ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

দৃশ্যান্তর

আবহসংগীতে বিদেশি সুর। তাতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাবে। ডোর বেল। দরজা খোলার শব্দ।

মাইকেল।। টম যোসেফ?

যোসেফ।। ঠিক ধরেছেন। আপনি নিশ্চয়ই থানা থেকে একটু আগে টেলিফোন করেছিলেন?

মাইকেল।। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই মাইকেল হোবার্ট। এঁরা আমার সহকারী।

যোসেফ।। বসুন। বলুন কী জানতে চান?

মাইকেল।। আপনি কি এখানে একাই থাকেন?

যোসেফ।। না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে থাকি। আর কিছু?

মাইকেল।। তাঁকে তো দেখছি না?

যোসেফ।। তিনি বাইরে গেছেন।

মাইকেল।। কবে ফিরবেন?

যোসেফ।। ঠিক নেই। ব্যবসার কারণে ওঁকে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়।

মাইকেল।। আপনি কী করেন?

যোসেফ।। প্রায় কিছুই না। আমার বেশ কিছু বন্ধু আছেন— ট্রাভেলিং এজেন্ট; মাঝে-মধ্যে ওদের কিছু কাজ করে দিই। একা মানুষ আমি, চলে যায়।

মাইকেল।। আপনি মেরিনা ম্যাশনকে চেনেন?

যোসেফ।। চিনি বইকি। আমার বান্ধবী বলতে পারেন।

মাইকেল।। এখানে কখনও এসেছেন?

যোসেফ।। বহুবার। তবে ইদানীং— (কথা ঘোরায়) ও খুব জমটিয়া মেয়ে। ফুর্তি করতে জানে।

মাইকেল।। তবে 'ইদানীং' বলে যে থেমে গেলেন, সেটা শেষ করলে ভালো হয়।

যোসেফ।। (দ্বিধাগ্রস্ত) কী বলবো অফিসার, ইদানীং ও বড়ো অসংযত জীবনযাপন করতো। এ নিয়ে ওর স্বামীর সঙ্গেও যথেষ্ট.... খুবই স্বাভাবিক। এতে আমি জর্জের কোনো দোষ দেখি না। আমারই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো, ওর ওই সুন্দর মুখখানা অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিই।

মাইকেল।। আপনি দেখছি ওর ওপর দারুণ রেগে আছেন!

যোসেফ।। রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব কথা জিগ্যেস করছেন কেন?

মাইকেল।। কারণ, মেরিনা আজ আর বেঁচে নেই।

যোসেফ।। কী বলছেন আপনি?

মাইকেল।। হ্যাঁ, গতকাল সন্ধের আগে তাঁকে খুন করা হয়েছে।

যোসেফ।। খুন? আই মিন– মার্ডার?

মাইকেল।। ইয়েস।

যোসেফ।। কিন্তু কে ওকে মার্ডার করবে?

মাইকেল।। সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন? আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয় মিঃ যোসেফ?

যোসেফ।। আমার? না না, আমি কী করে বলবো? (একটু ভেবে) আচ্ছা আপনি লাইকার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন?

মাইকেল।। কে লাইকা?

যোসেফ।। ওর বাড়িতে পার্ট টাইম কাজ করতো? মেরিনার এক রকম বান্ধবীই ছিল বলতে পারেন। মেয়েটি সুশ্রী, মার্জিত ব্যবহার, সংযত কথাবার্তা– আসলে ভদ্রপরিবারের মেয়ে।

মাইকেল।। কোথায় থাকে?

যোসেফ।। উড স্ট্রিটে। নম্বর জানি না, তবে উড স্ট্রিটে ঢুকে দ্বিতীয় বাড়িটার চার নম্বর ফ্ল্যাটে থাকে।

মাইকেল।। অনেক ধন্যবাদ মিঃ যোসেফ। কিন্তু আপনি লাইকার কথা বললেন কেন?

যোসেফ।। ইদানীং– কেন জানিনা, মেরিনার সঙ্গে লাইকার প্রায়ই ঝগড়া হতো। ও যেন লাইকাকে সহ্য করতে পারতো না।

মাইকেল।। কী কারণে ঝগড়া হতো?

যোসেফ।। সম্ভবত মার্টিনকে ঘিরে। হয়তো একই নৌকো দুজনেরই পছন্দ ছিল। অবশ্য এটা আমার অনুমান। ভুলও হতে পারে।

মাইকেল।। আচ্ছা আপনি পিস্তল চালাতে জানেন?

যোসেফ।। পাগল! চালানো তো দূরের কথা, কোনোদিন ছুঁয়েও দেখিনি।

মাইকেল।। ধন্যবাদ।

দৃশ্যান্তর

দু-তিনবার ডোর বেল বাজে। ভিতর থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল।

মহিলা।। কে? (দরজা খোলার শব্দ) একি! আপনারা?
মাইকেল।। আপনি কি এই ফ্ল্যাটেই থাকেন?
মহিলা।। হ্যাঁ, কিন্তু আমার বাড়িতে পুলিশ কেন?
মাইকেল।। লাইকা আপনার কে হন?
মহিলা।। আমার মেয়ে। কিন্তু কেন?
মাইকেল।। ওঁকে আমাদের দরকার।
মহিলা।। ও তো এখন বাড়িতে নেই?
মাইকেল।। কখন ফিরবে?
মহিলা।। একটু পরেই। একটা মিল্‌ক ডিপোতে কাজ করে। সেখানেই গেছে।
মাইকেল।। আমরা একটু অপেক্ষা করতে পারি কি?
মহিলা।। আসুন। ... বসুন।
মাইকেল।। এখানে আর কে কে থাকেন আপনারা?
মহিলা।। মেয়ে ছাড়া আমার স্বামী থাকেন।
মাইকেল।। কী করেন তিনি?
মহিলা।। এখন আর কিছুই করতে পারেন না। দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। আগে একটা ফার্মে অ্যাকউন্টেন্ট ছিলেন।
মাইকেল।। তাহলে এখন আপনাদের চলে কী করে?
মহিলা।। ওঁর পেনশন আর এই মেয়ের রোজগারই ভরসা।
মাইকেল।। মেরিনা ম্যাশানকে চেনেন?
মহিলা।। দেখিনি, নাম শুনেছি। আমার মেয়ে ওর কাছে কাজ করে।
মাইকেল।। কাল সন্ধ্যায় মেরিনা খুন হয়েছে।
মহিলা।। খুন? মেরিনা?
মাইকেল।। হ্যাঁ। কেন আপনার মেয়ে বলেনি?
মহিলা।। না। কিন্তু এর সঙ্গে আমার মেয়ের সম্পর্ক কী?
মাইকেল।। সেটাই তো আমাদের জানা দরকার।
মহিলা।। আপনারা কি ওকেই সন্দেহ করছেন নাকি?
মাইকেল।। সবই তো প্রমাণসাপেক্ষ।
লাইকা।। মা—
মহিলা।। এই তো লাইকা এসে গেছে।
লাইকা।। আপনারা?

মাইকেল।। আমার নাম মাইকেল হোবার্ট। মেরিনা ম্যাশানের খুনের ব্যাপারে আপনার কাছে আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। মেরিনা খুন হয়েছে আপনি জানেন?

লাইকা।। জানি। আমি ওখানে থাকাকালীনই উনি খুন হয়েছেন।

মাইকেল।। তখন আর কে ছিল?

লাইকা।। কেউ না।

মাইকেল।। তাহলে খুন হল কী করে?

লাইকা।। সেটাই তো রহস্য।

মাইকেল।। কোনো শব্দ শুনতে পাননি?

ল্যাইকা।। না। সম্ভবত খুনীর পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো ছিল।

মাইকেল।। কী করে বুঝলেন?

লাইকা।। তা নইলে তো শব্দ শুনতে পেতাম।

মাইকেল।। আপনি পিস্তল চালাতে পারেন?

লাইকা।। পারি। কলেজে পড়ার সময়ে কিছু ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

মাইকেল।। আপনার পিস্তল আছে?

লাইকা।। না। এককালে বাবার একটা ছিল, এখনো আছে কিনা জানি না।

মাইকেল।। মেরিনার কোনো শত্রু ছিল জানেন?

লাইকা।। না, জানিনা।

মাইকেল।। খুন হবার সময়ে ওর স্বামী কি বাড়িতে ছিলেন?

লাইকা।। না। তবে তার একটু পরেই উনি বাড়িতে ফেরেন।

মাইকেল।। ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?

লাইকা।। আমি যতদূর জানি, ভালো না। প্রায়ই কথা কাটাকটি হতো।

মাইকেল।। কী নিয়ে?

লাইকা।। টম যোসেফ, মার্টিন, হেনরি এদের নিয়ে।

মাইকেল।। ওদের আপনি চেনেন?

লাইকা।। দেখেছি কয়েকবার।

মাইকেল।। আলাপ আছে?

লাইকা।। একেবারে যে নেই তা বলতে পারবো না।

মাইকেল।। আপনি কি মার্টিন জোনসকে ভালোবাসেন?

লাইকা।। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। উত্তর দিতে বাধ্য নই।

মাইকেল।। মেরিনা কি এ নিয়ে চেঁচামিচি করতো?

লাইকা।। ও একটা সাংঘাতিক মেয়েমানুষ।

মাইকেল।। সাংঘাতিক কেন?

লাইকা।। ভীষণ জেলাস। মার্টিন আমাকে পছন্দ করতো, তাই শেষ দিকে আমাকে দেখতে পারতো না। উঠতে বসতে কথা শোনাতো।

মাইকেল।। তাহলে আপনাকে রেখেছিল কেন?

লাইকা।। মারা যাবার আগের দিন আমাকে জবাব দিয়ে দিয়েছিল। মারা যাবার দিন আমার হিসেবপত্তরও মিটিয়ে দিয়েছিল।

মাইকেল।। আশ্চর্য! আর তারপরেই সে খুন হলো? মার্টিনকে তো খুবই আপসেট দেখলাম।

লাইকা।। হতেই পারে। একসময়ে তো মেরিনাকে ভালোবাসতো। পরে অবশ্য সহ্য করতে পারতো না।

মাইকেল।। ওয়েল, আপনাকে আমার আবার দরকার হতে পারে। আপনি স্টেশন লিভ করবেন না।

লাইকা।। যদি দরকার পড়ে?

মাইকেল।। থানায় জানাবেন। আশা করি, আইন নিজের হাতে নেবেন না।

লাইকা।। আপনার কথা মনে থাকবে।

মাইকেল।। ধন্যবাদ।

মহিলা।। মিঃ অফিসার, আমার মেয়ের কিছু হবে না তো?

মাইকেল।। এর উত্তর আমার জানা নেই ম্যাডাম। গুড বাই।

দরজা বন্ধের শব্দ।

মহিলা।। এ কী ঝামেলা শুরু হলো বল তো লাইকা? এতসব যে ঘটে গেছে আমি তো কিছুই জানি না? আমরা গরিব মানুষ, একবার পুলিশি হাঙ্গামা শুরু হলে আমরা কি সামাল দিতে পারবো?

লাইকা।। এর কোনোটাই এখন আমাদের হাতে নেই মা। যা ভবিতব্য হবেই।

ডোর বেল বাজে।

মহিলা।। আঃ! আবার কে এল?

দরজা খোলার শব্দ।

লাইকা।। একি! মিঃ ম্যাশান? আপনি?

জর্জ।। একটা জরুরি কথা বলতে এলাম।

মহিলা।। আপনি ভেতরে এসে বসুন। (দরজা বন্ধ হবার শব্দ) আপনাকে একটু কফি করে দেবো?

জর্জ।। না ধন্যবাদ। আমি লাইকাকে দুটো কথা বলেই চলে যাবো। ফ্যাক্টরিতে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

মহিলা।। বেশ, তাহলে বসুন। কথা বলুন আপনারা।

লাইকা।। বলুন মিঃ ম্যাশান।

জর্জ।। ফ্ল্যাটের চাবি আমি হেনরির মা মরিয়ামের কাছে রেখে এসেছি। তোমাকে সেটা জানানো দরকার। তুমি বিকেলে এলে কিছু কথা বলবো। আমি সন্ধের মুখেই ফিরে আসবো।

লাইকা।। কিন্তু আমার আর যাবার কী দরকার? আমাকে তো ম্যাডাম ছাড়িয়ে দিয়েছেন?

জর্জ।। সেকি? কবে?

লাইকা।। গতকালই উনি আমাকে টাকাপয়সা মিটিয়ে জবাব দিয়েছেন।

জর্জ।। সেকি! আমি জানি না তো?

লাইকা।। হয়তো আপনাকে জানাবার সময় পাননি। তাছাড়া ম্যাডামই আমাকে রেখেছিলেন, উনিই ছাড়িয়ে দিয়েছেন— আমারও জানাবার কোনো দায়িত্ব নেই।

জর্জ।। হুম্। নতুন কোনো কাজ পেয়েছো?

লাইকা।। না, এত তাড়াতাড়ি আর কোথায় পাবো? তবে চেষ্টা করতে হবে।

জর্জ।। বাইরে যাবে? এখান থেকে অনেক বেশি মাইনে পাবে?

লাইকা।। কোথায়?

জর্জ।। ইতালিতে?

লাইকা।। সে তো অনেক দূর?

জর্জ।। হ্যাঁ, ওখানে আমার এক বন্ধুর বিরাট বিজনেস। তার সঙ্গে ফোনে আমার কথা হয়েছে। আমি তোমার কথা বলেছি। সে নিতে রাজি আছে।

লাইকা।। কিন্তু আমার জন্যে আপনার বন্ধুকে বলতে গেলেন কেন? আমি তো আপনাকে কোনো অনুরোধ করিনি?

জর্জ।। মেরিনার সঙ্গে তোমার যা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল, এতে আমি বুঝতে পারছিলাম ও তোমাকে রাখবে না। তাই বাধ্য হয়েই— মানে তোমার কথা ভেবেই—

লাইকা।। বুঝলাম। আপনার অনেক অনুগ্রহ। আপনি বোধহয় আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চাইছেন?

জর্জ।। না না, তা কেন? তোমার তো টাকার দরকার? তোমার এই ফ্যামিলি কনডিশান—

লাইকা।। দেখুন, এ সব নিয়ে আমাকে আগে আলোচনা করতে হবে। পরে জানাবো।

জর্জ।। আলোচনা? কার সঙ্গে? মার্টিনের সঙ্গে বোধহয়? শোনো লাইকা— আমার কথা না শুনলে আমি তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবো।

লাইকা।। তার মানে?

জর্জ।। আমি জানি, তুমি আর মার্টিন মিলে মেরিনাকে খুন করেছ।

লাইকা।। তাই নাকি? আপনি জানেন?

জর্জ।। হ্যাঁ। মেরিনা খুন হবার সময়ে তুমি ছিলে, মার্টিনও এসেছিল। দুজনের সঙ্গেই মেরিনার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল তখন। হেনরি আমাকে সব বলেছে। ও নিজের কানে সব শুনেছে।

লাইকা।। তাই? তা খুনের পরক্ষণেই তো আপনিও বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। কোত্থেকে এলেন তক্ষুনি?

জর্জ।। যেখান থেকেই আসি, খুনের সময়ে তো আমি সেখানে ছিলাম না?

লাইকা।। সেটা তো আপনার একটা চাল। এমনো তো হতে পারে, আপনি পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে ওকে খুন করে, টেলিফোনের তার ছিঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছেন? এবং তারপর রুমালে মুখ মুছে আবার সামনের দরজা দিয়ে ভালোমানুষ সেজে ঢুকেছেন?

জর্জ।। (তোতলায়) বাঃ বাঃ! চমৎকার গল্প সাজিয়েছো তো?

লাইকা।। তোতলাচ্ছেন কেন?

জর্জ।। তোতলাবো কেন? তোমরা আমার স্ত্রীকে ব্যাভিচারী করেছিলে। শেষে তুমিই মার্টিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওকে আরো হিংস্র করে তুলেছিলে। তার ফলেই ওর এই পরিণতি হলো! আমার কথা না শুনলে আমি পুলিশকে সব জানাবো।

লাইকা।। চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এখন আসুন, নমস্কার।

জর্জ।। ঠিক আছে, তবে আমিও তোমাকে ছাড়বো না।

দৃশ্যান্তর

টেলিফোনের শব্দ। মাইকেল ধরে।

মাইকেল।। মাইকেল হোবার্ট স্পিকিং।

লেসলি।। স্যার, আমি ইনফরমার লেসলি বলছি। আপনি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই জর্জ ম্যাশান লাইকার বাড়িতে এসেছিলো। প্রায় ২০ মিনিট ছিল।

মাইকেল।। গাড়ি নিয়ে এসেছিলো?

লেসলি।। হ্যাঁ স্যার।

মাইকেল।। গাড়ির নম্বর নিয়েছো?

লেসলি।। হ্যাঁ স্যার। টাইমটাও নোট করে নিয়েছি।

মাইকেল।। ঠিক আছে, ওয়াচে রাখো, পরে যোগাযোগ করছি।

দৃশ্যান্তর

বার-এর গোলমালের শব্দ।

মাইকেল।। ও. কে. ... এসো টমাস। কাজ করছিলে?

টমাস।। হ্যাঁ স্যার। এখন তো লাঞ্চের সময়। বলুন কী জানতে চান?

মাইকেল।। কাল তুমি বারে এসেছিলে?

টমাস।। (থতমত খেয়ে) কাল... মানে...

মাইকেল।। আসোনি। কাল তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছিলে! তোমার অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার দেখিয়েছেন তোমার মালিক। কোথায় গিয়েছিলে কাল?

টমাস।। একটা বিশেষ কাজে স্যার।

মাইকেল।। কোথায়? কার কাছে?

টমাস।। আমার এক গার্লফ্রেণ্ডের কাছে।

মাইকেল।। কথাটা বিশ্বাস করা গেল না। ওটা তুমি দরকার হলে সকালে অথবা ডিউটির পরেও যেতে পারতে। পুলিশের কাছে মিথ্যে বলার অনেক অসুবিধে টমাস। এর জন্যে হাজতবাসও হতে পারে।

টমাস।। বিশ্বাস করুন স্যার, আমি খুন করিনি।

মাইকেল।। সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কার কাছে গিয়েছিলে কাল?

টমাস।। মিঃ মার্টিন জোনসের কাছে স্যার।

মাইকেল।। আচ্ছা। তা কী কথা হল ওর সঙ্গে? কিছু গোপন করার চেষ্টা করলে বিপদ।

টমাস।। না স্যার। যা হয়েছিল সবই বলছি।

॥ পূ র্ব ক থা ॥

বি. দ্র. প্রত্যেকটি পূর্বকথনের আগে এবং পরে একটি ভিন্ন ধরণের যন্ত্রসংগীত বা প্রতীকী কোনো শব্দ ব্যবহার করলে দুটি ভিন্ন সময়ের ব্যবধান সহজে বোধগম্য হবে মনে হয়। অফিসের পরিবেশ কিন্তু মৃদু।

জোনস।। বলো টমাস।

টমাস।। অফিস কামাই করে আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম স্যার।

জোনস।। আমি জানি, তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো। বলো।

টমাস।। আজ মেরিনা ম্যাডামের বাড়ি যাবেন তো স্যার?

জোনস।। হ্যাঁ ইচ্ছে আছে। ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া দরকার।

টমাস।। বোঝাপড়া?

জোনস।। হ্যাঁ, তুমি তো সবই জানো। ও ডিভোর্সের কথা ভাবছে।

টমাস।। ডির্ভোস? কেন?

জোনস।। আমার জন্যেই। তবে আমারও যে খুব একটা আপত্তি আছে তা নয়।

টমাস।। দয়া করে এ ভুল করবেন না স্যার। ও এক ব্যাভিচারী মেয়েমানুষ। এই কথাটা বলবার জন্যেই আজ অফিস কামাই করে এসেছি। ওকে নিয়ে আপনি সুখী হবেন না। ও আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।

জোনস।। তুমি কি ওর উপর রেগে আছ?

টমাস।। না স্যার, আমার কী স্বার্থ? তবে দেখছি তো! সাহেবকে একদিনের জন্যেও সুখ দেয়নি। এ ধরণের মেয়েরা একজন পুরুষে সুখী হয় না। আমার কথায় কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনাকে ভালোবাসি বলেই বললাম।

জোনস।। তাহলে তুমি আমাকে কী করতে বলো?

টমাস।। আপনি লাইকা দিদিমণির কথা কখনও ভেবেছেন, স্যার?

জোনস।। লাইকা দিদিমণি?

টমাস।। হ্যাঁ, উনি কিন্তু আপনাকে ভালোবাসেন।

জোনস।। তিনিই কি তোমাকে পাঠিয়েছেন?

টমাস।। না স্যার, আমি নিজেই এসেছি। আমি চাই ভয়ংকর একটা সর্বনাশের হাত থেকে আপনি বাঁচুন। ... লাইকা দিদিমণি বড়োঘরের মেয়ে। অবস্থার বিপাকে এই কাজ করতে হচ্ছে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে, সত্যিই আপনি সুখী হবেন।

জোনস।। অনেক ধন্যবাদ টমাস। এই টাকাটা রাখো, একটা ভালো মদের বোতল কিনে নিয়ো।

টমাস।। ধন্যবাদ। চলি স্যার? আমার কথাটা ভাববেন।

॥ পূর্বকথা শেষ ॥

আবার সেই বার-এর আবহ ও পরিবেশ ফিরে আসে।

মাইকেল।। বিকেলে মার্টিন মেরিনার কাছে গিয়েছিল?

টমাস।। হ্যাঁ স্যার, সেই রকমই শুনেছি।

মাইকেল।। আর লাইকা তো খুন হবার সময়ে ছিল?

টমাস।। সেটাও ঠিক।

মাইকেল।। এবার তুমি যেতে পারো টমাস।

টমাস।। আমার কিছু হবে না তো স্যার?

মাইকেল।। সত্যি বললে কিছুই হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

দৃশ্যান্তর

ডোর বেল বাজে। দরজা খোলার শব্দ।

লাইকা।। একি! আবার আপনি?

মাইকেল।। উপায় কী মিস লাইকা, পুলিশের চাকরিটাই এমনি।

লাইকা।। বলুন, কী জানতে চান?

মাইকেল।। খুনের দিন কটায় আপনি মেরিনার বাড়ি গিয়েছিলেন?

লাইকা।। যখন যাই— পাঁচটা। সাড়ে-ছটা পর্যন্ত ছিলাম।

মাইকেল।। তখন ফ্ল্যাটে কেউ এসেছিল?

লাইকা।। হেনরি এসেছিল। ম্যাডামের সঙ্গে খুব ঝগড়া করছিল।

মাইকেল।। আর কেউ?

লাইকা।। কই না?

মাইকেল।। একটু ভেবে বলুন। আমাদের কাছে কিন্তু অন্য খবর আছে।

লাইকা।। আমার তো মনে পড়ছে না।

মাইকেল।। তাহলে আমি মনে করিয়ে দিই? মিঃ মার্টিন জোনস এসেছিলেন।

লাইকা।। কে বলেছে?

মাইকেল।। টমাস। সে নিশ্চয়ই ভুল বলবে না?

লাইকা।। কিন্তু টমাস তো সেখানে ছিল না। তাছাড়া যে-ই আসুক— আমি তো আর খুন করিনি?

মাইকেল।। সেটা তো আদালত বিচার করবে। তবে কিছু গোপন করার অর্থ কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া।

লাইকা।। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। ঠিক। মার্টিন এসেছিল।

মাইকেল।। ধন্যবাদ। আপনি মার্টিনকে ভালোবাসেন, তাই না? যাক সে কথা, মার্টিন তখন কার সঙ্গে কথা বলেছে?

লাইকা।। মেরিনার সঙ্গে। তবে সেটা কথা না বলে ঝগড়া বলাই ভালো।

মাইকেল।। এই ইনফরমেশানটুকুর জন্যে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিস লাইকা। চলি।

দৃশ্যান্তর

ডোর বেল বাজে। দরজা খোলার শব্দ।

মাইকেল।। হ্যালো হেনরি, তুমি কি এই স্কুল থেকে ফিরলে?

হেনরি।। কিছুক্ষণ আগে। বসুন। কফি খাবেন?

মাইকেল।। না, ধন্যবাদ।

হেনরি।। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে কিছু জিগ্যেস করতে এসেছেন?

মাইকেল।। ঠিক ধরেছ। মেরিনা চলে যাওয়ায় তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?

হেনরি।। কেন, কষ্ট হবে কেন? মেরিনা আমার কে?

মাইকেল।। ওর ওপর তো তোমার খুব রাগ দেখছি? মেরিনা বুঝি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতো?

হেনরি।। হ্যাঁ, খুব খারাপ।

মাইকেল।। খুবই দুঃখের কথা।

হেনরি।। ওর জন্যে আমি কী না করেছি? ওর শখ আহ্লাদ সব মিটিয়েছি। ওর জন্যে আমার সব গার্ল ফ্রেণ্ড আমাকে এড়িয়ে চলতো। তবু মার্টিন বা যোসেফরা এলে ও আমাকে যেন চিনতেই পারতো না। আমাকে তখন বের করে দিত ঘর থেকে। আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে যেত। মনে মনে ভেবেছি, ওকে আমি খুন করবো। কিন্তু আমার তো পিস্তল নেই। এর বেশি আর কিছু জিগ্যেস করবেন না আমাকে।

মাইকেল।। হুম্। পুয়োর সোল।

দৃশ্যান্তর

ডোর বেল বাজে।

মাইকেল।। হ্যালো টমাস—

টমাস।। আসুন স্যার। সাহেব এখনো ফেরেননি। তবে এখুনি ফিরবেন।

মাইকেল।। আচ্ছা টমাস, হেনরির সঙ্গে তোমার ম্যাডামের সম্পর্ক কেমন ছিল?

টমাস।। ওসব আমাকে জিগ্যেস করবেন না স্যার। ওসব ঘরের নোংরামির কথা।

মাইকেল।। এই তদন্তের কাজে আমার জানা দরকার যে?

টমাস।। অবৈধ সম্পর্ক ছিল স্যার। তবে টম, মার্টিন এলে তো ওকে পাত্তা দিতেন না? ও একদিন ম্যাডামকে তাই ছুরি মারতে গিয়েছিল, আমি ধরে ফেলেছিলাম। (ডোর বেল) ঐ সাহেব—

জর্জ।। কতক্ষণ এসেছেন?

মাইকেল।। টমাস, তুমি ওঘরে যাও, আমাদের কিছু কথা আছে। এই একটু আগে।

জর্জ।। বলুন।

মাইকেল।। কাল সকালে ফ্যাক্টরি যাবার পথে গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

জর্জ।। (ঘাবড়ে যায়) ইয়ে, লাইকার কাছে। ওর তো চাকরি নেই, একটা কাজের

খবর দিতে গিয়েছিলাম।

মাইকেল।। দুর্ঘটনার দিনে সন্ধেবেলা আপনি কোথায় ছিলেন?

জর্জ।। আগেই তো বলেছি, আমার এক বন্ধুর বাড়ি তাস খেলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু খেলা হয়নি, আমার বন্ধুটি বাড়ি ছিলেন না।

মাইকেল।। না, আপনার বন্ধু বব কলিন্স বাড়ি ছিলেন। কাল খেলাও হয়েছে। শুধু আপনিই উপস্থিত ছিলেন না।

জর্জ।। কে বলেছে?

মাইকেল।। কলিন্স নিজেই। তাছাড়া অন্য প্রমাণও আছে।

জর্জ।। তা হবে। এখন আমার মাথার ঠিক নেই।

মাইকেল।। তাহলে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন তখন?

জর্জ।। এর উত্তর আমি দিতে বাধ্য নই। আমার লিগাল অ্যাডভাইসারের সঙ্গে আগে পরামর্শ করতে হবে।

মাইকেল।। বেশ, তাই হবে। কোর্টেই তাহলে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, মিঃ ম্যাশান। গুড নাইট।

দৃশ্যান্তর

বিদেশি সুরে সাসপেন্স মিউজিক বাজবে।

মাইকেল।। কী ব্যাপার রবার্ট, এমন হন্তদন্ত হয়ে এলে কোত্থেকে?

রবার্ট।। সাংঘাতিক খবর স্যার, আপনি শুনেছেন?

মাইকেল।। কোন খবরের কথা বলছো?

রবার্ট।। মার্টিন জোনস আর লাইকা শহর থেকে উধাও?

মাইকেল।। সেকি? কে বললে?

রবার্ট।। ইনফরমার লেসলির কাছ থেকে খবর পেয়ে আমি মার্টিনের অ্যাপার্টমেণ্টে গিয়েছিলাম, ওখান থেকেই পাকা খবর পেয়েছি। ওর ঘরে একটা ছেলে ছিল, ওর আত্মীয়, তার কাছ থেকেই জানলাম। কোথায় গেছে ও জানে না, তবে বললো, লাইকা ছিল সঙ্গে।

মাইকেল।। ভাবনার কথা।

রবার্ট।। অফিসে খবর নিয়ে জানলাম মার্টিন ছুটি নেয়নি বটে, তবে মেডিকেল গ্রাউণ্ডে সে কামাই করতে পারে।

মাইকেল।। ধরো, আশেপাশে কোথাও তো যেতে পারে?

রবার্ট।। তা পারে, তবে কবে ফিরবে ছেলেটি কিন্তু বলতে পারেনি।

মাইকেল।। সে যাই হোক, ওদের তো স্টেশন লিভ করা বারণ ছিল— তা সত্ত্বেও....

ঠিক আছে, তুমি একটু নজর রাখো, আমি দেখছি। (টেলিফোন ডায়ালের শব্দ) হ্যালো, আমি থানা থেকে মাইকেল হোবার্ট বলছি, মিস লাইকাকে একটু ডেকে দিন।

মহিলা।। লাইকা বাড়ি নেই।

মাইকেল।। কোথায় গেছে?

মহিলা।। জানি না।

মাইকেল।। কখন ফিরবে?

মহিলা।। জানি না।

মাইকেল।। এই শহরেই আছে তো?

মহিলা।। জানি না।

মাইকেল।। কার সঙ্গে গেছে?

মহিলা।। জানি না।

মাইকেল।। ঠিক আছে, ও ফিরলে থানায় ফোন করতে বলবেন। আর্জেন্ট।

মহিলা।। বলবো।

টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দ।

মাইকেল।। তোমার খবরই তো ঠিক মনে হচ্ছে, রবার্ট। যাক, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে, আমি আরো একটা সংকটে পড়েছি।

রবার্ট।। কী ব্যাপার স্যার?

মাইকেল।। তুমি তো জানো রেকর্ড বুকের ফাইল, খুব পুরোনো আর অকেজো হয়ে গেলে, রেজিস্টার ধরে সেগুলো বাতিল করা হয়?

রবার্ট।। জানি তো। সেগুলো কয়েকটা দুঃস্থ প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেওয়া হয় যাতে তা বিক্রি করে অনাথ ছেলেমেয়েদের সাহায্য করা যায়।

মাইকেল।। ঠিক তাই। সম্প্রতি ওই ফাইলগুলোর মধ্যে আমার দুটো জরুরি ফাইলও চলে গেছে, যেগুলো না পেলে আসল সত্যিটাই খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে আমাদের।

রবার্ট।। বলেন কী?

মাইকেল।। হ্যাঁ, সে দুটো মেরিনার কেস সংক্রান্ত ফাইল। ওতে ওর পোস্টমর্টেম আর ফিঙ্গারপ্রিণ্ট একসপার্টের রিপোর্ট রয়েছে। এবং গতকালই এটা ঘটেছে।

রবার্ট।। কিন্তু এমন তো হবার কথা নয় স্যার? সব ফাইলই তো রেজিস্টার মিলিয়েই বাতিল করা হয়। এটা তো মিঃ লরেন্সের ডিপার্টমেণ্ট, ওকে জিগ্যেস করেছেন?

মাইকেল।। করেছি, কিন্তু তেমন কোনো সদুত্তর পাইনি। আমার ধারণা, এটা ইচ্ছাকৃত।

হাতেনাতে ধরতে না পারলেও, আমি জানি লরেন্স একটু দু-নম্বরি মানুষ। কোনো ভাবে ব্রাইভড হয়ে কাজটা করলো কিনা বুঝতে পারছি না।

রবার্ট।। কিছু মনে করবেন না স্যার, না জেনে কারো সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়। তবু বলি, আমাদের ইনফরমার লেসলি জানিয়েছে, লাইকাকে ফলো করে এসে দেখেছে, লাইকা নাকি পরশু দিন থানায় এসে মিঃ লরেন্সকে একটা খাম দিয়ে গেছে। তবে দূর থেকে দেখেছে বলে খামে কী ছিল বুঝতে পারেনি।

মাইকেল।। খবরটা দিয়ে তুমি ভালোই করলে রবার্ট। এবার মনে হচ্ছে একটু যেন আলো দেখতে পাচ্ছি। (হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে) ইয়েস, মাইকেল হোবার্ট বলছি। কে? লেসলি? ইনফরমার লেসলি? তোমাকে আমার একটু দরকার আছে। যাক, এখন কেন ফোন করেছ বলো?

লেসলি।। একটা খবর শুনেছেন স্যার, হেনরি খুন হয়েছে?

মাইকেল।। (চমকে ওঠে) কী বলছ? কবে? কোথায়?

লেসলি।। গতকাল রাতে স্যার। একটা নিষিদ্ধপল্লির সামনে পিস্তলের গুলিতে খুন হয়েছে। দুটো গুলি লেগেছিল, বুকে আর মাথায়।

মাইকেল।। বলো কী? এখানে তো কোনো খবর আসেনি?

লেসলি।। ঘটনাটা তো আপনার এলাকায় ঘটেনি স্যার। যেখানে ঘটেছে সেই অঞ্চলের পুলিশ ওকে সেন্ট পিটার্স হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল— সেখান থেকে ওরা ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছে। বডিও পোর্স্টমর্টেমের জন্যে পাঠানো হয়েছে। ওর মা মরিয়মকে খবর দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র সন্তান। ভদ্রমহিলা একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

মাইকেল।। স্বাভাবিক। ঠিক আছে লেসলি, আমি খবর নিচ্ছি। তোমার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করবো। তুমি একটু ওয়াচে রেখো।

টেলিফোন রেখে দেয়।

রবার্ট।। কী ব্যাপার স্যার?

মাইকেল।। কী বলবো? দুঃসংবাদের ওপর দুঃসংবাদ রবার্ট। হেনরি গতকাল রাতে খুন হয়েছে।

রবার্ট।। সে কী?

মাইকেল।। আশ্চর্য! মার্টিন, লাইকা উধাও আর হেনরি খুন? ব্যাপারটা খুব গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে না? তুমি ভালো করে একটু খোঁজখবর নাও তো রবার্ট।

দৃশ্যান্তর

ডোর বেল বাজে। একটু পরে দরজা খোলার শব্দ।

মরিয়ম।। আপনি? আপনাকে তো ঠিক....

রবার্ট।। আপনি তো মিসেস মরিয়ম? আমি রবার্ট। আপনার ছেলে হেনরির খুনের ব্যাপারে থানা থেকে কিছু খোঁজখবর নিতে এসেছি।

মরিয়ম।। ভিতরে আসুন। (দরজা বন্ধ হবার শব্দ) বসুন।

রবার্ট।। ধন্যবাদ। আচ্ছা, হেনরির এই খুনের ব্যাপারে আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়? মানে, ওর কোনো শত্রুটত্রু ছিল জানেন?

মরিয়ম।। না না, ওইটুকু ছেলের আবার শত্রু থাকবে কে?

রবার্ট।। খুনের দিনে আপনি কি অফিস থেকে ফিরে ওকে বাড়িতে দেখতে পেয়েছিলেন?

মরিয়ম।। না।

রবার্ট।। আচ্ছা, হেনরি কি কোনো পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করতো?

মরিয়ম।। না না, ও পিস্তল পাবে কোথায়?

রবার্ট।। আপনার বাড়িতে নেই?

মরিয়ম।। না। ওর বাবার একটা ছিল, তবে সেটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলায় হেনরিই ওই ভাঙা পিস্তলটা নিয়ে খেলতে খেলতে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলে।

রবার্ট।। ও নিষিদ্ধপল্লির সামনে মারা গেল কেন? ওর কি ওখানে যাতায়াত ছিল? কিছু মনে করবেন না, পুলিশের চাকরি— এমনি অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতে আমরা বাধ্য হই।

মরিয়ম।। অতটুকু ছেলে! ওসব জায়গায় যাতায়াত করবে কেন?

রবার্ট।। ওর বয়সি অনেকেই কিন্তু যায়।

মরিয়ম।। হতে পরে। আমার জানা নেই।

রবার্ট।। আচ্ছা, ওর গার্ল ফ্রেণ্ডরা কেমন ছিল?

মরিয়ম।। ওর কোনো গার্ল ফ্রেণ্ড ছিল না। আমি অন্তত জানি না। থাকলে জানতাম।

রবার্ট।। আপনি কি ওকে পয়সাকড়ি দিতেন?

মরিয়ম।। হ্যাঁ, তা মাঝেমধ্যে কিছু দিতাম বইকি। বাবা নেই, আমি না দিলে কোথায় পাবে?

রবার্ট।। ধন্যবাদ, আপাতত আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

মরিয়ম।। ওর বডি কখন ফেরত পাবো?

রবার্ট।। নটা-দশটা নাগাদ একবার থানায় ফোন করলে সঠিক সময়টা জানতে পারবেন। চলি।

দৃশ্যান্তর

টেলিফোন বাজে। মাইকেল তুললো।

মাইকেল।। ইয়েস, মাইকেল হোবার্ট স্পিকিং।

লেসলি।। ইনফরমার লেসলি বলছি স্যার। গুড নিউজ। মার্টিন আজ অফিসে জয়েন করেছে। তবে এখন অফিসে নেই, কাজে বেরিয়েছে।

মাইকেল।। থ্যাঙ্ক য়্যু। তুমি নজর রাখো, আমি দেখছি। (টেলিফোন ডায়াল করে) আমি মাইকেল হোবার্ট বলছি, লাইকার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

মহিলা।। লাইকা এখন বিশ্রাম করছে, আপনি পরে ফোন করবেন।

মাইকেল।। পুলিশের কাজে বাধা দেবেন না। এক্ষুনি ডেকে দিন ওকে।

মহিলা।। লাইকা তোর ফোন।

লাইকা।। হ্যালো, লাইকা বলছি।

মাইকেল।। কবে ফিরলেন?

লাইকা।। কাল রাতে?

মাইকেল।। একা গিয়েছিলেন, না সঙ্গে আরও কেউ ছিল?

লাইকা।। মার্টিন জোনস ছিল।

মাইকেল।। হেনরি খুন হয়েছে জানেন?

লাইকা।। হ্যাঁ, কাগজে দেখেছি।

মাইকেল।। হেনরি কেন মার্ডার হলো?

লাইকা।। তা আমি কী করে বলবো? আপনি কি আমাকেই সন্দেহ করছেন নাকি?

মাইকেল।। সেটা পরের ব্যাপার। থানায় না জানিয়ে স্টেশন লিভ করেছিলেন কেন?

লাইকা।। কে বলেছে আপনাকে? আপনাদের অফিসের মিঃ লরেন্সের হাতে সব জানিয়ে একটা খাম দিয়ে এসেছিলাম।

মাইকেল।। তাতে কার হাতের লেখা ছিল?

লাইকা।। আমার।

মাইকেল।। ধন্যবাদ, পরে আবার দেখা হবে। (টেলিফোন রেখে আবার ডায়াল করে) হ্যালো, কে লরেন্স? তুমি জেনে খুশি হবে আমার যে ফাইলগুলো খোয়া গিয়েছিল, অতিকষ্টে সেগুলো উদ্ধার করা গেছে। হ্যাঁ— মাঝখান থেকে আমার একটু হয়রানি হলো। ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ফটো কপি তো ওদের অফিসে রাখাই ছিল। তবে ওরিজিনালটা হারানোও তো কোনো কাজের কথা নয়? ঠিক আছে রাখছি। গুড ডে।

দৃশ্যান্তর

পরপর দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ হল।

মাইকেল।। জাস্ট এ মিনিট, মিঃ জোনস। অ্যাপার্টমেণ্টে যাবার আগে দু-একটা প্রশ্ন ছিল।

জোনস।। আই অ্যাম স্যরি মিঃ অফিসার। আমি ভীষণ টায়ার্ড। আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন সম্ভব নয়।

মাইকেল।। কিন্তু উত্তর না নিয়ে চলে যাওয়াও তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মিঃ জোনস। আইনকে আইনের পথে চলতে না দিলে আপনারই বিপদ বাড়বে।

জোনস। (হতাশ) ইমপসিবল! বলুন কী জানতে চান?

মাইকেল।। আপনার সেই হারানো পিস্তলটা খুঁজে পেয়েছেন?

জোনস।। না, আমি থানায় রিপোর্ট করেছি।

মাইকেল।। কোথায় পাবেন? ওটা তো এখন আমাদের হেফাজতে আছে। যে পিস্তলটা দিয়ে মেরিনাকে খুন করা হয়েছে, ওটা সেই পিস্তল। তাতে আপনার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে এবং মেরিনার দেহে ওই পিস্তলের গুলিই ছিল। এ বিষয়ে আপনার কিছু বলার আছে?

জোনস।। কী বলবো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

মাইকেল।। বুঝবেন। এবং হেনরির মৃত্যুটাও যে অলৌকিক নয়, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এতক্ষণে? আপনাদের গোপন কাজের সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখা যে উচিত হবে না, এটা তো বেশ বুঝেছিলেন? আর এই যে আপনার নামে ওয়ারেণ্ট, মিস্টার মার্টিন জোনস। আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম।

জোনস।। আমাকে দয়া করে একবার আমার অ্যাপার্টমেণ্টে যেতে দেবেন?

মাইকেল।। বেশ তো চলুন। আমরা দরজার বাইরে দাঁড়াচ্ছি।

জোনস।। ধন্যবাদ।

দৃশ্যান্তর

টেলিফোন ডায়াল করার শব্দ।

লাইকা।। হ্যালো, লাইকা বলছি—

জোনস।। লাইকা, আমি জোনস। একটা খারাপ খবর আছে। মাইকেল আমাকে অ্যারেস্ট করতে ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসেছে।

লাইকা।। (কাঁদো কাঁদো) সে কী? এখন তাহলে কী হবে?

জোনস।। জানি না ভাগ্যে কী আছে? আমার মানসম্মান সব গেল! তুমি আমার অ্যাডভোকেটের সঙ্গে এক্ষুনি যোগাযোগ করো।

লাইকা।। আচ্ছা।

জোনস।। তুমি চেনো তো? মিঃ টমসন?

লাইকা।। চিনি।

জোনস।। টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে নম্বর পেয়ে যাবে।

লাইকা।। তা করছি। কিন্তু ভয়ে যে আমার হাত-পা সিঁটিয়ে যাচ্ছে জোনস, যদি তোমার কিছু হয়?

জোনস।। ও সব ভেবে আর লাভ নেই। পারলে একবার থানায় এসো।

লাইকা।। ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি রওনা দিচ্ছি।

দৃশ্যান্তর

টাইপরাইটারের শব্দ।

মরিয়ম।। আসতে পারি?

মাইকেল।। কে আপনি?

মরিয়ম।। আমি মিসেস মরিয়ম। হেনরির মা।

মাইকেল।। ও আসুন। বসুন।

মরিয়ম।। ধন্যবাদ।

মাইকেল।। দেখুন ম্যাডাম, এখনো হেনরির খুনের ব্যাপারে খুব একটা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে চেষ্টা চলছে।

মরিয়ম।। আমি আপনার কাছে আজ একটু অন্য কারণে এসেছি।

মাইকেল।। বলুন?

মরিয়ম।। মেরিনাকে কে খুন করেছে আপনি জানেন?

মাইকেল।। হ্যাঁ, মার্টিন জোনস। খুনের সব রকম প্রমাণই আমাদের হাতে এসেছে।

মরিয়ম।। আর আমার ছেলের খুনী?

মাইকেল।। এখনও ধরা পড়েনি, তবে খুব শিগগিরই ধরতে পারবো আশা করছি।

মরিয়ম।। না, তাকে আপনারা কোনোদিনই ধরতে পারবেন না, যেমন পারেন নি ওই মেরিনার খুনীকে।

মাইকেল।। ভুল করছেন ম্যাডাম। খুনী মার্টিন জোনস এখন হাজতে, আর খুনের সমস্ত প্রমাণ আমার এই ফাইলে।

মরিয়ম।। এ খবর আমি দৈনিক কাগজে পড়েই এখানে এসেছি। আপনারা ভুল

করছেন, মার্টিন সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

মাইকেল।। তার মানে?

মরিয়ম।। খুব সোজা। মেরিনা আর হেনরিকে যে আমিই খুন করেছি!

মাইকেল।। আপনি?

মরিয়ম।। হ্যাঁ, আমি।

মাইকেল।। তাহলে এতদিন সে কথা জানাননি কেন?

মরিয়ম।। মানুষ তো নিজেকে খুব ভালোবাসে— হয়তো আমিও তাই নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছিলাম? কিন্তু যখন দেখলাম একজন সম্পূর্ণ নিরপরাধ মানুষ শাস্তি পেতে চলেছে, তখন বিবেকের তাড়নায় আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি দয়া করে আমাকে গ্রেপ্তার করুন।

মাইকেল।। কিন্তু আমার কাছে যে সব কিছু অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ম্যাডাম?

মরিয়ম।। খুব স্বাভাবিক। এ সব আমার কাছেও একদিন অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু যা অনিবার্য তা তো ঘটেই গেল! সেই গল্পটাই আজ আপনাকে শোনাবো বলে এসেছি।

বিদেশি সুরে আবহ।

॥ পূ র্ব ক থা ॥

মরিয়ম।। এ তুমি কী বলছ লাইকা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না?

লাইকা।। আপনাকে আমার মিথ্যে বলে লাভ কী মরিয়ম? একটি ডাইনির খপ্পরে পড়েছে হেনরি? মেরিনা একটা রাক্ষুসী।

মরিয়ম।। তুমি এর প্রমাণ দিতে পারো?

লাইকা।। আপনি এখুনি মেরিনার ফ্ল্যাটে যান, ওখানেই হেনরিকে পাবেন। আমি বসে আছি। (একটুকাল উত্তেজক মিউজিক বাজবে) কী হলো প্রমাণ পেলেন?

মরিয়ম।। ছি ছি, এ আমি কী দৃশ্য দেখলাম! ছিঃ!!

লাইকা।। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, মরিয়ম। আমি হেনরির ভালো চাই বলেই আপনাকে জানালাম।

মরিয়ম।। আচ্ছা, এখন বোধহয় মেরিনার কাছে যাওয়া আমার উচিত হবে না?

লাইকা।। না। উল্টে আপনি অপমানিত হবেন। ও ব্যাভিচারী মেয়েমানুষ। একজন পুরুষে ওদের খিদে মেটে না। মার্টিন, যোসেফ, আরো কত জনের যে মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে তার অন্ত নেই। চলি।

॥ পূ র্ব ক থা শে ষ ॥

মাইকেল।। তারপর?

মরিয়ম।। তার দুদিন পরে হেনরির স্কুলের হেডমাস্টারমশাই আমাকে টেলিফোন করে জানালেন, ও যা পড়াশুনো করছে তাতে ক্লাস প্রমোশন পাবে না। তাছাড়া ক্লাসও ঠিকমতো করে না, স্কুলের পাঁচিল টপকে পালিয়ে যায়। শুনে তো আমার মাথায় আগুন জ্বলতে লাগলো। বাড়ি ফিরে হেনরিকে বললাম ঃ

॥ পূ র্ব ক থা ॥

মরিয়ম।। শোন হেনরি, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

হেনরি।। আমার সময় নেই। কাল বোলো। এখন পড়তে যাচ্ছি।

মরিয়ম।। দাঁড়া, হাফ ইয়ারলি ক্লোজিংয়ের প্রোগ্রেস রিপোর্ট কোথায়?

হেনরি।। স্কুলে জমা দিয়েছি।

মরিয়ম।। কে সই করেছে?

হেনরি।। আমি।

মরিয়ম।। এত পুয়োর মার্কস, যে আমাকে দেখাতে সাহস হয়নি?

হেনরি।। কে বলেছে?

মরিয়ম।। তোর স্কুলের হেডমাস্টারমশাই।

হেনরি।। রাবিশ।

॥ পূ র্ব ক থা শে ষ ॥

মরিয়ম।। দিনে দিনে এমনিই উদ্ধত হয়ে উঠছিল ওর কথাবার্তা আচার-আচরণ। এর দু-একদিন পরে— শেষ রাতে ওর ঘর থেকে কান্নার শব্দ পেয়ে গিয়ে দেখি, ও যন্ত্রণায় ছটফট করছে। গায়ে ধুম জ্বর। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকলাম। ডাক্তার তো পরীক্ষা করে খুব গম্ভীর হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখে যা শুনলাম, তাতে তো ভয়ে, ঘেন্নায় আমি কাঁটা হয়ে গেছি।

মাইকেল।। কী বললো ডাক্তার?

মরিয়ম।। বললো হেনরির খুব খারাপ ধরনের রোগ হয়েছে। সিফিলিস। এরপর থেকে খুব সংযত জীবনযাপন না করলে, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

মাইকেল।। সে কী? তারপর?

মরিয়ম।। চিকিৎসা চলতে লাগলো, কিন্তু ওকে শোধরাতে পারলাম না। একদিন হঠাৎই উধাও হয়ে গেল। খবর নিয়ে জানলাম, মেরিনাও নেই, বাপের বাড়ি গিয়েছে। জর্জের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আমিও আন্দাজে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

মাইকেল।। দেখা পেলেন?

মরিয়ম।। হ্যাঁ। আরও কালো হয়ে গেছে হেনরি। রোগের চিহ্ন যেন আরও ফুটে বেরিয়েছে। ওকে ছুঁতে ঘেন্না করছিল আমার। কিন্তু উপায় কী? ফিরে আসতে বললাম। এলো না। উল্টে মেরিনাই আমাকে ঠেস দিয়ে দশ কথা শুনিয়ে দিল। ফিরে এলাম একা। কিন্তু তখনই আমি মনে মনে ঠিক করলাম, ওই মেরিনাকে খুন করবো। তাতে আমার ফাঁসী হয় হোক, ছেলেটা তো বাঁচবে।

মাইকেল।। কফি খাবেন, ম্যাডাম?

মরিয়ম।। খেলে মন্দ হয় না। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

ডোর বেল বাজে।

মাইকেল।। দুটো কফি আনো। ... হ্যাঁ তারপর বলুন।

মরিয়ম।। তারপর থেকে সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। আমার স্বামীর একটা পুরোনো পিস্তল ছিল, সেটা খুঁজে বের করলাম। সেটা আর একজোড়া হাতমোজা সব সময়ে আমার ব্যাগে রেখে দিতাম। একদিন সেই সুযোগ এলো। অফিস থেকে ফিরে চুপি চুপি মেরিনার ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি ও ঘুমোচ্ছে। পাশের ঘরে দেখলাম একটা পিস্তল পড়ে আছে। হাতে গ্লাভস পরে ওই পড়ে থাকা পিস্তলটা দিয়ে দুটো গুলি করে, আবার সেটা যথাস্থানে রেখেই পালিয়ে এলাম। সাইলেন্সার লাগানো ছিল বলে লাইকাও টের পেলো না।

মাইকেল।। নিন, কফি খান। আমিও বরং ততক্ষণ টেপ রেকর্ডারের ক্যাসেটটা বদলে নিই। বুঝতেই পারছেন, আপনার এই এজাহার কোর্টে প্রডিউস করতে হবে। ... হ্যাঁ, নিন বলুন।

মরিয়ম।। এর পরের খবর আরও সাংঘাতিক।

মাইকেল।। কী রকম?

মরিয়ম।। আমার এক পুরোনো বন্ধু ছিল মিঃ প্যাটারসন— আমার চেয়ে কিছু বড়ো। বিপত্নীক। আমাকে কয়েকবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু আমি রাজি হইনি। তাতে অবশ্য আমাদের বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি। একদিন ছুটির সকালে সে আমার ফ্ল্যাটে এল...

॥ পূর্বকথা ॥

প্যাটারসন।। কেমন আছ, মরিয়ম?

মরিয়ম।। চলে যাচ্ছে। তুমি কিন্তু অনেকদিন পরে এলে প্যাটারসন! এসো।

প্যাটারসন।। হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম।

মরিয়ম।। তোমার সব কথা নিশ্চয়ই শুনবো। ব্যস্ত কী? তবে এসেছ যখন, আজ লাঞ্চ না খাইয়ে ছাড়ছি না।

প্যাটারসন।। খাওয়া আর একদিন হবে মরিয়ম। আমি তোমাকে যা বলতে এসেছি... আশা করি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

মরিয়ম।। না না, নিশ্চয়ই না। কথা দিলাম।

প্যাটারসন।। (দ্বিধাগ্রস্ত) দ্যাখো মরিয়ম, কথাটা বলতে আমার জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে–

মরিয়ম।। তবু বলো, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।

প্যাটারসন।। ইদানীং অফিস থেকে ফিরতে আমার একটু রাত হচ্ছিল। যে রাস্তা দিয়ে আমাকে ফিরতে হয়, তার পরের রাস্তাটাই কোবাল স্ট্রিট, যেখানে কয়েকটা বড়ো নিষিদ্ধপল্লি আছে।

মরিয়ম।। তাতে কী?

প্যাটারসন।। ...একদিন দেখি ওই বাড়ি থেকে হেনরি বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে একটি ছোকরা।

মরিয়ম।। সে কী?

প্যাটারসন।। প্রথমে ভাবলাম ভুল দেখেছি, কিন্তু তার পরদিনই আবার দেখলাম। আমি গাড়ি থামিয়ে বারবার দেখেছি, তারপর শিওর হয়ে তোমাকে জানাতে এলাম।

মরিয়ম।। কী পোশাক ছিল ওর পরনে?

প্যাটারসন।। জিন্সের একটা ঘসা প্যাণ্ট আর লাল পুলোভার।

মরিয়ম।। (কেঁদে ফেলে) তুমিই বলো প্যাটারসন, এ ছেলেকে নিয়ে আমি এখন কী করি? ও আমার হাতের বাইরে চলে গেছে!

॥ পূর্বকথা শেষ ॥

মাইকেল।। এ তো ভয়ংকর খবর?

মরিয়ম।। হ্যাঁ, সেদিনই সন্ধেবেলা আমি ওর পিছু নিলাম। দেখলাম প্যাটারসনের কথাই ঠিক। ও ঠিক সেই নিষিদ্ধপল্লির বাড়িতে ঢুকে পড়লো। মনে মনে ঠিক করলাম, এ বিষবৃক্ষের চারা আমি উপড়ে ফেলবোই, তাতে যা হয় হোক।

মাইকেল।। আপনার তখনকার মনের অবস্থা কিছুটা অনুমান করতে পারছি।

মরিয়ম।। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি এলো। আমি কিছু দূরে এক অন্ধকার কোনায় গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পথে জনপ্রাণী নেই। সময় যেন আর কাটতেই চায়না। হঠাৎ একসময়ে দেখলাম, ও একা ভিজতে ভিজতে বেরিয়ে আসছে বাড়ি থেকে। স্বামীর পিস্তলটা আমার ব্যাগেই রাখা থাকতো। নাগালের মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি...

পরপর দুটি গুলির শব্দ। একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল।

দৃশ্যান্তর

টেলিফোন বাজছে।

মহিলা।। কে?

মাইকেল।। আমি মাইকেল হোবার্ট বলছি।

মহিলা।। আপনার সঙ্গে আমাদের আর কোনো কথা নেই।

মাইকেল।। আমাদের যে ভুল হয়েছে সেটা আপনার মেয়েকে জানাতে চাই। মার্টিন খুনী নয়।

মহিলা।। সত্যি বলছেন? এক মিনিট ধরুন, প্লিজ।

লাইকা।। হ্যালো, আপনি ঠিক বলছেন অফিসার, মার্টিন নির্দোষ?

মাইকেল।। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নির্দোষ।

লাইকা।। তাহলে আসল অপরাধী কে?

মাইকেল।। থানায় আসুন, সব জানতে পারবেন। আপনারা সুখী হোন লাইকা।

লাইকা।। (গলা ধরে আসে) ধন্যবাদ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অফিসার, অনেক অনেক ধন্যবাদ...

বিদেশি আবহসংগীতে আনন্দপরিবেশ।

অ ভি ন য়াং শে

রণজিৎ মুখোপাধ্যায়, মানস মিশ্র, অপরূপ চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম মজুমদার, সুনীল চ্যাটার্জী, শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ আচার্য, ছন্দা করিঞ্জ চট্টোপাধ্যায়, বিদিশা বসু, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রযোজনা / বিশ্বনাথ দাস

আকাশবানী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত

না

অনন্ত. কালীনাথ. পৃথ্বীশ. সিধু ঘটক. উকিল. রাসবিহারী. বিচারক. ব্রজরানি.
মীনা. মীনার মা. অনন্তর মা. ব্রজরানির মা. ঠাকুমা. হর-র মা।

আবহসংগীতে সকালের পরিবেশ। পাখপাখালির ডাক। একটা গরুর গাড়ি চলে যাচ্ছে। দূরে কোথায় মেঠো সুরে বাঁশী বাজে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

কালীনাথ।। (ঘুম জড়ানো গলায়) কে? (উত্তরে আবার কড়া নড়ে) কে—? (আবার শব্দ। কালীনাথ বিরক্ত) আঃ! (হাই তোলে। আড়মোড়া ভাঙে। আবার কড়া নড়ে) যাচ্ছি যাচ্ছি! (দরজা খোলার শব্দ) ঠিক ধরেছি— অনু! নইলে এই সাত-ভোরে অমন করে আমাকে জ্বালাবে কে? আয়। ভিতরে আয়।

দরজা বন্ধ হয়।

অনন্ত।। এখন আর সাত-ভোর নেই কালীদা, প্রায় আট-ভোর। আশ্চর্য! এত বেলা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমোও কী করে বলো দেখি?

কালীনাথ।। আর তুই-ই বা রাত না পোহাতে জাগিস কী করে বল তো? কাল রাত তিনটে পর্যন্ত পড়াশুনো করেছি, জানিস? টলস্টয়ের এই লেখাটা— আহ্!

অনন্ত।। (নিরুৎসাহ) কী লাভ এত পড়াশুনো করে?

কালীনাথ।। তুই যে এত শরীরচর্চা করিস, কী লাভ?

অনন্ত।। বাঃ! ওতে শরীর ভালো থাকে? মনে ফুর্তি আসে?

কালীনাথ।। পড়াশুনো করলেও মন ভালো থাকে। ব্রেন তাজা থাকে, আত্মবিশ্বাস বাড়ে। তোর চেয়ে আমার মনে ফুর্তি কি কিছু কম? তাইতো বলি, তুইও পড়াশুনো কর না?

অনন্ত।। এই বয়েসে?

কালীনাথ।। পড়াশুনোর আবার বয়েস কী রে? দেখবি, মনে কত আনন্দ পাস!

অনন্ত।। কী রকম আনন্দ? আমার এই বন্দুক চালানোর চেয়েও বেশি?

কালীনাথ।। (হতাশ) অসম্ভব। তোর সঙ্গে লেখাপড়া নিয়ে কথা বলা আর ব্যানা-বনে মুক্তো ছড়ানো একই।

অনন্ত।। হা হা— ধরেছ ঠিক। এবার ওঠো।

কালীনাথ।। দাঁড়া, ঘুম থেকে উঠলাম, একটু চা বানাই?

অনন্ত।। সময় নেই কালীদা। স্টেশনের স্টলে খেয়ে নেবো। ... ইশ, এত নোংরার মধ্যে বাস করো কী করে বলো তো? চারদিকে সিগারেটের টুকরো, ছাই! জামাকাপড়, বই সব ছড়ানো-ছিটানো....

কালীনাথ।। কী করবো বল? আমার তো আর তোদের বাড়ির মতো দশটা দাসদাসী নেই, যে সময়ে ঝকঝকে-তকতকে করে রাখবে? একলা মানুষ, যখন যেমন পারি, সাফসুতরো করি। কে আর দেখছে?

অনন্ত।। বুঝলাম। ঘরনি না হলে তোমার আর চলছে না।

কালীনাথ।। বকিসনি। তা বন্দুক ঘাড়ে চললি কোথায় এখন? পাখি মারবি?

অনন্ত।। না গো, পাখি না, একটা পাগলা কুকুর মারতে হবে।

কালীনাথ।। সেকি?

অনন্ত।। হ্যাঁ। কাল বামুনপাড়া থেকে এসেছিল— একটা কুকুর নাকি খেপেছে? সাত-আটজন মানুষকে কামড়েছে, তিনটে গরু!

কালীনাথ।। বলিস কী? পাগলা—

অনন্ত।। ভয় কী? আমি তো আছি।

কালীনাথ।। হ্যাঁ, সেটুকুই যা ভরসা।

অনন্ত।। এত ভয় কেন কালীদা? অদৃষ্টে যদি মরণ লেখা থাকে—

কালীনাথ।। বকিসনে। ওসব অদৃষ্টফদৃষ্ট আমি মানি না। আরে, ঈশ্বরই মানি না তায় অদৃষ্ট!

অনন্ত।। কেন মানো না?

কালীনাথ।। বই পড়, তুইও মানবি না। পাপপুণ্য, স্বর্গনরক ঈশ্বরফিশ্বর সব বাজে, বোগাস, ধাপ্পা। তোর মাথা থেকেও যদি এই ভূতগুলো নামতো— কী ফাইন যে হতো—'

অনন্ত।। কী ফাইন? পাখি শিকার?

কালীনাথ।। নিশ্চয়ই। নিত্যিনতুন পক্ষীমাংস সহযোগে ভোজন। ক্যা বাত!

অনন্ত। পাপ হবে বলে পাখি মারি না, তা নয় কালীদা— পাখি মারতে আমার মায়া লাগে। বাঘ মারো, ভালুক মারো, দুর্দান্ত সব জানোয়ার মারো, তবে না মরদ!

কালীনাথ।। অবিশ্যি ব্যায়ামট্যায়াম করে যা শরীরখানা বানিয়েছিস, তুই শুধু মরদ নয় এক্কেবারে দত্যিদানো—

অনন্ত।। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।

কালীনাথ। ঘোড়ার ডিম। নায়মাত্মা বুদ্ধিহীনেন লভ্য। চল— তবে প্রবল বীর্যে তোর সারমেয় শিকার করে আসি।

অনন্ত।। চলো। কুকুরটা নেহাত পাগলা হয়েছে তাই— নইলে এতে আনন্দ নেই, সত্যি।

দৃশ্যান্তর

ঘটক।। (দূর থেকে ডাকতে ডাকতে আসে) স্যার— স্যার— শুনছেন স্যার?

অনন্ত।। আমাদের বলছেন?

ঘটক।। করেক্ট স্যার, টু দি পয়েন্ট। নমস্কার স্যার।

অনন্ত।। নমস্কার। বলুন।

অনন্ত।। বলছিলাম, ওই যে দূরে বিশাল বাড়িটা— ওই যে শাদা চিলেকোঠা দেখা যাচ্ছে— ওটা কার বাড়ি জানেন স্যার?

কালীনাথ।। মহাশয়ের নিবাস কোথায়?

ঘটক।। আমার? কলকাতায় স্যার।

কালীনাথ।। হুম্। তা এ অঞ্চলে আগমনের কারণ? জ্যোতিষবিদ্যা নাকি ভগিনীদায়? গলায় যখন কাছা নেই তখন পিতৃমাতৃদায় যে নয় তা বুঝতে পেরেছি—

ঘটক।। হেঁ হেঁ, টু দি পয়েন্ট স্যার। আপনার আইডিয়া অর্জুনের মতো লক্ষভেদ করেছে। ধরেছেন ঠিক স্যার। ভগিনীদায় বটে, তবে আমার নয়, পরের।

কালীনাথ।। আচ্ছা?

ঘটক।। আপনি তাহলে হলেন গিয়ে কালীনাথবাবু আর উনি অনন্তবাবু। ঠিক?

কালীনাথ।। হেঁ হেঁ, এক্কেবারে টু দি পয়েন্ট।

অনন্ত।। আমাদের চিনলেন কী করে?

কালীনাথ।। বুঝলি না? উনি হলেন গিয়ে অন্তর্যামী চিন্তাহরণ ঘটক, অনু— পরের কন্যা-ভগিনীদায়ের চিন্তাহরণে বিভোর। ঠিক?

ঘটক।। টু দি পয়েণ্ট স্যার। তবে চিন্তাহরণ নয়, আমার নাম সিদ্ধেশ্বর, মানে সিধু ঘটক।

কালীনাথ।। বাঃ, নামের মধ্যেই তো সিদ্ধিলাভের কথাটা রয়ে গেছে দেখছি!

ঘটক।। টু দি পয়েণ্ট স্যার। আমার কোনো কেসই আজ পর্যন্ত ফেল করেনি।

অনন্ত।। আমাদের চিনলেন কী করে?

কালীনাথ।। বাতুল প্রশ্ন। ভোরে স্টেশনে নেমেই আমাদের বিবরণটি সংগ্রহ করে ফেলেছেন— একজন বন্দুক কাঁধে লম্বাচওড়া আর সঙ্গে আর একজন নেহাতই নিরীহ গোবেচারা ধরণের— ঠিক?

ঘটক।। টু দি পয়েণ্ট স্যার।

কালীনাথ।। তাহলে অনন্ত, স্বয়ং সিধু ঘটক যখন একবার ভর করেছে, বিবাহ তোমার অনিবার্য। বিঘ্নরাজের বাপের সাধ্যি নেই তাকে ঠেকাতে পারে।

ঘটক।। আমি স্যার, দুজনের সম্বন্ধই এনেছি।

অনন্ত।। কালীদার কিন্তু ইংরেজি লেখাপড়া জানা মেয়ে চাই। পুরোপুরি মডার্ন।

ঘটক।। টু দি পয়েণ্ট মিলিয়ে নেবেন স্যার। বাজিয়ে দেখবেন— টং করে বেজে উঠবে রানিমার্কা চাঁদির টাকার মতো।

কালীনাথ।। তাহলে আর কী? চলে যান কর্তার কাছে। জোড়া উচ্ছুগ্য হয়ে যাক!

ঘটক।। সে তো যেতেই হবে। আপনার গার্জেনও যে ওই মামা, সে সব তো জানি। টু দি পয়েণ্ট খবর নিয়েই তো এসেছি স্যার। আপনি এম. এ. পাস, বি.এ.তে অনার্স। আর অনন্তবাবু নিজের হাতে দুটো বাঘ মেরেছেন। শিকারি। ফুটবল চ্যাম্পিয়ান। সবই টু দি পয়েণ্ট জানি স্যার। আচ্ছা নমস্কার।

গাড়োয়ান তাড়া দিতে দিতে একটা গরুর গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

কালীনাথ।। অনু—

অনন্ত।। বলো।

কালীনাথ।। সিধু ঘটক যখন আসরে নেমেছে তখন টু দি পয়েণ্টে জোড় না মিলিয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় না। ওর অনারে তো আজ তাহলে কিছু করতে হয়?

অনন্ত।। কী করবে?

কালীনাথ।। তোর বন্দুকটা দে তো?

অনন্ত।। এই নাও।

কালীনাথ।। উইনচেস্টার রিপিটার। চমৎকার নাম তোর বন্দুকটার।
অনন্ত।। কাজেও চমৎকার। বাঘ দুটো এই বন্দুক দিয়েই মেরেছিলাম।
কালীনাথ।। কুকুর মারবি বলছিলি না? ওই তো একটা কুকুর।
অনন্ত।। ওটা তো সেই পাগলাটা নয়?
কালীনাথ।। নাই বা হল। কুকুর তো? (গুলির শব্দ। কুকুরের আর্তনাদ) ব্যাস— বাঁচিয়ে দিলাম। হয়ে গেল কুকুর মারা।
অনন্ত।। ছিঃ! মিছিমিছি নিরীহ কুকুরটাকে মেরে ফেললে কালীদা?
কালীনাথ।। কুকুর কুকুরই। ভবিষ্যতে পাগলা হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলাম।
অনন্ত।। কালীদা, আমি মুখ্যুমানুষ, তুমি বিদ্যান, পণ্ডিত। কিন্তু তুমি এত নিষ্ঠুর কেন বুঝতে পারি না। দয়া নেই, মায়া নেই—
কালীনাথ।। (হাসে) ও সব ছেঁদো মায়া-মমতা আমি জয় করেছি রে অনু, নইলে লেখাপড়া শিখলাম কেন? মিথ্যে মায়া দেখিয়ে কী লাভ? বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, কনে দেখতে যাবো— তাই একটু সেলিব্রেট করলাম। হা হা হা...

প্রচণ্ড শব্দ করতে একটা ট্রেন পেরিয়ে গেল।

দৃশ্যান্তর

অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ডাক ছাপিয়ে পৃথ্বীশবাবুর গলা শোনা গেল।

পৃথ্বীশ।। বেয়ারা— বেয়ারা। কে আছিস, কুকুরটাকে ভিতরে নিয়ে যা। ঘটক এসেছে, ভয়ে ঢুকতে পারছে না। (কুকুরের শব্দ দূরে চলে যায়) আরে এসো এসো, সিধু এসো। আর ভয় নেই।
ঘটক।। ভেরি ফিয়ার্স ডগ স্যার, একেবারে বুকে পা দিয়ে দাঁড়ায়। প্রথম দিন আমি তো গ্রাউণ্ড ফল— মানে, ধরাশায়ী। ভাগ্যে মা লক্ষ্মী ছিলেন— নইলে তো একেবারে কাট থ্রোট! হার্টের প্যালপিটিশন কমতে আমার একঘণ্টা লেগেছিল...
পৃথ্বীশ।। (মৃদু হাসে) ঠিক আছে, বসো। বলো, কী যুদ্ধজয় করে এলে?
ঘটক।। ভিকট্রি স্যার— একেবারে টু দি পয়েন্ট। বাড়ি ঘর অতি চমৎকার। তা বলে কি আর আপনাদের মতো?
পৃথ্বীশ।। সে রকম তো আমি চাইনি সিধু? আমি চাই মধ্যবিত্ত ঘর। সচ্চরিত্র ছেলে, পড়াশুনায় অনুরাগ থাকবে— দুজনে মিলে আদর্শজীবন গড়ে তুলবে।

ঘটক।। সে সব টু দি পয়েন্ট মিলে যাবে স্যার।

পৃথ্বীশ।। ছেলের কিন্তু য়্যারিস্ট্রোকেটিক ম্যানার্স চাই। উচ্চবংশের সহবত—

ঘটক।। সেও আপনি ফ্র্যাকশানে ফ্র্যাকশানে মিলিয়ে নেবেন স্যার। বিরাট বড়োবাড়ির ভাগ্নে। সে বাড়িতেই মানুষ। কথাবার্তা যেন খাপখোলা তলোয়ার। ঝকমক করছে। এম. এ. পাশ। বি. এ.তে অনার্স। আসছে সপ্তাহের বুধবারেই ওঁরা মেয়ে দেখতে আসছেন স্যার।

পৃথ্বীশ।। ওঁরা মানে? কে কে? কজন?

ঘটক।। দুজন স্যার। ছেলের দুই পিসতুতো ভাই। একজন তো আবার ভাইও বটে, বন্ধুত্বও বটে। হরিহর আত্মা। মতে, রুচিতে পয়েণ্টে পয়েণ্টে মিল।

পৃথ্বীশ।। কিন্তু আমি তো চেয়েছিলাম, ছেলেমেয়ে দুজন দুজনকে দেখুক।

ঘটক।। এই পয়েন্টটা কিছুতেই মেলাতে পারলাম না স্যার। মামা তো সাবেকি জমিদার? বললেন, আমি বেঁচে থাকতে ও সব হবে না। তবে ভাববেন না স্যার, কদিন পরে আমি ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেবো।

পৃথ্বীশ।। ঠিক আছে, তুমি আপাতত বিশ্রাম করো, আমাকে আবার একটু বেরোতে হবে। ওবেলা তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে—

ঘটক।। বিশ্রাম কী বলছেন স্যার? আমার তো এখন শিরেসংক্রান্তি। হাতে আর আধ ঘণ্টা সময়। ট্রেন ধরতে হবে—

পৃথ্বীশ।। সে কী?

ঘটক।। আজ্ঞে হ্যাঁ, বর্ধমান যাবো। সেখানকার নামজাদা উকিল হরদাসবাবুর বাড়ি। ভদ্রলোকের ভগ্নীদায়। তা এই জমিদারবাবুর ছোটোছেলের সম্বন্ধ ওখানেই করেছি। ওঁরা সব আজ বিকেলে আবার মেয়ে দেখতে যাবেন। ওটা সেরে বুধবার আবার এখানে আসছি। ভাববেন না স্যার, সব যদি পয়েণ্টে পয়েণ্টে মিলিয়ে না দিই, আমার নাম সিধু ঘটকই নয়। নমস্কার।

পুরোনো গ্র্যাণ্ড ক্লকে এগারোটা বাজলো।

পৃথ্বীশ।। মীনা— মীনা—

মীনা।। ডাকছিলে বাবা?

পৃথ্বীশ।। কী করছিলি?

মীনা।। লাইব্রেরিটা গোছাচ্ছিলাম।

পৃথ্বীশ।। তোর নতুন বইগুলো এসে গেছে।

মীনা।। (উল্লসিত) সত্যি? সবগুলো? রবীন্দ্ররচনাবলীর যে খণ্ডগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না? তারপর— নতুন যুগের নারীর প্রশ্ন?

পৃথ্বীশ।। সবই এসেছে। তবে সঙ্গে আরো তিনখানা বেশি।

মীনা।। কী বই বাবা?

পৃথ্বীশ।। পাকপ্রণালী, গৃহস্থালী আর পরিচর্যা।

মীনা।। (হাসে) তুমি যেন কী বাবা, এসব বই দিয়ে কী হবে?

পৃথ্বীশ।। সবই তো জানা দরকার মা। জীবনের কত রূপ, কত রস, কত রঙ! সবই তো জানতে-বুঝতে হয় মা। রাউণ্ডনেস চাই না? যাও— বইগুলো নিয়ে যাও।

দৃশ্যান্তর

স্টেশনের পরিবেশ। ট্রেনের ঘণ্টা বাজে।

কালীনাথ।। শোন অনু, এক্ষুনি ট্রেন এসে যাবে, খাতাটা ভালো করে পড়ে নে। সব পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছি, ট্রেনে মুখস্থ করে নিবি। ঠিকঠাক জিগ্যেস করবি সব কিছু।

অনন্ত।। মেয়ে দেখতে গেলে যে এমন করে প্রশ্নপত্র মুখস্থ করে যেতে হয়— বাপের জন্মে শুনিনি বাবা!

কালীনাথ।। কী করবো বল? কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। তোর জন্যে মেয়ে আমি দেখবো, আমার জন্যে তুই। এছাড়া আর বাজিয়ে দেখার উপায় কী?

অনন্ত।। তোমার বাজনাগুলো কিন্তু বড়ো শক্ত কালীদা। উচ্চারণ করতে আমারই তো দাঁতভাঙার যোগাড়। আচ্ছা, এটা কী লিখেছ বলো তো? দস্তয়ভিসকি?

কালীনাথ।। (হাসে) দস্তয় নয়, দস্তয়ভিস্‌কি। একজন বড়ো রাশিয়ান লেখক।

অনন্ত।। বাপরে! ওর চেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলা সোজা। বিয়ে করে তুমি মাস্টার আনবে, না বউ আনবে বলো তো? আমি বরং শুকতো-টুকতো রাঁধতে জানে কিনা জিগ্যেস করে আসবো।

কালীনাথ।। আচ্ছা, ওটা না হোক, মোপাসাঁটা তো মনে থাকবে? জিগ্যেস করবি, মোপাসাঁর কী পড়েছেন? কোন গল্পটা সবচেয়ে ভালো লাগে— 'নেকলেস' না 'বল অফ ফ্যাট'? ও দুটোর বাংলা অনুবাদ তো তোকে শুনিয়েছি?

অনন্ত।। কেন, বঙ্কিমবাবু, শরৎবাবু কতটা পড়েছে জিগ্যেস করলে হতো না?

কালীনাথ।। না। জিগ্যেস করবি, এলিয়ট বড়ো কবি না রবীন্দ্রনাথ। এবং কেন?

সব লিখে দিয়েছি খাতায়, মন দিয়ে পড়তে পড়তে যা।

দূরে ট্রেনের শব্দ।

অনন্ত।। ওই যে ট্রেন আসছে—

ঘটক।। (দূর থেকে) এদিকে আসুন অনন্তবাবু— এক কামরায় উঠবো সবাই।

কালীনাথ।। চল, তোকে তুলে দিই। তোর উপরেই কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ জীবন অনু, ডোণ্ট ফরগেট ব্রাদার।

অনন্ত।। (হাসে) তথাস্তু।

স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়ানোর শব্দ।

দৃশ্যান্তর

অ্যালসেশিয়ান ডাকছে। বিরক্ত পৃথ্বীশবাবু ধমক দিলেন।

পৃথ্বীশ।। এ্যাই চুপ চুপ! এই রামলাল, ওটাকে ভিতরে নিয়ে যা তো— (কুকুরের ডাক দূরে সরে যেতে থাকে) এসো সিধু, এসো— বসো।

ঘটক।। আজ্ঞে এই যে বসি। (গড়গড়া টানার শব্দ) তাহলে স্যার, সব কিছু টু দি পয়েন্টে ঠিকঠাক মিলিয়ে দিয়েছি?

পৃথ্বীশ।। হ্যাঁ, সেটাই তো ভেবেছিলাম। কিন্তু মেলাতে আর পারলে কই?

ঘটক।। কেন স্যার। কোনো ত্রুটি হলো?

পৃথ্বীশ।। এই চিঠিটা পড়ো।

ঘটক।। চিঠি? কার?

পৃথ্বীশ।। পড়লেই বুঝতে পারবে।

কালীর গলা।। (কাগজের শব্দ) নমস্কারপূর্বক নিবেদনমিদং— মহাশয়, জনপরম্পরায় জ্ঞাত হইলাম যে, মহাশয় অত্র গ্রামের জমিদারবাটির ভাগিনেয় কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত নিজ কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন। মহাশয়দের বংশপরিচয় এবং খ্যাতি আমার সুবিদিত বলিয়া জানাইতেছি যে, কালীনাথ শিক্ষিত, অর্থাৎ এম. এ. পাশ করিলেও শিক্ষার কোনো গুণ তাহার মধ্যে নাই। নিতান্তই হাঘরে স্বভাব, ঘরের অবস্থাও হীন, চরিত্রের দিকও তাই। বাল্যকাল হইতেই চুরির অভ্যাস আছে। স্কুলে সহপাঠীদের বই চুরি করিত। এখনও বন্ধুদের কাছে টাকা ধার করিয়া পরিশোধ করে না। কোনো ধর্ম মানে

না। নাস্তিক। জ্ঞাতার্থে মহাশয়কে নিবেদন করিলাম। যাহা বিবেচনা হয় করিবেন। ইতি, জনৈক শুভার্থী।

গড়গড়া টানার শব্দ।

পৃথ্বীশ।। কী বুঝলে?

ঘটক।। সব বাজে স্যার, সব বাজে। ডাহা মিথ্যে।

পৃথ্বীশ।। তুমি বললেই তো আর সত্যিটা মিথ্যে হবে না? কী দায় লোকটার যে মিথ্যে চিঠি লিখবে?

ঘটক।। লেখে স্যার, লেখে। ভাংচি দিতে চাইলে অমন অনেক মিথ্যে চিঠি লেখে শত্তুরে। তাতে দায়-অদায় লাগে না। হরদাসবাবুর বাড়িতেও তো এমনি একটা চিঠি এসেছে। সেখানে তো পাওর আলাদা। তবে?

পৃথ্বীশ।। সে যাই হোক, সন্দেহ যখন মনে ঢুকেছে, এ বিয়ে আমি দেবো না।

ঘটক।। কী মুশকিল! নিজে একবার চলুন— পাত্র দেখে, এনকোয়ারি করে পয়েণ্টে পয়েণ্টে মিলিয়ে নেবেন?

পৃথ্বীশ।। না হে সিধু, কন্যাসন্তানের বিয়ে বলে কথা! মনে যখন খিঁচ ধরেছে, (গড়গড়া টানার শব্দ) তার চেয়ে বরং সেদিন যে ছেলেটি মীনাকে দেখতে এসেছিল— কী যেন নাম?

ঘটক।। অনন্ত, স্যার।

পৃথ্বীশ।। সুন্দর ছেলে। চোখজুড়োনো স্বাস্থ্য। ব্রেভ, স্ট্রং, ভদ্র, শুধু যা শুনলাম — লেখাপড়া করেনি—

ঘটক।। করেছে স্যার, করেছে। পাশ না করলে কী হবে? বাড়িতে পড়েছে। বুঝেছেন না, পাড়াগেঁয়ে জমিদারবাড়ি তো? সেকেলে ঢঙ। ইংরেজি, সংস্কৃত অনেক পড়েছে। কেমন বিনয়ী দেখলেন না? বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।

পৃথ্বীশ।। তা হতেও পারে, বিচিত্র নয়। মীনাকে যা সব প্রশ্ন করছিল, আমি তো অবাক। মোপাসাঁর নাম করলে, এলিয়টের কথা জিগ্যেস করলে—

ঘটক।। তবে? আমার কথা পয়েণ্টে পয়েণ্টে মিলিয়ে নেবেন স্যার। ওই চিঠিখানা একবার অনন্তবাবুর বাবার কাছে পাঠিয়ে দেখুন না কী হয়।

পৃথ্বীশ।। না হে। যে লিখেছে সে বিপদে পড়বে। তাঁরা সেখানকার জমিদার। ... আচ্ছা, তার চেয়ে যদি অনন্তর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করি?

ঘটক।। সে তো আরও ভালো হয় স্যার। খুব ভালো হবে। বড়ো দিঘির মাছ বড়ো দিঘিতে গিয়েই পড়বে। সত্যি বলতে কি স্যার, কালীনাথের যা অবস্থা, এদের বা আপনাদের তুলনায় তো দিঘির কাছে গোস্পদ। টু

দি পয়েন্টে মিলে যাবে স্যার।

গড়গড়া টানার শব্দ।

পৃথ্বীশ।। তাহলে সেটাই করো সিধু। আমি ছেলে দেখেছি, ছেলেমেয়েও পরস্পরকে দেখেছে। পাত্রপক্ষের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সেই আয়োজনই করো।

ঘটক।। (অবাক) আপত্তি কী বলছেন স্যার? বর্তে যাবে। আমি বলবো, একপক্ষে এটা ভালোই হলো। এভাবে একেবারে ফ্র্যাকশনে ফ্র্যাকশনে মিলে গেল-- হেঁ হেঁ হেঁ...

সানাইয়ে বসন্তবাহারের সুর তীব্র হয়ে ওঠে।

দৃশ্যান্তর

দূর থেকে নারী কণ্ঠে 'সুন্দর মম গৃহে আজি...' রবীন্দ্রসংগীত ভেসে আসছে।

কালীনাথ।। ওঃ কী চমৎকার গান গায় রে তোর বউ, অনু! আর দেখতেও তেমনি, যেন একমুঠো প্রিমরোজ! তুই কিন্তু জিতে গেলি ভাই।

অনন্ত।। তাই?

কালীনাথ।। ভাবছি, তোকে যদি দেখতে না পাঠাতাম--

অনন্ত।। কী বলছ কালীদা? বৌদিকেও তো দেখলাম, একরাশ টাটকা পদ্মফুলের মতো বসে আছেন। কথা নেই শুধু মিষ্টি গন্ধ! উনি স্বর্গের দেবী কালীদা, ওঁকে পেয়েছো তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। তুমি যদি নিজেকে...

কালীনাথ।। দূর পাগলা, আমি ঠাট্টা করছিলাম। আমি সুখী হয়েছি রে অনু, সত্যিই সুখী হয়েছি।

সানাইয়ের সুর তীব্র হয়ে ওঠে।

দৃশ্যান্তর

ঠাকুমা।। এই নাও ভাই মহাবীর অর্জুন, তোমার সুভদ্রা নাও। বাপরে, যা কাণ্ড হলো-- কনে-বদল! এ তো একরকম সুভদ্রাহরণ। নে ভাই অনু--

একবার বাঁয়ে নিয়ে দাঁড়া— তোদের যুগলমিলন দুচোখ ভরে দেখি।

অনন্ত।। ও সব এ যুগে আর চলে না ঠাকুমা—

ঠাকুমা।। না চললে আর কী করবো ভাই? তাহলে দরজা বন্ধ কর। দেখিস বাপু, বাড়ির ফচকে মেয়েগুলো যা ছিঁচড়ে, সাবধানে কথা কস ভাই— চলি।

সানাইয়ের সুরে বসন্তবাহার তীব্র হয়ে উঠে ক্রমে স্বাভাবিক হয়।

মীনা।। তোমাদের এখানকার মেয়েরা বড্ড সেকেলে বাবা— কী যে সব যা তা বলে!

অনন্ত।। (হাসে) কেন কী বললে?

মীনা।। এই তো তোমার ঠাকুমা কী বললেন শুনলে না? সুভদ্রাহরণ? হরণ কী? ছিঃ!

অনন্ত।। ও তো আমাদের পুরাণের কথা।

মীনা।। পুরাণে থাকলেই বুঝি হরণ কথাটা ভালো?

অনন্ত।। বেশ তো, এবার না হয় শিখিয়ে দেবো, রূপকথার রাজপুত্তুরের মতো অজগর বধ করে রাজকন্যেকে জিতে এনেছি। হবে?

দুজনেই হেসে ওঠে। আবহসুরে স্বল্প বিরতির আভাস।

মীনা।। হ্যাঁগো, তোমাদের বৈঠকখানা ঘরে সাজানো বাঘটা কী বিরাট?

অনন্ত।। (হাসে) রয়েলবেঙ্গল। ওটা আমি এক গুলিতে মেরেছিলাম।

মীনা।। বাপরে! ... কিন্তু তোমার লাইব্রেরিটা কোথায়?

অনন্ত।। (যেন বুঝতে পারে না) লাইব্রেরি?

মীনা।। হ্যাঁ, বাইরে বুঝি? এবারে কিন্তু তা চলবে না, ঘরে আনতে হবে।

অনন্ত।। ঘরে?

মীনা।। বাঃ, তুমি পড়বে, আমি বুঝি পড়বো না? আমি অনেক পড়তে চাই। তুমি জানো না, মূর্খতাকে আমি ঘৃণা করি।

সানাই তীব্র হয়ে ওঠে।

অনন্ত।। (একটু পরে বিষণ্ণ গলায়) আমার তো কোনো লাইব্রেরি নেই?

মীনা।। যাঃ! তুমি মিছিমিছি বলছ।

অনন্ত।। না মীনা। পড়াশুনো যে আমি বেশি করিনি তাতো তোমরা জানো।

পড়তে আমার ভালো লাগে না।

মীনা।। (আর্তনাদ করে ওঠে) কী? কী বললে তুমি? তুমি... তুমি আমাকে ঠকালে? ছি ছি!

অনন্ত।। কী বলছ তুমি মীনা?

মীনা।। (রুদ্ধ কণ্ঠে) কেন এমন করলে তুমি? কেন? কেন? কী ক্ষতি করেছি তোমার? ঘটক বললে... উঃ মাগো...

অসহ্য কান্নায় ভেঙে পড়ে। সানাইয়ের সুরেও কান্না।

দৃশ্যান্তর

কালীনাথ।। ব্রজরানি—

ব্রজ।। বলো?

কালীনাথ।। তোমার ভালো লাগছে?

ব্রজ।। এর চেয়ে আরো ভালো আমি যে ভাবতে পারিনে গো?

কালীনাথ।। যে বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে এটা কিন্তু আমার নিজের বাড়ি নয় ব্রজ। মামাবাড়ি। আমার বাড়ি গরিবের বাড়ি, ভালো লাগবে?

ব্রজ।। সেটাই তো আমার আসল বাড়ি। শিব শ্মশানে থাকেন, গরিবের তো সেটাই রাজপ্রাসাদ।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ। সব বাজনা থেমে যায়।

কালীনাথ।। কী হলো? (চেঁচিয়ে) এই— এই অনু— গুলি ছুঁড়লি কেন?

অনন্ত।। (দূর থেকে) তুমি ঘরে যাও কালীদা, একটা কালপ্যাঁচা চিৎকার করছিল— মেরে ফেললাম।

সানাইয়ে তীব্র করুণসুর বেজে ওঠে।

দৃশ্যান্তর

পৃথ্বীশ।। সিধু ঘটককে পেলে আমি চাবকে ওর পিঠের ছাল তুলে দেবো। পৃথ্বীশ চাটুয্যের সঙ্গে তঞ্চকতা? দুটো পয়সার জন্যে কিনা আমার একমাত্র মেয়েটাকে একটা মুখ্যু উড়োনচণ্ডী ছেলের গলায় ঝুলিয়ে দিলো?

মীনার মা।। আঃ, চেঁচিয়ো না তো? পাশের ঘরে অনন্ত বসে আছে। মীনাকে দিয়ে জলখাবার পাঠিয়েছি। কথাগুলো একবার কানে গেলে... তাছাড়া পাত্র তো তুমি দেখেশুনে নিজেই পছন্দ করেছ, এখন আর—

পৃথ্বীশ।। কী করে বুঝবো যে ওই বাইরেই দেখনসুখ, ভেতরটি ফোঁপড়া? মীনার কাছে তো শুনলাম ক্লাস নাইন অবধি বিদ্যে! ... এত পড়াশুনোর ঝোঁক মেয়েটার, সব দেখে শুনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে এলো বেচারি!

মীনার মা।। ভবিতব্য। যার চাল যে হাঁড়িতে মাপা। যাক, যা হবার হয়ে গেছে, এখন ওকে ভালো করে বুঝিয়ে বলো, নতুন করে পড়াশুনো শুরু করুক। নিজেকে তৈরি করে নিক খেটেখুটে।

পৃথ্বীশ।। তা কী আর বলিনি ভাবছ? বললাম, পড়াশুনোর তো শেষ নেই বাবাজি, তার বয়েসও নেই। কলকাতায় রেখে আমি তোমাকে ভালো করে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মীনার মা।। তা কী বললো শুনে?

পৃথ্বীশ।। কী বলবে? মুখ গোঁজ করে বসে রইলো। বুঝলুম— পছন্দ হয়নি কথাটা। হবে কী করে? শুনলাম, রাতদিনই নাকি শিকারটিকার করে বেড়ায়। সকালে উঠে চাঁদমারি করে। বাড়িভর্তি শুধু ঢাল-তলোয়ার, বন্দুক-বারবেল। একখানা বইয়ের ছেঁড়া পাতাও নেই কোথাও।

মীনার মা।। ও কী রে মীনা, চলে এলি যে? জলখাবার খেয়েছে অনন্ত? ... কি হলো? অমন চুপ করে আছিস যে?

মীনা।। উনি চলে গেছেন মা, ঘরে কেউ নেই।

ঘড়িতে ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজলো।

মীনার মা।। সে কী? ওগো একবার দ্যাখো—

পৃথ্বীশ।। বলছ, দেখছি। তবে মনে হয়, ওই পড়াশুনোর কথা বলায় অপমান হয়েছে বাবুর। জমিদারের ছেলে তো— কুলোপানা চক্কর!

দৃশ্যান্তর

রাসবিহারী।। (ক্রুদ্ধ) না না, এ আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না রানিবউ, কক্ষনো না।

অনুর মা।। চুপ করো, চুপ করো। ঘরের কেলেঙ্কারি আর পাঁচজনের কানে—

রাসবিহারী।। অনন্ত লেখাপড়া শেখেনি মানলাম, তাই বলে সে তো অমানুষ নয়?

তাহলে আর কেলেঙ্কারিটা কিসের? আস্পর্দা দ্যাখো, লিখেছে অনন্ত শুধু অপদার্থই নয়, আমিও প্রতারক।

অনুর মা।। (স্তম্ভিত) কী বলছ তুমি?

রাসবিহারী।। পড়েই দ্যাখো না? এই নাও। আমরা নাকি ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে কালীনাথের নামে অপবাদ দিয়ে বেনামি চিঠি লিখেছি! তুমি ভাবতে পারো, আমি বেনামি চিঠি লিখেছি? উঃ! চললাম। আমি এর উত্তর দেবো না। তুমি বেয়ানকে জবাব লিখে দাও— মেয়েকে যেন তাঁরা সেখানেই রাখেন পাকাপাকি। এখানে পাঠাবার কোনো দরকার নেই।

পৃথ্বীশের কণ্ঠ।। (কাগজের শব্দ) প্রমাণস্বরূপ পত্রখানিও এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই পত্র আপনার ইঙ্গিতক্রমেই লেখা হইয়াছিল। ইতি— পৃথ্বীশ চট্টোপাধ্যায়।

অনন্ত।। মা—

অনুর মা।। কে, অনু? আয়।

অনন্ত।। তোমাদের সব কথাই কানে গেছে মা। একবার সেই বেনামি চিঠিখানা দেখি? (কাগজের শব্দ) এ কী?

অনুর-মা।। কী হল অনু? চমকে উঠলি কেন বাবা?

অনন্ত।। আমি... না থাক। ওঁদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই মা। চিঠিখানা আমিই লিখিয়েছিলাম। এটা আমার কাছেই থাক।

অনুর মা।। তুই? কী বলছিস অনু? তুই লিখিয়েছিলি?

অনন্ত।। (দীর্ঘশ্বাস) হ্যাঁ মা, আমি।

দৃশ্যান্তর

কালীনাথ।। (দূর থেকে কাছে আসে) রানি রানি— এই রানি। কী হলো, সাড়া দিচ্ছো না?

ব্রজ।। আমাকে ডাকছ? রানি কে?

কালীনাথ।। (হেসে ওঠে) হা হতোস্মি! সিংহাসনে বসে রাজদণ্ড ধরে বলছ রানি কে?

ব্রজ।। (অবাক) সিংহাসন? রাজদণ্ড? কোথায়? ওই রান্নাঘরের পিঁড়ে আর হাতা-বেড়ি? ভালো। তা রাজ্যটার নাম কী শুনি?

কালীনাথ।। আমার হৃদয়রাজ্য, সখি। প্রথমদিন থেকেই সেখানে তুমি রানি। আজ ঘোষণা করলাম। আজ থেকে তুমি ব্রজরানি নও, শুধু রানি।

ব্রজ।। যাঃ! সে আমার লজ্জা করবে।

কালীনাথ।। হা হা, এত সরল বলেই তুমি এত সুন্দর। (কড়ানাড়ার শব্দ) কে? কে?

অনন্ত।। (দূর থেকে) আমি কালীদা, অনন্ত।

কালীনাথ।। (প্রায় আতঙ্কিত) অনু!

ব্রজ।। কী হলো, এত চমকে গেলে কেন? ঠাকুরপো এসেছেন, খুলে দাও—

কালীনাথ।। (যেন চমক ভাঙে) এ্যাঁ? হ্যাঁ, যাই। (দরজা খোলার শব্দ) আয় অনু। তুই তো আর এদিক মাড়াসই না। তোর বৌদি কত নাম করে তোর। বলে, আমাদের নতুন সংসারে ঠাকুরপো এলেন না। ভাবি, অনুর হয়তো ভালো লাগে না আমাদের ঘরগেরস্থালি।

অনন্ত।। কেন ভাবলে? আমি কী তোমাদের হিংসে করি? না কালীদা, বিশ্বাস করো—

কালীনাথ।। (দীর্ঘশ্বাস) সে আমি জানি।

অনন্ত।। মায়ের মুখে শুনেছি বৌদির গুণের কথা। বৌদি আমাকে আসবার জন্যে মাকে বলেছিলেন।

কালীনাথ।। তাই এসেছিস? দাদার টানে নয়?

অনন্ত।। না গো, এবার সত্যিই তোমার টানে। একটা জিনিস দিতে এলাম।

কালীনাথ।। কী?

অনন্ত।। এই চিঠিখানা। তোমার জন্যে।

কালীনাথ।। কী চিঠি? কার?

অনন্ত।। জানি না। বেনামি চিঠি একটা। বিয়ের আগে আমার শ্বশুরকে কে যেন এখান থেকে লিখেছিল, তিনি আবার বাবাকে পাঠিয়েছেন। দেখো তো একটু খোঁজ করে, কে লিখেছে? নাও ধরো। চলি।

ঝড়ের শব্দ।

ব্রজ।। কোথায় যাবেন ঠাকুরপো, ঝড় উঠেছে—

অনন্ত।। অকালবৈশাখী বৌদি। জন্তুজানোয়ার মেরে বেড়াই, ঝড়বৃষ্টিতে ভয় কী?

ব্রজ।। শুনছো? এই ঝড়জলের মধ্যে ঠাকুরপো বেরিয়ে গেলেন! আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আজ আমার বড্ডো ভয় করছে বাপু।

কালীনাথ।। একটা কাজ করবে রানি? মীনাকে একটা চিঠি লিখবে? সে আসুক, এখানে আসুক। লিখবে?

ঝড়ের উদ্দাম শব্দ।

দৃশ্যান্তর

ব্রজর কণ্ঠ।। (কাগজের শব্দ) মীনা ভাই, আমি তোমার দিদি ব্রজরানি। চিনেছ তো? তুমি ভাই অবিলম্বে এখানে চলে এসো, দেরি কোরো না। নইলে বোধহয় ঠাকুরপো পাগল হয়ে যাবে। সে সন্ন্যাসীর মতো হয়ে গেছে। আশীর্বাদ ভালোবাসা রইল। ইতি— ব্রজরানি।

মীনার মা।। (দূর থেকে কাছে) কে চিঠি দিয়েছে মীনা? অনন্ত?

মীনা।। না।

মীনার মা।। কই দেখি? (কাগজের শব্দ) ব্রজরানি? এতো তোদের ওই কালীনাথের বউ না? বাঃ! দেখ, কত বিবেচনা!

মীনা।। আমি কিন্তু যাবো না মা— কোনোদিন যাবো না। আমাকে তোমরা পাঠিও না।

মীনার মা।। তা বললে কি হয় মা? স্বামীর ঘরই তো মেয়েদের সত্যিকারের ঠাঁই। বাপের ঘর কিছুক্ষণ, স্বামীর ঘর আমরণ। না বলতেই নেই।

দৃশ্যান্তর

কালীনাথ।। (দূর থেকে কাছে) রানি রানি—

ব্রজ।। কী বলছো?

কালীনাথ।। একটা সুখবর আছে? কলকাতায় একটা কলেজে চাকরি পাচ্ছি।

ব্রজ।। কলকাতায়? তাহলে আমি? আমি কোথায় থাকবো?

কালীনাথ।। কেন, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে?

ব্রজ।। কলকাতা আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া এখানকার চাষবাস ফেলে তুমি যাবেই বা কেন?

কালীনাথ।। এ জায়গাটা এখন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে রানি। আমি আর টিকতে পারছি না। অনু— (দীর্ঘশ্বাস) না থাক, ওসব তুমি বুঝবে না।

ব্রজ।। ঠাকুরপোকে দেখলে কিন্তু সত্যিই খুব ভয় করে আজকাল।

কালীনাথ।। (যন্ত্রণাবিদ্ধ) আঃ! এই বিয়েটা যদি না হতো! ছি ছি ছি...

ব্রজ।। ভালোকথা, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, মীনা চিঠি লিখেছে। সে পরীক্ষা দেবে, এখন আসতে পারবে না। আমি তাকে লিখেছিলাম, ঠাকুরপো সন্ন্যাসীর মতো হয়ে গেছে। তাই লিখেছে, সন্ন্যাসী সে হতে পারবে না। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

কালীনাথ।। না না, থাক। ও চিঠি আমি আর দেখতে চাইনে। যার যা অদৃষ্ট। আমিই বা কী করবো, তুমিই বা কী করবে? (দীর্ঘশ্বাস) সবই অনন্তর অদৃষ্ট।

দৃশ্যান্তর

ঠাকুমা।। (ডাকতে ডাকতে আসেন) বৌমা— অ বৌমা— এই তো খোকাও আছিস দেখছি। আচ্ছা, তোরা কী ভেবেছিস বল দেখি?

রাসবিহারী।। কেন মা, কী হয়েছে?

ঠাকুমা।। আবার জিগ্যেস করছিস কী হয়েছে? নাতিটা যে আমার বিবাগী হয়ে যাচ্ছে— সে কি তোদের নজরে পড়ে না? শুনলাম, কাল রাতে নাকি ফেরেনি বাড়িতে? সত্যি বৌমা?

অনুর মা।। সত্যি মা। বললো— কোথায় নাকি একটা চিতা বাঘ খুব জ্বালাচ্ছে। বন্দুকটন্দুক নিয়ে বেরিয়েছে।

রাসবিহারী।। কোনদিন অপঘাতেই জীবনটা যাবে ছোঁড়ার! দিনরাত ব্যাধের মতো বন্দুক কাঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চেহারা হয়েছে তো বাউণ্ডুলের মতো!

ঠাকুরমা।। শুধু শুধু ওর নিন্দেমন্দ করলেই সব মিটবে? তুই ওর বাপ হয়ে ওর মনের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছিস?

রাসবিহারী।। ও কী করেছে জানো মা? ও জাল চিঠি লিখে ওদের প্রতারণা করেছে! আমার মাথা হেঁট করে দিয়ে নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করেছে সেখানে। আমি কী করবো?

অনুর মা।। তুমি বাবা। একথা কি তোমার সাজে? তুমি ছাড়া কে করবে?

ঠাকুমা।। ঠিকই তো। শোন খোকা, আমি বলছি— বেয়াইকে চিঠি লেখ। বৌমাও লিখুন বেয়ানকে। পরীক্ষা আর দিতে হবে না, বধূমাতাকে তাঁরা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিক। নইলে আমি কিন্তু আবার বিয়ে দেবো আমার নাতির।

রাসবিহারী।। তুমি যখন আদেশ করেছ মা, চিঠি নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু লাভ কী? নাতি যে তোমার সেপাই হতে চলেছে! রাইফেল শুটিং কম্পিটিশনে নাম লিখিয়েছে। এই যে চিঠি।

দৃশ্যান্তর

অনন্ত।। রাখ রাখ। নামা এখানে। (চিৎকার করে) কালীদা— কালীদা—

কালীনাথ।। (ভিতর থেকে আসে) কী হলো রে অনু? এত হাঁকডাক কিসের? ওরে বাব্বা! এতো পেল্লায় চিতাবাঘ! কোত্থেকে মারলি?

অনন্ত।। হিজলখালির জঙ্গলে। কদিন ধরে জ্বালাচ্ছিল খুব।

কালীনাথ।। শিকারে যাচ্ছিস, আমাকে বলিসনি তো কিছু?

অনন্ত।। (হাসে) কী বলবো? তুমি তো বলো জ্যান্ত বাঘ এক চিড়িয়াখানা,

সার্কাসে ছাড়া দেখতে নেই। তাছাড়া বৌদি একলা, ভেবে সারা হবেন।

কালীনাথ।। দাঁড়া, ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। শিকারির সঙ্গে বাঘের একটা ছবি তুলে রাখি।

অনন্ত।। এই ঝগড়ু, তোরা এখন যা— বিকেলে এসে পয়সা নিয়ে যাস। ... বুঝলেন বৌদি, সাক্ষাৎ শয়তান ছিল ব্যাটা। আট-দশটা বাছুর মেরেছে। আশ্চর্য, শুধু বুকটা খেয়ে ফেলে রেখে যেত!

কালীনাথ।। একটু ভালো করে দাঁড়া দেখি অনু, বাঘের গায়ে একটা পা রেখে, বন্দুকটা হাতে ধরে দাঁড়া। এ্যাই— ব্যাস, ঠিক আছে।

ব্রজ।। আহা, অমন করে বাঘটাকে বন্দুক দিয়ে ঠুকবেন না ঠাকুরপো। বড়ো নিষ্ঠুর আপনি!

অনন্ত।। ওটা মরা বৌদি?

ব্রজরানী।। তাই তো বলছি, যে মরা তাকে আর মেরে কী হবে?

অনন্ত।। তা বটে। কালীদা, একদিন একটা বাঘের চামড়া চেয়েছিলে না? এটা রইল। চলি।

দৃশ্যান্তর

পৃথ্বীশ।। (ক্রুদ্ধ) সিধু ঘটককে পেলে আমি অ্যালসেশিয়ান দিয়ে খাওয়াবো। জোচ্চুরি করে মেয়েটাকে আমার— (বিষণ্ণ) বড়োবউ, মীনাকে আমি শেষপর্যন্ত কিনা হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলাম?

মীনার মা।। ছি ছি, এ কী বলছ তুমি?

পৃথ্বীশ।। ঠিকই বলছি। মূর্খতায় আর লোনাজলে কোনো তফাত নেই বড়োবউ, মুখে দেওয়া যায় না।

মীনার মা।। তোমরা কিন্তু অনন্তর উপর অবিচার করছ।

পৃথ্বীশ।। অবিচার করছি?

মীনার মা।। নিশ্চয়ই। লেখাপড়া আর লেখাপড়া! ওটা বাতিক হয়ে উঠলে তার মানে দাঁড়ায়, ইংরেজি বুলির অহংকারে দুনিয়াকে ছোটো ভাবা। মানুষ লেখাপড়া শেখে মানুষ হতে। আমাদের অনন্ত তো অমানুষ নয়?

পৃথ্বীশ।। তাহলে দোষ আমাদের?

মীনার মা।। দোষ না হোক, ভুল বোঝা তো বটে?

পৃথ্বীশ।। তুমি তো বলবেই। চিরকালই এই করে এলে।

মীনার মা।। হ্যাঁ, আজও তাই বলবো, তাই করবো। মেয়েকে পাঠিয়ে দাও। সামনে ওর সমস্ত জীবন পড়ে আছে। ... এইতো মীনা, দ্যাখ তোর

শ্বাশুড়ি তোকে পাঠিয়ে দেবার জন্য মিনতি করে চিঠি লিখেছেন। এইতো— (কাগজের শব্দ) "অনন্ত হয়তো আমার পাগল হইয়া যাইবে, অথবা কোনোদিন জন্তু-জানোয়ারের হাতে প্রাণ হারাইবে।" ... তুই শ্বশুরবাড়ি যাবি, তৈরি হয়ে নে।

মীনা।। না আমি যাবো না।

মীনার মা।। হ্যাঁ যাবি। যেতে তোকে হবেই। এটাই আমার শেষ কথা।

দৃশ্যান্তর

অনুর মা।। এইতো তুমি মিছিমিছি রাগ করছিলে। এই দ্যাখো, বেয়ান চিঠি লিখেছেন— বৌমা আসছেন। লিখেছেন— "মেয়ে আমার একটু অভিমানী, আপনি একটু মানিয়ে নেবেন। দুপক্ষেরই ভুল হয়ে গেছে। এ বাড়িতে লেখাপড়ার উপর ঝোঁক বেশি। অনন্ত বাবাজীবনের কী এমন বয়েস। এখনও যদি লেখাপড়া করে কত সুখের হয়।"

রাসবিহারী।। ভালোই লিখেছেন। ও লেখাপড়া শিখলো না, তাতে কি আমাদেরই ভালো লাগে?

অনুর মা।। তুমি একটু ছেলেকে বুঝিয়ে বলো।

রাসবিহারী।। দেখি।

দৃশ্যান্তর

অনন্ত।। কালীদা—

কালীনাথ।। আয় অনু। হঠাৎ?

অনন্ত।। তুমি আমাকে লেখাপড়া শেখাবে? আমি শিখবো?

কালীনাথ।। আমি যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি ভাই। একটা চাকরি পেয়েছি। কলেজে লেকচারার। গরমের ছুটির পরেই যোগ দিতে হবে।

অনন্ত।। তুমি পালাচ্ছো কালীদা? তুমি কেমন সুখে ঘরকন্না করছ, আর আমি বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাই? (হাসে) আমারও বউ আসছে কালীদা—

ব্রজ।। মীনা আসছে? সত্যি?

অনন্ত।। সত্যি বৌদি। এবার আমি সত্যিই লেখাপড়া শিখবো। তারপর বিলেত যাবো, সব মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি। কী কী বই কিনতে হবে একটু লিখে রেখো তো? আনিয়ে নেবো।

দৃশ্যান্তর

জুড়িগাড়ির শব্দ। দূর থেকে কাছে এসে থামে। উলু ও শঙ্খধ্বনি।

অনুর মা।। এসো মা, এসো। আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসো। ... থাক মা, থাক। বাড়ির সবাই কুশলে আছেন তো? ... ও মনোরমা, বৌমাকে ওঁর ঘরে নিয়ে যা। আমি ওঁর জিনিসপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। তুমিও যাও ঝি— ওর সঙ্গে যাও বাছা। ... অনু কইরে? অনন্ত? (সেতারে একটুকাল আনন্দের সুর বাজে) ... এই যে অনন্ত, তোকেই খুঁজছিলাম। এই নে, তোর শাশুড়ি একখানা চিঠি দিয়েছেন তোকে। বৌমা ঘরে গেছেন। যা—

সেতারে আনন্দের সুর। কাগজের শব্দ।

মীনার মা।। (কণ্ঠ) কল্যাণীয়েষু বাবা অনন্ত, আমার আশীর্বাদ লইবে। মীনাকে তোমার হাতে দিয়াছি বাবা, তাহাকে সুখী করিবার ভার তোমার। তোমার উপর ভরসা করিয়া তাহাকে পাঠাইলাম....

সেতারের ঝালায় কথা চাপা পড়ে যায়।

দৃশ্যান্তর

মীনা।। কে?

অনন্ত।। আমি মীনা— অনন্ত। কতদিন পরে তুমি আমার ঘরে এলে।

মীনা।। কেন তোমরা আমাকে এ ভাবে টেনে আনলে?

অনন্ত।। আমি যে তোমাকে চাই মীনা, তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া এ ঘরে থাকতে পারছিলাম না।

মীনা।। ছাড়ো, হাত ছাড়ো।

অনন্ত।। না না, যেও না। শোনো মীনা—

মীনা।। কী শুনবো? আমি তো আগেই বলেছি মুর্খতাকে আমি ঘৃণা করি।

অনন্ত।। আমি মুর্খ বলে তোমার মনে দুঃখ আছে, রাগ আছে, আমি জানি। কিন্তু ইংরেজি না জানলেই কি মানুষ অশিক্ষিত হয়? আমি তো বাংলা জানি? বাংলা পড়ি। বেশ তো, আমি না হয় আবার লেখাপড়া করবো। তোমাকে সুখী করতে চেষ্টা করবো?

মীনা।। (খিলখিল করে হেসে ওঠে) তাই নাকি? (ব্যাঙ্গের সুরে) তা কোন ক্লাসে ভর্তি হবে?

অনন্ত।। (আহত) মীনা!

মীনা।। কেন তোমরা আমাকে এ ভাবে জোর করে নিয়ে এলে? কেন? কেন? কেন ভাবলে না আমি মরে গেছি?

অনন্ত।। সেটা কি ভাবা যায় মীনা? তাছাড়া আমরা তোমাকে তো জোর করে আনিনি?

মীনা।। জোর করে আনোনি? আমি সেধে এসেছি? বাবা-মাকে শাসিয়ে লেখোনি তোমরা? ওসব না করে একটা বিয়ে করেই তো জানালে পারতে? যে তোমাকে মূর্খ জেনেও ভাবতো— তুমি স্বামী, তুমি দেবতা, তুমি—

কান্নায় ভেঙে পড়ে। সেতারে বিলম্বিত লয়ে করুণ সুর বাজে।

অনন্ত।। (একটুকাল পরে) মীনা, আমার একটা কথার জবাব দেবে? তুমি এমন কেন?

মীনা।। কী বলতে চাও তুমি?

অনন্ত।। কই, কালীদার বউ তো এমন নয়? কত সুখী তাঁরা! কালীদা গরিব, তবু—

মীনা।। (ফুঁসে ওঠে) থামো থামো। সেই এক কথা। তিনি গরিব— তুমি বড়োলোক। ওটাই শিখেছো। বুঝতেও পারছো না কার সঙ্গে কার তুলনা— চাঁদে আর বাঁদরে!

অনন্ত।। (ক্ষুব্ধ) মীনা! কী বলছ তুমি?

মীনা।। যা সত্যি তাই বলছি। মিথ্যে করে তাঁর নামে অপবাদ দিয়ে বেনামি চিঠি পাঠিয়ে তুমি আমার জীবনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ।

অনন্ত।। (চিৎকার করে) না—। আমি মূর্খ হতে পারি কিন্তু অধার্মিক নই মীনা। ভগবানের দিব্যি, কোনোরকম প্রতারণা করিনি আমি।

মীনা।। চুপ করো। জানোয়ারের মতো চেঁচিও না।

অনন্ত।। কী? কী বললে?

মীনা।। ঠিকই বলেছি। যেমন জন্তুর মতো আচরণ, তেমনি জন্তুর মতো চিৎকার!

অনন্ত।। (রাগে ফেটে পড়ে) মীনা!

মীনা।। কেন, চাবুক এনেছ বলে তোমাকে ভয় করতে হবে? আমি তোমাদের তালুকের প্রজা নই। যা সত্যি, তা হাজারবার বলবো। তুমি মূর্খ, তুমি

প্রতারক, তুমি জানোয়ার।

অনন্ত।। তাই? আমি মূর্খ? (চাবুক মারে) আমি প্রতারক? (চাবুক) আমি জানোয়ার? (চাবুক) কেমন লাগে?

মীনা।। (কাঁদতে কাঁদতে) কী, তুমি আমাকে চাবুক মারলে?

অনন্ত।। মারলাম। এই তোমার অপমানের শাস্তি।

অনুর মা।। (দূর থেকে আসেন) একি, এ কী হলো? বউমা?

মীনা।। সরে যান। এ বাড়ির কারও সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি চলে যাচ্ছি। ঝি-ঝি—

অনুর মা।। বৌমা, শোনো— অনন্ত, অনু, শোন, যাসনে—

রাসবিহারী।। ওই কুলাঙ্গার সন্তানের মৃত্যুকামনা করো রানিবউ, ও মরে যাক।

অনুর মা।। কী বলছ তুমি? বৌমা যে চলে গেলেন— ওঁকে ফেরাও।

রাসবিহারী।। কোন মুখে ফেরাবো? যান উনি? ওঁকে যেতে দাও। আমি বরং সঙ্গে লোক দিচ্ছি। সরকার— সরকার—

সরোদ-সেতারের সম্মিলিত ঝালার উপর দিয়ে দ্রুতবেগে রেলগাড়ি ছুটে যায়।

দৃশ্যান্তর

হর-র মা।। ও হর, অনন্ত যে পাগলের মতো ঘুমোচ্ছে বাবা। আহা, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে! মনে হচ্ছে যেন কতকাল ঘুমোয়নি... এত মায়া লাগছে দেখে—

হরদাস।। ওর বোধহয় কোনো অসুখ করেছে মা। ও আমাদের ব্রজরানির দেওর, কতবার দেখেছি, কিন্তু আজ রাইফেল সুটিংয়ের মাঠে দেখে প্রথমটায় চিনতেই পারিনি। নেহাত বাতিক না থাকলে কেউ এই শরীর নিয়ে কমপিটিশনে আসে? তবে আশ্চর্য হাতের এইম! অবলীলায় বেস্টম্যানস্ অ্যাওয়ার্ড নিয়ে বেরিয়ে এলেন? মিনিস্টার তো খুব খুশি। নিজে এসে আলাপ করলেন ওর সঙ্গে।

হর-র মা।। তাই ভাবি, এই ছেলে, এই ঘর নিয়ে চিঠিখানা সেদিন কে লিখলে? উদ্ধত, গোঁয়ার, নেশাখোর, বাড়িতে এত দেনা— কত কথা!

হরদাস।। হা হা হা—

হর-র মা।। কী হল রে? হাসির কী বললাম?

হরদাস।। আজ আর ওসব কথা তুলে কী হবে মা? আমাদের ব্রজ তো সুখী হয়েছে। ... শুনবে? ও চিঠিখানা তোমার জামাইয়েরই লেখা ছিল।

হর-র মা।। কালীনাথের?

হরদাস।। হ্যাঁ মা। উকিলের চোখ তো আমার। (হাসে) কালীনাথের পরের চিঠিগুলো দেখে সন্দেহ হওয়ায় হ্যাণ্ডরাইটিং-একসপার্টকে দেখিয়ে তবে নিশ্চিত হয়েছি।

হর-র মা।। দ্যাখো দেখি কাণ্ড!

হরদাস।। কী আর করা যাবে মা। ব্রজকে দেখে ওর পছন্দ হয়ে গেছে, এখন আপনা-আপনির মধ্যে কী করে কী হবে? ফলে এই ছেলেমানুষী। শাস্ত্রে বলে— যুদ্ধ আর প্রেমে কোনো দোষ নেই। ওরা সুখী হোক। আরে, এই তো অনন্তবাবু— ঘুম ভাঙলো?

অনন্ত।। হ্যাঁ। আমি এই ট্রেনেই বাড়ি যাবো হরদাসবাবু।

হর-র মা।। সে কী বাবা? তোমার শরীর অসুস্থ—

অনন্ত।। আমাকে যেতেই হবে মা। আমাকে মাপ করবেন আপনারা। এইমাত্র আমি বড়ো দুঃস্বপ্ন দেখেছি। ... ধন্য আপনি মা, আপনার মেয়ে। তিনি দেবী। রাজরাজেশ্বরীর মতো সুখী হয়েছেন।

হরদাস।। অনন্তবাবু—

অনন্ত।। আর পিছু ডাকবেন না হরদাসবাবু। আমার মন বড়ো চঞ্চল হয়েছে। নমস্কার।

দৃশ্যান্তর

পৃথ্বীশ।। কে?

অনন্ত।। আমি, অনন্ত।

পৃথ্বীশ।। কোন সাহসে তুমি এ বাড়িতে ঢুকেছ?

অনন্ত।। আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। অন্যায় করেছি— আমাকে মাফ করুন।

পৃথ্বীশ।। (উত্তেজিত) না না না, অসম্ভব। তুমি—

অনন্ত।। সব দোষ আমি স্বীকার করছি। আমি অপরাধী, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি অনুতপ্ত।

পৃথ্বীশ।। তুমি মূর্খ। তুমি প্রতারক।

অনন্ত।। কোনো প্রতিবাদ করবো না। আপনারা যা বলবেন করবো। আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। একবার যদি মীনাকে—

পৃথ্বীশ।। মীনাকে? তাকে চাবুক মেরে আশা মেটেনি? এখন বন্দুক ঘাড়ে এসেছ খুন করতে? দেয়ালে ওটা কী টাঙানো দেখতে পাচ্ছো?

অনন্ত।। চাবুক।

পৃথ্বীশ।। হ্যাঁ। তোমার মতো অশিক্ষিত বর্বরের কাছ থেকে মীনা যা পাবার পেয়েছে, কিন্তু আমি তো ছাড়বো না। তোমার পাওনাগণ্ডাও

তোমাকে সুদে-আসলে মিটিয়ে দেবো। মুর্খ, নরাধম, জোচ্চোর— এই নে (চাবুক মারে) এই নে (চাবুক) এই নে (চাবুক)। যা, এবার দূর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে।

অনন্ত।। (যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে) প্রায়শ্চিত্তের জন্য চাবুকের এই মারটুকু আমার দরকার ছিল। আরও মারতে চান, মারুন। শুধু একবার বলুন, ক্ষমা করেছেন?

পৃথ্বীশ।। ক্ষমা? তোমাকে? যে বন্দুক দিয়ে জানোয়ার মারো, সেই বন্দুকের গুলিতে যেদিন নিজের ওই জানোয়ারের জীবনটা শেষ করতে পারবে, সেদিন আমি ক্ষমা করবো, তার আগে নয়। গেট আউট— স্কাউন্ড্রেল।

তীব্র বেগে ট্রেনের চলে যাবার শব্দ।

দৃশ্যান্তর

অনন্ত।। (ভাঙা কর্কশ গলায় বাইরে থেকে) কালীদা, কালীদা—

ব্রজ।। ঠাকুরপো ডাকছেন তোমাকে। খুলে দাও।

কালীনাথ।। যাই। ওর গলাটা যেন কেমন লাগছে। তুমি ফিরে যাও রানি, আমি দেখছি। (দরজা খোলার শব্দ) আয় অনু। এ কী। তোর মুখ-চোখ-শরীর এমন ক্ষতবিক্ষত? হলো কী করে? তাই তো ভাবি... কী হয়েছে তোর?

অনন্ত।। জানোয়ার। জানোয়ারে খুবলেছে কালীদা!

কালীনাথ।। কোথায়? উঃ! তারপরেও আবার তুই বন্দুক নিয়ে—

অনন্ত।। (হাসে) মারতে বেরিয়েছি। আমাকে তো জানো? আমি ছাড়বো না কালীদা।

কালীনাথ।। ওরে, আহত জানোয়ার ভয়ংকর হয়। তোর প্রাণে কি ভয় ডরও নেই?

অনন্ত।। চারদিকে এত জানোয়ার। জানোয়ারের মধ্যেই তো বাস। ভয় পেলে চলবে কেন কালীদা? ওপরটা এই দেখছো, কিন্তু আমার ভেতরটা? গোটা জীবনটাকে যে ক্ষতবিক্ষত করেছে আর একটা জানোয়ার— এরপর তাকে মারবো, তারপর নিজেকে। কিন্তু তার আগে—

আবহসংগীতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

কালীনাথ।। (আতঙ্কিত) অনু— ও কী, অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? বন্দুক দিয়ে কী করবি? অনু—

অনন্ত।। একদিন এই ঘরে তুমি একটা কুকুরকে মেরেছিলে, মনে আছে? তার দোষ— সে তোমার বিছানায় শুয়েছিল। আজ আমার জীবনটাকেও—

কালীনাথ।। এবার আমি তোর কথার মানে বুঝতে পেরেছি অনু। হ্যাঁ, আমি সত্যিই ভুল করেছি। অনু, আমি তোর বড়ো ভাই— আমি হাত জোড় করে তোর কাছে ক্ষমা চাইছি, অনু—

অনন্ত।। শিকারির হাত থেকে শিকার ফসকে গেলে যে শিকারির মরণ কালীদা, বন্দুক হাতে নিয়ে তাই কি পারি?

কালীনাথ।। (ব্যাকুলকণ্ঠে) তোর কথা আমি সব মানছি অনু। আমি ভুল করেছি। তোকে ঠকিয়েছি— অন্যায় করেছি। অনু, তবু এবারের মতো তুই ক্ষমা কর। অনু, আমি সারাজীবন তোর কাছে—

গুলির শব্দ ও আর্তনাদ।

ব্রজ।। (আর্তস্বরে) এ আপনি কী করলেন ঠাকুরপো?

আবার গুলির শব্দ।

উঃ। মাগো—

কাঁদতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। ঝড়ের শব্দ ওঠে।

অনন্ত।। (পাগলের মতো হাসে) হা হা হা হা হা...

হাসির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় যেন আছড়ে পড়ে।

দৃশ্যান্তর

ব্রজ।। উঃ মাগো—

হর-র মা।। ব্রজ—

ব্রজ।। মা—

হর-র মা।। রাতদিন ওই এক চিন্তা, এক স্মৃতি নিয়ে বসে থাকলে তুই পাগল হয়ে যাবি মা?

ব্রজ।। না মা, এতদিন যখন হইনি, তখন এই কটা দিনে আর কিছু হবে না।

হর-র মা।। (দীর্ঘশ্বাস) দেখতে দেখতে চার-চারটে বছর পেরিয়ে গেল, তোর চোখে একফোঁটা ঘুম নেই।

ব্রজ।। ঘুম আসে না মা। চোখ বুজলেই সেই রাক্ষসটা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। দেখতে পাই, উনি হাতজোড় করে বলছেন, ক্ষমা অনু, ক্ষমা — কিন্তু সেই অসুরটা বন্দুকটা তুলে— (কান্নায় ভেঙে পড়ে) না না, প্রাণ থাকতে ওই খুনীকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না মা, কিছুতেই না।

হরদাস।। (বাইরে থেকে) মা—

হর-র মা।। যাই রে হর। ... তোর যা ইচ্ছে করিস মা, কিন্তু অমন করে ঝিম ধরে বসে থাকিস নে। যেমন করে পারিস, যত কষ্ট হোক, অন্য কিছুতে মন দে। বইটই পড়, ভগবানকে ডাক, পুজোআর্চা কর। (দীর্ঘশ্বাস) তোর এই যোগিনীরূপ আমি আর সইতে পারিনে মা।

দৃশ্যান্তর

হর-র মা।। ওঁকে যেতে বলে দে হরদাস, ব্রজরানি ক্ষমা করতে পারবে না।

হরদাস।। বলেছি মা, বারবার বলেছি। কিন্তু অনন্তর বাবা হাত জোড় করে বলছেন, একটিবার শুধু ব্রজর সঙ্গে দেখা করেই তিনি চলে যাবেন।

হর-র মা।। কী দেখবেন তিনি? চারবছর ধরে স্বামীহন্তার শাস্তির দিন গুনে গুনে মাথায় তেল দেয়নি মেয়েটা। ঘুমোয় নি। মাটি ছাড়া শয্যা নেয় নি—

হরদাস।। সব বলেছি মা। ... খুনের সাতদিন পরে পুলিশ যখন অনন্তকে ধরে নিয়ে এলো, তখন সে উন্মাদ পাগল। কোর্ট তাকে রাঁচী পাঠালে চিকিৎসার জন্যে। আমার মনে আছে মা, রাসবিহারীবাবু সেদিন ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, তুমি সেরে উঠে দণ্ড নিয়ে মহাপাপ থেকে মুক্ত হও।

হর-র মা।। তিনি হয়তো সৎ লোক। কিন্তু ব্রজর কাছে তিনি কী চান? ক্ষমা তো? সে আর হবে না বাবা।

হরদাস।। ক্ষমা চান ঠিকই, কিন্তু ছেলের জন্যে নয় মা, ওঁর বংশের জন্যে। বললেন, ওঁর বাবা, মানে অনন্তর পিতামহ আর কালীনাথের মাতামহ একই লোক। তাঁর সেই বংশ যেন অভিশপ্ত না হয়। তাছাড়া ব্রজর শিশুসন্তানের জন্যে কিছু সম্পত্তি দিতে চান।

হর-র মা।। ঘুস?

হরদাস।। না মা। সে তো অধিকারী। উনি বললেন কালীনাথকে হত্যা না করে

অনন্ত যদি আত্মহত্যা করতো, তবে তো তাঁর সব সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হতো কালীনাথের ছেলে। পৃথ্বীশবাবুও তো ওর ছেলের জন্মের খবর পেয়ে পঁচিশহাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন।

হর-র মা।। হ্যাঁ, কিন্তু ব্রজরানি তা ফিরিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া তিনি তো আবার শুনি ব্যারিস্টারও লাগিয়েছেন অনন্তর পক্ষে লড়বার জন্যে।

হরদাস।। আমাদের মতো ওঁরও তো একটা মেয়ে আছে মা, সেও তো দুঃখী? ঠিক আছে, রাসবিহারীবাবুকে আমি তোমার কথা জানিয়ে দিচ্ছি। তুমি ব্রজর কাছে যাও।

দৃশ্যান্তর

মীনা।। এ কী হয়ে গেল মা, এমন তো আমি চাইনি?

মীনার মা।। তোর বাবা ভুল করেছেন মীনা, সেজন্যে তাঁর অনুতাপেরও শেষ নেই। পুলিশ তদন্ত না করলে আমরা তো কোনোদিনই জানতে পারতাম না— ওই বেনামি চিঠি কালীনাথই লিখেছিল। মিছিমিছি আমরা বেচারিকে কত অপমান করলাম!

মীনা।। অপমান তো আমি করেছি মা, সব কিছুর মূলেই আমি। লেখাপড়ার অহংকারে আসল শিক্ষাকেই তুচ্ছ করেছি। আমার পাপের ক্ষমা নেই। (কাঁদে) আমি আদালতে গিয়ে সব বলবো মা। বলবো, আমিই দায়ী।

মীনার মা।। আদালত তা শুনবে না মা। অনন্ত খুন করেছে, ব্রজরানি তার সাক্ষী।

মীনা।। তবে শুধু তাঁর কাছেই ক্ষমা চাইবো আমি? সেদিন—

কান্নায় ভেঙে পড়ে।

মীনার মা।। এখন থেকেই কাঁদিস নে মা। সারাটা জীবন তো পড়েই রইলো। তার চেয়ে বরং চল, ব্রজরানির কাছেই যাই। যাবি?

দৃশ্যান্তর

আদালতের পরিবেশ। দর্শকের গুঞ্জন, যা প্রায় কোলাহলের মতো শোনা যায়।

বিচারক।। (হাতুড়ির শব্দ) অর্ডার! অর্ডার! (গুঞ্জন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়) প্রসিড।

উকিল।। ইয়োর অনার, ন্যায় ও ধর্মের নামে অতি নিষ্ঠুর এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রার্থনা করে এই মামলা ধর্মাধিকরণে উপস্থিত

করছি। চার বছর আগে— ২৮শে বৈশাখ কালীনাথ ঘোষাল নিহত হন। সাবিত্রীব্রতের দিন উপবাসধারিণী স্ত্রীর চোখের সামনে, তাঁর সকরুণ আর্তমিনতি উপেক্ষা করে, বন্দুকের গুলিতে তাঁকে হত্যা করা হয়। এমন নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিকতার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। আসামি অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। মৃত কালীনাথের সে নিকট-আত্মীয় ছিল। সম্পর্কে পিসতুতো ভাই। এক অর্থে কালীনাথের বন্ধুও ছিল সে। কিন্তু সে বড়ো অসম বন্ধুত্ব। কারণ কালীনাথ ছিল শিক্ষিত, বিনয়ী আর আসামি অনন্ত অশিক্ষিত মুর্খ, ক্রোধী। শিকার করার নামে নিছক হত্যাকাণ্ডের উপর তার একটা নেশা ছিল। আপাতদৃষ্টিতে হলেও বন্ধুপ্রতিম কালীনাথের প্রতি তার ঈর্ষাও ছিল প্রবল। কারণ কালীনাথ ছিলেন বিদ্যান, সকলের প্রশংসাভাজন, সমাজে সমাদৃত, আর ধনীপুত্র আসামি মুর্খ, অসহিষ্ণু ও দুর্বিনীত। সেজন্যে জমিদারের ছেলে হয়েও সমাজে উপেক্ষিত ছিল সে। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড মানুষের মর্মমূলে নাড়া দিয়েছে। ব্রজরানির সঙ্গে চারবছর ধরে সকলেই যেন এই নির্মমতার, এই ভয়ংকর হত্যার বিচার প্রার্থনা করছে।

দৃশ্যান্তর

পৃথ্বীশ।। আমি বলি কী, তুই একবার কালীনাথের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর মীনা। ওই তো একা চুপ করে গাড়িতে বসে রয়েছেন।

মীনা।। আমি পারবো না বাবা। কতবার ভেবেছি তাঁর দুটি পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বলি— দিদি, সব অপরাধ আমার। আমাকে তুমি সাজা দাও। নিরপরাধীকে ক্ষমা করো। কিন্তু পারি নি বাবা। কে যেন আমার গলা টিপে ধরে বলেছে ঃ এই তো তার শাস্তি, তার প্রাপ্য। এ থেকে তার মুক্তি নেই।

পৃথ্বীশ।। (দীর্ঘশ্বাস) হুম্। নিয়তির অভিশাপ।

দৃশ্যান্তর

আদালত। জনতার গুঞ্জন।

বিচারক।। (হাতুড়ির শব্দ) অর্ডার। অর্ডার!

উকিল।। এই মামলার প্রধান সাক্ষী হলেন মৃত কালীনাথের স্ত্রী, ব্রজরানি দেবী। তাঁরই চোখের সামনে হত্যাকাণ্ড হয়েছে। ঘটনা ঘটেছিল চারবছর

আগে। মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্যে আসামি এই চারবছর উন্মাদাগারে ছিল। এখন সুস্থ হয়েছে। এই চার-বছরে ব্রজরানির শরীর, মন শীর্ণ-বিপর্যস্ত অবসন্ন হলেও ওই হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি, বরং তাঁর হৃদয়ে তা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। স্বামীহত্যার বিচার-প্রত্যাশায় এই চারবছর তিনি বহু বিনিদ্র-রজনী যাপন করেছেন। আর সাক্ষী যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্নবিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাঁদের সহযোগিতায় পাওয়া পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে শুরু করে তদন্তকারী দারোগার ডাইরিসহ যাবতীয় প্রমাণপত্র আমি মাননীয় ধর্মাবতারের কাছে দাখিল করেছি। যে বন্দুকটি দিয়ে হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছিল, এগজিবিট হিসেবে সেটিও আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। এখন ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারামতে আক্রোশবশত ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত আসামিকে সঠিক দণ্ড দেওয়া হোক, ধর্মাবতারের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।

দৃশ্যান্তর

পৃথ্বীশ।। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না বেয়াইমশাই, অনন্তর পক্ষে বড়ো ব্যারিস্টার দিয়েছি যখন—

রাসবিহারী।। সে সব আমি ভাবছি না বেয়াইমশাই। আপনার যা কর্তব্য আপনি করেছেন। আমি ভাবছি এই অসহায় মেয়ে দুটি, মীনা-মা আর ব্রজরানির কথা। মীনামার জন্যে আমার দুঃখের অবধি নেই, আর ব্রজরানির কথা ভাবলে আমি চোখে অন্ধকার দেখি। অনন্ত যদি মুক্তি পায় ভালো, কিন্তু এতে ওর প্রায়শ্চিত্ত কি হবে?

দৃশ্যান্তর

আদালত কক্ষে জনতার গুঞ্জন।

উকিল।। আপনার নাম?

ব্রজ।। শ্রীমতী ব্রজরানি দেবী।

উকিল।। কালীনাথ ঘোষাল আপনার কে হন?

ব্রজ।। আমার স্বামী।

উকিল।। আপনার স্বামী খুন হয়েছেন, এ কথা কি সত্যি?

ব্রজ।। হ্যাঁ, বন্দুকের গুলিতে খুন হয়েছেন।

উকিল।। কে খুন করেছে আপনি কি জানেন?
ব্রজ।। জানি।
উকিল।। তাকে চিনতে পারবেন দেখলে?
ব্রজ।। পারবো।
উকিল।। ওই যে কাঠগড়ায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন তো— সেই-ই আসামি কিনা? (ধমক দিয়ে) এ্যাই, মুখ তোলো। সোজা হয়ে দাঁড়াও।

স্বরোদ-সেতারে যুগলবন্দী ঝালা।

ব্রজ।। (স্বগত) এ কে? কে ওই লোকটা? ওকি সেই বীভৎস রাক্ষস? আমার স্বামীহন্তা অনন্ত? এরই শাস্তির জন্যে কি আমি চারবছর ধরে সময় গুনেছি? ওকি কোনো জ্যান্ত মানুষ? নাকি মানুষের পোশাক পরা কোনো কঙ্কাল? মাথার চুলগুলো প্রায় উঠে গেছে— যেটুকু আছে তাও রোগে যন্ত্রণায় শাদা। সেই ভয়ংকর লাল চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। এখন নিভে যাওয়া কী অসহায় চোখ! কোনো দৃষ্টি নেই, প্রাণ নেই, আশা নেই। কারা এমন করে দুমড়েমুচড়ে ভেঙে দিলো ওই দৈত্যের মতো মানুষটাকে? বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই, ওই দীন ভিক্ষুক জগতের কাছে এখন কাঙালের মতো কী চাইছে? প্রাণ? হায়রে, এ কাকে ঘাতক বলে বেঁধে এনেছে ওরা? হতভাগ্য এই মানুষটাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর এত আয়োজন কেন? ও কী আর সত্যিই বেঁচে আছে?
উকিল।। ভালো করে দেখুন। চিনতে পারছেন?
ব্রজ।। না।
উকিল।। (মৃদু হাসে) পারবেন, পারবেন। অনেকটা বদলে গেলেও আর একটু ভালো করে দেখুন, ঠিক চিনতে পারবেন।
ব্রজ।। না না—
উকিল।। (বিরক্ত) না মানে কী? এ কি সে নয়? ও আপনার স্বামীকে খুন করেনি?
ব্রজ।। না।
উকিল।। আশ্চর্য! আপনার স্বামীহন্তাকে চিনতে পারছেন না কেন? এই তো সেই অনন্ত চট্টোপাধ্যায়! এর নামেই তো খুনের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছিলেন? ভালো করে ভেবে উত্তর দিন। বলুন, চিনতে পেরেছেন? এই সেই হত্যাকারী। বলুন—
ব্রজ।। (চিৎকার করে) না-না-না—(সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি হয়) না-না-না—না-না-না—না-না-না—

দৃশ্যান্তর

একটা মোটরগাড়ি চলে যাবার শব্দ। এস্রাজে করুণ সুর বাজে।

পৃথ্বীশ।। মীনা—

মীনা।। বাবা?

পৃথ্বীশ।। ওখানে কী করছিস মা?

মীনা।। কিছু না বাবা। চলে যাবার আগে ব্রজদিদি এই মাটির উপর একটুকাল দাঁড়িয়েছিলেন। সেই মাটির ধুলো একটু মাথায় মেখে নিলাম।

অ ভি ন য়া ং শে

ধীমান চক্রবর্তী, গৌতম বসু, সার্থকানন্দ রায়, রানা বসু, কৌশিক সেন,
পার্থসারথী দেব, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ধীরা রায়, সবিতা বসু,
সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, রীতা দত্ত চক্রবর্তী,
শিপ্রা লাহিড়ী, কেতকী দত্ত
প্রযোজনা / বিশ্বনাথ দাস
আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত

শি মু ল কাঁ টা

গণেশ. দিগম্বর. বিধু. বিভাবতী

কাক ডাকছে সমস্বরে। বাসা থেকে শাবক পড়ে গেলে যেমন সমবেত কাকের দল আর্ত চিৎকার করে তেমনি। অদূরে কোথায় যেন একটি নিঃসঙ্গ বাছুর ডেকে চলেছে। সব মিলিয়ে চারদিকে কেমন এক অসহায়তার সুর।

গণেশ।। পেন্নাম হই হুজুর—

দিগম্বর।। কে রে? গণেশ নাকি? আয় আয় বাবা— বোস। যা ঝড় গেল তোর উপর দিয়ে! তা কেমন আছিস এখন?

গণেশ।। আছি হুজুর। আপনাদের বাপমায়ের আশীর্বাদে আবার দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি।

দিগম্বর।। এই যে এতটা পথ হেঁটে এলি— কষ্ট হয়নি তো?

গণেশ।। উপায় কী হুজুর? ২৫ / ২৬ দিন পরে আজ প্রথম বাইরে বেরোলাম, একটু কমজোরি তো লাগবেই। কপালের রগদুটো দপদপ করছিল মাঝে মাঝে। তা পথে একটা গাছতলায় খানিক জিরিয়ে নিতেই আবার সব ঠিক হয়ে গেল ঠাকুরের দয়ায়—

দিগম্বর।। তেমন তেমন বুঝলে আরো দিনকয়েক না হয় জিরিয়ে নিতে পারতিস? আমি যেমন ঠিকে লোক দিয়ে চালাচ্ছিলাম, তেমনি চালিয়ে নিতাম কটা দিন?

গণেশ।। কিন্তু আমার যে না-চলা অবস্থা হুজুর। গরিবের ঘরে রাজরোগ। আমি কী আর বেঁচে আছি? এখন আপনিই ভরসা।

দিগম্বর।। তাতো বুঝলাম। কিন্তু পুজো আসছে। কাপড়চোপড়ের দোকান, কাজের চাপ বাড়বেই। এই রোগা শরীরে সামলাতে পারবি তো?

গণেশ।। গায়ে কাদা মেখে বসে থাকলে যমরাজ কি ছাড়বে হুজুর? গরিব বলে পোড়া পেট তো খাতির করবে না? দেনায়-দেনায় এখন আমার ডুবজল। উঠে যখন দাঁড়িয়েছি একবার— সব দিক সামলে নেবো হুজুর, আপনি দেখে নেবেন?

দিগম্বর।। (চিন্তিত) পারলেই ভালো। তোরা আমার পুরোনো কর্মচারি। বিশ্বাসী লোক! তোদের কী আর বসিয়ে দিতে মন চায়? কিন্তু আমার অবস্থাটাও তো বিবেচনা করবি? ভিড়ের সময়ে শরীর খারাপ বলে খদ্দের তো আর খাতির করবে না বাবা? অত ধকল যদি না সয় তখন— তাই বলা আর কী!

গণেশ।। কথায় বলে শরীরের নাম মহাশয়— সইয়ে নিলে সবই সয়ে যাবে। বসে খাবার কপাল নিয়ে তো জন্মাইনি হুজুর? আমি বসে থাকলে আর একটা মানুষ যে অকূলে ভেসে যায়! অনাহারে মরে হুজুর?

দিগম্বর।। তা বটে। তোর বউটা বাপু বেশ সতীলক্ষ্মী। বলতে নেই, ওর শাঁখা-সিঁদুরের জোরেই তুই আবার ফিরে এলি বাবা। নইলে ডাক্তার মিত্তিরের মতো মানুষ— হেঁজিপেঁজি তো নয়? শহরের এক নম্বর ডাক্তার, ১৬ টাকা ভিজিট, তাঁরও কিনা মাথা ঘুরে গিয়েছিল তোর অবস্থা দেখে? পরিষ্কার বললেন, ২৫/২৬ বছরের ছেলের এমন রক্তচাপ তো আমি জীবনে দেখিনি মশাই? এ একটা অভিজ্ঞতা!

গণেশ।। ডাক্তারবাবু ধন্বন্তরি। বউও আমার সতীলক্ষ্মী হুজুর। ওনার ওষুধে, বউয়ের সেবাযত্নেই এ যাত্রা প্রাণে বেঁচেছি— কিন্তু ধনে মরেছি। ঘরে আজ আর কুটোদানাও নেই যে পথ্যি করি। এখন আপনার ছিচরণই ভরসা।

দিগম্বর।। (ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত) দ্যাখ গণেশ, তুই ছিলি না বলে একটা লোককে তো পুরো বেতন দিয়েই আমাকে পুষতে হয়েছে? তোর কথা অবিশ্যি আলাদা। অনেকদিন আছিস, বিপদে পড়েছিস, উপায় কী? ... ঠিক আছে, পনের দিনের মাইনে নিয়ে যা। অমনিই দিলাম। একেবারে পয়লা তারিখেই আসিস। ভাঙা মাসে আর দরকার নেই। দুদিন আরামজিরাম করে ভাঙা শরীরটা সারিয়ে নে বাবা— জয়গুরু, জয়গুরু।

দৃশ্যান্তর

বিকেলে ঘরে ফেরা পাখিদের কলরব।

গণেশ।। (কড়া নাড়ার শব্দ) বিভা— ও বিভা— বিভাবতী—

বিভা।। (ভিতর থেকে) যাই—। (দরজা খোলার শব্দ) কীগো, কেমন ছিলে সারাদিন?

গণেশ।। ভালো ভালো। নে, ধর দিকিনি এগুলো—

বিভা।। ও বাবা! এত সব কী? এসো, ভেতরে এসো।

গণেশ।। লাউ বেগুন কুমড়ো কাঁচকলা— এইসব আনাজপত্তর আরকি। গিন্নিমাকে পেন্নাম করতে গিয়েছিলাম তো? তা বললেন— অ্যাদ্দিন পরে এলে গণেশ, খালি হাতে যাবে কেন? এটুকুন নিয়ে যাও। এ সব আমাদের বাগানে ফলেছে।

বিভা।। তা ভালোই হলো। কটা দিন বেশ চলে যাবে। ... তা হ্যাঁগো, মনিব কী বললেন? তোমায় দেখে খুশি হয়েছেন তো?

গণেশ।। হয়েছেন বইকি? উনি তো ভগবানের মতো মানুষ। বললেন, আর কটা দিন বিশ্রাম করে শরীরটা ভালো করে সারিয়ে নাও গণেশ। মাস পয়লা থেকে এসো। কামাইয়ের মাইনেও পুরো কাটেন নি— পনের দিনের দিয়েছেন!

বিভা।। যাক, এবার হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসো দিকি। আহা, রোগা মানুষ, মুখখান শুকিয়ে গেছে একেবারে!

পাখিদের কলকাকলি আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দূরে কে যেন গ্রাম্য সুরে বাঁশী বাজাচ্ছে।

গণেশ।। তুই আমাকে খুব ভালোবাসিস, না বিভা?

বিভা।। ওমা, ও আবার কী কথা? সোয়ামিকে ভালোবাসবো না তো কাকে বাসবো?

গণেশ।। মনিব বলছিলেন— তোর বউটা সতীলক্ষ্মী গণেশ। ওর শাঁখা-সিঁদুরের জোরেই তুই আবার খাড়া হয়েছিস।

বিভা।। বিপদতারিণী মায়ের থানে মানত করেছিলাম না? কাল মঙ্গলবার, পুন্নিমে। চলো না গো, দুজনে মিলে মাকে পুজোটা দিয়ে আসি?

গণেশ।। তা বেশ তো, গেলেই হয়। ... নে, তুই এবার ভাত বাড়, আমি হাত মুখটা ধুয়ে আসি। খিদেয় আমার পেটে এখন রাবণের চিতে জ্বলছে।

দৃশ্যান্তর

ঝিঁঝির ডাক। দূরে কোথায় কুকুর ডাকছে।

বিভা।। কী গো, ঘুমোলে নাকি?

গণেশ।। না। কপালের রগ দুটো আবার কেমন যেন দপদপ করছে। ঘুম আসছে না।

বিভা।। একটু দাঁড়াও, এক্ষুনি আসছি। আস্তে আস্তে টিপে দেবো— ভালো লাগবে। ঘুম এসে যাবে দেখো?

গণেশ।। না না— কিচ্ছু করতে হবে না। চুপচাপ একটুকাল শুয়ে থাকলে এমনিতেই কমে যাবে। সকালে দোকানে যাবার সময়েও তো একবার হয়েছিল। গাছতলায় বসে খানিক জিরিয়ে নিতেই আবার ঠিক হয়ে গেল। এসব অসুখে এমনিই হয়।

বিভা।। তোমায় বলেছে! তার মানে তো অসুখটা এখনও সারেইনি ভালো করে। অথচ চিকিচ্ছে তো কম হলো না? শহরের অতবড় নাম করা ডাক্তার দেখে গেলেন... তো যে কে সেই! এমনই পোড়াকপাল করে এসেছি, এই শরীর নিয়েও ঘরের মানুষটাকে মরতে মরতে কাজে পাঠাতে হবে!

গণেশ।। পাগলের মতো বকিসনে তো? সেরে না উঠলে কি দু-ক্রোশ রাস্তা অমনি হেঁটে যেতে আসতে পারতাম? প্রথম প্রথম একটু-আধটু উপসর্গ তো থাকবেই। সামান্য জ্বরজারিতেই বলে কত কাহিল করে মানুষকে— আর এ তো হলো গে রাজব্যাধি। এ সব বড়োলোকের ব্যারাম। এর মেজাজই আলাদা! ভাবিস নে, আয়-- শুবি আয়। কদিন শুয়ে-বসে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখিস?

দূরে কোথায় যেন 'বৌ কথা কও' পাখি ডাকছে। আবহসংগীতে কালক্ষেপ। রোমাণ্টিক আমেজ প্রকাশ পাচ্ছে। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে।

বিভা।। আজ কী জোছনা ফুটেছে দ্যাখো? যেন ফিনিক দিচ্ছে! ওই বাতাবি গাছটার ফাঁক দিয়ে কেমন উঠোনে ছড়িয়েছে?

গণেশ।। তোর মুখেও তো পড়েছে জানলা দিয়ে। তুই দেখতে পাচ্ছিস না। তোকে ঠিক পরির মতো দেখাচ্ছে বিভা।

বিভা।। ইস, পরি না ছাই। তুমি পরি দেখেছ কখনও?

গণেশ।। (হাসে) এই তো দেখছি, আমার সামনে।

বিভা।। (লজ্জা পায়) আহা ঢঙ! ... জানো, দাদা এসেছিল আজ?

গণেশ।। তাই? তা ধরে রাখলিনি কেন? বেশ জমিয়ে গপ্পোসপ্পো করা যেত?

বিভা।। বলেছিলাম তো? তা বললে, কী নাকি জরুরি কাজ আছে। অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হবে। চলে গেল।

গণেশ।। তা কী-কী গল্প হলো?

বিভা।। কী আর? এইসব ঘরগেরস্থালির কথা। হারুকাকা আমাদের ভাগের

পুকুরের মাছ ধরে নাকি বেচে দিয়েছে— তাই নিয়ে অশান্তি। ... এবারের বর্ষায় অনেক ধানের চারা নষ্ট হয়েছে— মায়ের অম্বলের ব্যথাটা আবার নাকি চাড়া দিয়েছে— কোবরেজ দেখাচ্ছেন এখন— সুমির সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে— এই সব সাতসতেরো কথা। ... জানো, আমার বালাজোড়ার কথাও জিগ্যেস করছিলেন দাদা।

গণেশ।। এ্যাঁ?

বিভা।। হ্যাঁগো। বলছিল, তোর হাতখালি কেন রে? বালাজোড়া কী হল?

গণেশ।। কী বললি তুই?

বিভা।। বললাম, ভেঙে গড়াতে দিয়েছি। নতুন প্যাটার্নের—

এমন একটা যন্ত্রসংগীত শোনা যাবে যা গণেশের মর্মজ্বালার মর্মান্তিক প্রকাশ। 'বালা'প্রসঙ্গ উঠলে প্রত্যেকবারই এই বাজনাটি বাজবে।

গণেশ।। (দীর্ঘশ্বাস) কেন শুধু শুধু মিছে কথা বলতে গেলি বিভা? সত্যি বললেই পারতিস— যে আমার রাজরোগের চিকিৎসায় তোর শেষ সম্বলটুকুও আমি ঘুচিয়েছি?

বিভা।। ও আবার কী কথা? মেয়েদের গয়নাগাটি তো বিপদ-আপদে সংসারের কাজে লাগবে বলেই গো? মা চিন্তা করবেন— তাই দাদাকে তোমার অসুখের খবর জানাইনি।

গণেশ।। সত্যি বাপু, এইটুকুন তো মানুষ তুই। মোটে ষোলো বছর বয়েস। গিন্নিবান্নির মতো এত কথা শিখলি কোথায়?

বিভা।। আমার কেমন লজ্জা করছিল, জানো? তাছাড়া বাপের বাড়িতে ছোটো হতেই বা যাবো কেন, বলো? দিন তো পড়েই আছে। সময়সুযোগ মতো একদিন গড়িয়ে নিলেই হবে?

দৃশ্যান্তর

দিনেরবেলার মন্দিরের পরিবেশ। শংখঘন্টাধ্বনির মধ্যে ভক্তমণ্ডলীর অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা যায়। হঠাৎ বিপদতারিণীর নামে জয়ধ্বনি ওঠে।

বিভা।। কই গো, এই নাও প্রসাদীফুল— কপালে ঠেকাও দেখি? ... আহা, মা বিপদতারিণীর দয়াতেই আবার তোমাকে ফিরে পেলাম। নইলে সবাই যা বলাবলি করছিল, আমি তো ভয়েই কাঁটা।

গণেশ।। মরণবাঁচনের কথা কি কেউ বলতে পারে বিভা? সবই ওপরওলার মর্জি। তিনি দয়া করলেন, টিকে গেলাম! তুই মানত করেছিলি, তোর কথাও

রাখা হল— এইটুকুই আমার শাস্তি। চল, এখন তাহলে বাড়ি যাই?

বিভা।। হ্যাঁ, চলো।

মন্দিরের পরিবেশের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে।

গণেশ।। হ্যাঁরে বিভা, ওই বউটা কে রে, যার সঙ্গে কথা বলছিলি? খুব ঘটাপটা করে পুজো দিচ্ছিল দেখলাম?

বিভা।। ওই লালশাড়ি পরা? ওতো মিত্তিরদের বাড়ির বউ। যমুনা। আমার সঙ্গে খুব ভাব। একই বয়েসি তো? বড়োলোক বলে কিন্তু একটুও দেমাক নেই। ... জানো, ওর জন্যে কী চমৎকার একজোড়া বালা গড়েছে বিধু স্যাকরা! দেখলে চোখ জুড়োয়।

গণেশ।। (বিষণ্ণ) তাই?

বিভা।। হ্যাঁগো, যেমন পালিশ, তেমনি গড়ন। চোখ ঝলসে যায়—

আগের সেই বালাসংক্রান্ত বাজনাটি বেজে ওঠে।

দৃশ্যান্তর

স্যাকরার দোকানের গয়না তৈরির ঠুকঠাক শব্দ শোনা যায়।

গণেশ।। (বাইরে থেকে) বিধুখুড়ো আছো?

বিধু।। কে, গণেশ নাকি? এসো এসো। কী খবর হে— হঠাৎ? শরীরগতিক ভালো তো?

গণেশ।। এই চলে যাচ্ছে খুড়ো— মন্দের ভালো।

বিধু।। বোসো। শরীরের আর দোষ কী? যা ধকলটা গেল। আগের মতো হতে সময় নেবে। তবে সারা জীবনই সাবধানে থাকতে হবে— ধরাকাটের মধ্যে।

গণেশ।। হ্যাঁ, ডাক্তারবাবুও তাই বলেছেন। তবে আমাদের মত গরিবগুর্বোর ঘরে কদ্দিন যে পারবো। কেটে তো গেল মাসদুয়েক ভালোয় ভালোয়।

বিধু।। তবু যতটা সাবধানে থাকা যায়। বুঝি তো সবই—

গণেশ।। ভালো কথা, যে জন্যে আসা। কর্তা একবার দেখা করতে বলেছেন গো তোমাকে।

বিধু।। আড্ডিমশাই?

গণেশ।। হ্যাঁ, সুযোগমতো যেয়ো একবার।

বিধু।। যাবো যাবো। নিশ্চয়ই যাবো।

স্যাকরা-ঘরের ঠুকঠুক শব্দ আবার স্পষ্ট হয়।

গণেশ।। (একটুকাল বিরতির পর) ওটা কী গড়ছ গো? বালা? বাঃ!

বিধু।। হ্যাঁ, এ হল 'শিমুলকাঁটা' নকসা। খুব চল উঠেছে এবারে। দত্তবাবুর মেয়ের বিয়ে তো? ওর জন্যেই বানাচ্ছি।

গণেশ।। আচ্ছা খুড়ো, একজোড়া বালা গড়তে কী রকম খরচা পড়ে? মানে, একটা আন্দাজ আর কী—

বিধু।। (হাসে) বালা গড়াবে? তা বেশ তো— দেবো গড়িয়ে ভালো করে। তোমার বউয়ের বালাজোড়া তো আমার কাছেই বিক্রি করেছিল তোমার অসুখের সময়ে—

গণেশ।। হ্যাঁ, ও-জোড়া ওর বাপের বাড়ি থেকে দিয়েছিল বিয়েতে। এত খারাপ লাগে... খালি হাতে ঘুরে বেড়ায়! আর এমন মেয়ে, মরে গেলেও তো মুখ ফুটে কিছু বলবে না?

বিধু।। আহা, বড়ো লক্ষ্মীমন্ত বউ গো তোমার গণেশ। ছেলেমানুষ, অথচ কী দায়িত্বজ্ঞান? বলতে গেলে, যমের মুখ থেকেই তো ছিনিয়ে এনেছে তোমাকে। ... তা কত ভরির হবে?

গণেশ।। এই যেমন হলে মানানসই হয়—

বিধু।। যত কমই করি, একটু মজবুত করে গড়তে গেলে ভরি-দুয়েকের কমে হয় না। তা ধরো, খুব কম করে ধরলেও শ-দুয়েক টাকার নিচে হবে না। সোনার দর যা বাড়ছে এখন হু হু করে!

গণেশ।। তা বটে। (দীর্ঘশ্বাস) আচ্ছা— চলি গো খুড়ো, আবার দোকান খোলার সময় হলো—

বিধু।। এসো। একটু সাবধানে থেকো গণেশ। আর আড্ডিমশাইকে বোলো— এই হাতের কাজটা মিটলেই আমি যাচ্ছি। দুগ্গা দুগ্গা।

দৃশ্যান্তর

আবার রাতের পরিবেশ আগের মতো।

গণেশ।। কী রে বিভা, পুজো বলে গিন্নিমা যে শাড়িখানা পাঠালেন, পছন্দ হয়েছে তোর?

বিভা।। খুউব। ভারি সুন্দর নকসা পাড়টায়। জমিনেও কী চমৎকার লাল ডুরে। খোপের মধ্যে আবার ছোটো-ছোটো ফুল। বিয়েবাড়ি যাবার সময়ে পরে যাবো।

গণেশ।। (অবাক) বিয়ে বাড়ি? কার বিয়ে?

বিভা।। (উচ্ছ্বসিত) ওমা, তোমাকে তো বলাই হয়নি! আমার ছোটোবোন সুমির বিয়ে ঠিক হয়েছে যে? আজ দাদা এসে নেমন্তন্ন করে গেছেন তোমাকে-আমাকে।

গণেশ।। কবে?

বিভা।। এইতো— মাঝে আর মোটে দশটা দিন আছে। মা বারবার করে বলে দিয়েছেন। দাদা বললে, একটা গাড়ি ভাড়া করে যাস— ওখানে গেলে আমি ভাড়া দিয়ে দেবো।

গণেশ।। বেশ তো!

বিভা।। আমি ভাবছি, যাবো না।

গণেশ।। (হাসে), কেন, কিছু দিতে হবে বলে?

বিভা।। না। গেলেই তো মা আবার বালার কথা জিগ্যেস করবেন—

বালাপ্রসঙ্গের সেই যন্ত্রসংগীতটি আবার তীব্র হয়।

দৃশ্যান্তর

দিনেরবেলার পরিবেশ। দোকানের গুঞ্জন।

দিগম্বর।। ওরে হরি, বিষ্টু নগেন— আজ কিন্তু হাটবার, তায় আবার পুজো আসছে। নতুন ধুতিশাড়িগুলো সব ভালোকরে গোছ করে রাখ বাবা। খদ্দেরের ভিড় বাড়লে তখন কিন্তু দিশে পাবিনে বলে রাখলাম।

গণেশ।। হুজুর—

দিগম্বর।। কিরে গণেশ, কিছু বলবি মনে হচ্ছে?

গণেশ।। আজ্ঞে, একটা আর্জি ছিল হুজুর।

দিগম্বর।। কী আর্জি! ছুটি চাই? শুনলুম তো তোর শালির বিয়ে— শ্বশুরবাড়ি যাবি?

গণেশ।। আজ্ঞে না হুজুর। এখন পুজোর মুখে দোকানে কাজের চাপ। এসময়ে কি দোকান ফেলে কোথাও যাওয়া চলে?

দিগম্বর।। ভালো ভালো। তোর এই বুঝটুকু যদি সকলের থাকতো রে বাবা! ওরে, ব্যবসাটা আমার হতে পারে, কিন্তু এটা ঠিকমতো চললে তোরাও তো বাঁচবি, না কী? আমি তো আর একা খাবো না? তা সে কথা আর কেই বা ভাবছে (দীর্ঘশ্বাস) যাক, কী বলবি বল।

গণেশ।। আমাকে শ-দুয়েক টাকা ধার দেবেন হুজুর?

দিগম্বর।। (অবাক) দু — শো টাকা? বলিস কী? অত টাকা দিয়ে কী করবি?

গণেশ।। একটা জরুরি দরকার ছিল হুজুর।

দিগম্বর।। তাতো বুঝলাম। কিন্তু শুধবি কী করে?

গণেশ।। মাইনে থেকে মাসে মাসে কাটিয়ে দেবো হুজুর।

দিগম্বর।। (হাসেন) মাইনে তো পাস সাকুল্যে দশটি টাকা। তা থেকে আর কত কাটাবি? পাগল না খ্যাপা! গয়নাটয়না কিছু বাঁধা রাখতে পারিস তো না-হয় চেষ্টা করে দেখবো। (বাইরে গলা খাঁকারি শব্দ শুনে) কে ওখানে?

বিধু।। (বলতে বলতে আসে) আজ্ঞে, আমি বিধুভূষণ হুজুর। খবর পাঠিয়েছিলেন?

দিগম্বর।। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো। শোনো বিধু, বৌমা ঝোঁক ধরেছেন, নতুন ফ্যাশানের কী বালা বেরিয়েছে– শিমুলকাঁটা না কী– তাই গড়িয়ে দিতে হবে।

বিধু।। আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব চল হয়েছে হুজুর। মিত্তিরমশাইয়ের ছেলের বউয়ের জন্যে আমিই তো বানিয়ে দিয়েছি। দত্তবাবুর মেয়ের জন্যেও বানালাম–

দিগম্বর।। বেশ বেশ। তা দিতে যখন হবে, তখন বউমার হাতের মাপটা ভালো করে দেখেশুনে নাও। দেখো, প্যাটার্নের যেন গোলমাল না হয়। ঠিকঠাক বুঝে এসো। গণেশ, বিধুকে একটু বাড়ির ভিতরে নিয়ে যা–

গণেশ।। আজ্ঞে। এসো খুড়ো–

দৃশ্যান্তর

আবার সেই রাতের পরিবেশ। ঝিঁঝির শব্দ।

বিভা।। হ্যাঁগো, একটা জিনিস দেখবে?

গণেশ।। কী?

বিভা।। এই দ্যাখো না?

গণেশ।। এ কী! এতো একজোড়া বালা দেখছি!

বিভা।। এর নাম শিমুলকাঁটা বালা।

গণেশ।। কোথায় পেলি?

বিভা।। যেখানেই পাই। দেখতে ভালো না?

গণেশ।। কই দেখি? ... বাঃ। ভারি সুন্দর। মিত্তিরদের বুঝি?

বিভা।। হ্যাঁ, যমুনার। তোমাকে দেখাতে এনেছি। আমাদের দুজনার হাতের মাপও এক। এই দ্যাখো, পরছি। ... য়্যা– এই। দ্যাখো তো?

গণেশ।। (মুগ্ধ) বাঃ!

বিভা।। তবে কী জানো– শিমুলকাঁটা গড়ন তো? কাঁটাগুলোয় বড্ডো ধার। একবার অসাবধানে খোঁচা লাগলে কাপড়চোপড় ছিঁড়তে পারে।

গণেশ।। তা হবে। তবে তোর হাতে যা মানিয়েছে রে বিভা, দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে!

দৃশ্যান্তর

সকাল। দূরে কোথায় যেন একটা কাক ডাকছে।

দিগম্বর।। এসেছিস গণেশ? আয় আয়— বোস। তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

গণেশ।। বলুন হুজুর।

দিগম্বর।। শরীরটা আমার ভালো নেই বাবা, নইলে নিজেই যেতাম। অথচ শীতলবাবুকে কথা দিয়েছি। ব্যবসায় কথার খেলাপ, মানে বুঝিস তো? কারবারের সুনাম নষ্ট। আমার এতকালের ব্যবসায় তা কি পারি, বল? তাই তোকে ভেতর-বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছি।

গণেশ।। আপনি হুকুম করুন হুজুর।

দিগম্বর।। এই হাজারটা টাকা ওঁকে পৌঁছে দিতে হবে গদিতে। পারবি না? তুই আমার কতদিনের পুরোনো কর্মচারি, তোকে ছাড়া কারও ওপর এতটা ভরসা করতে পারিনে বাবা।

গণেশ।। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর। আমি ঠিক পৌঁছে দিয়ে আসবো।

দিগম্বর।। বাঁচালি বাবা। খুব সাবধানে যাবি কিন্তু? অতগুলো টাকা! দিনকাল তো ভালো নয়। গেঁজেয় ভরে কোমরে বাঁধবি— কাপড়ের নিচে।

গণেশ।। কিচ্ছু ভাববেন না হুজুর— কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। শীতলবাবুকে দিয়ে একখানা রসিদও লিখিয়ে আনবো আসার সময়ে।

দিগম্বর।। তাহলে এখান থেকেই খেয়েদেয়ে রওনা দে— যাতে বেলাবেলি পৌঁছতে পারিস। আজ আর দোকানে ফিরতে হবে না। কাল সকালেই আসিস বরং।

দৃশ্যান্তর

রাত। মৃদু মেঘ ডাকছে মাঝে মধ্যে।

বিভা।। কী গো, আবার শরীর খারাপ লাগছে নাকি তোমার?

গণেশ।। কেন বলতো?

বিভা।। না, কেমন চুপচাপ খেয়ে উঠলে! মুখখানা থমথম করছে—

গণেশ।। ও কিছু না। রগের শিরাদুটো মাঝেমধ্যে কেমন দপদপ করে— খানিক পরে আবার নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়। (মৃদু মেঘের ডাক) আজ কেমন যেন মেঘলা হয়ে রয়েছে সারাটা দিন, না? থমথম করছে আকাশটা।

বিভা।। হ্যাঁ। কী জানি, হয়তো ভোর রাতে বৃষ্টি নামবে।

গণেশ।। বেশ চমৎকার একটা গন্ধ আসছে না?

বিভা।। ওমা, শিউলি ফুটছে যে! পুজো আসছে না? মা বলতো— এই শিউলির গন্ধেই নাকি মায়ের আগমনির খবর আসে।

স্বল্প বিরতির আবহসুর।

গণেশ।। পিদিমটা একটু কাছে আনো তো বিভা।

বিভা।। কেন?

গণেশ।। আনোই না। একটা জিনিস দেখাবো।

বিভা।। এই তো আনলাম। কী দেখাবে গো?

গণেশ।। (কাগজের শব্দ) এই দ্যাখ।

বিভা।। (অবাক ও উচ্ছ্বসিত) ও— মা! শিমুলকাঁটা বালা! হ্যাঁগো, আমার জন্যে গড়ালে? কই, আগে বলো নি তো? টাকা পেলে কোথায়?

গণেশ।। আগে পরে দ্যাখা তো। ... কই, দেখি দেখি। ... বাঃ! চমৎকার মানিয়েছে। ঠিক যেন পরির হাত।

বিভা।। ওই শিশিতে আবার কী এনেছ?

গণেশ।। ল্যাভেণ্ডার। বিছানার চারদিকে ছিটোবো। সুন্দর গন্ধ ছড়াবে দেখিস—

দৃশ্যান্তর

রাত গভীর। ঝিঁঝির ডাক। যন্ত্রসংগীতে স্বপ্নের আমেজ।

গণেশ।। (আচমকা আর্তনাদ) উঃ! আঃ!

বিভা।। (চমকে) কী হলো গো? কী হলো?

গণেশ।। রগের কাছটায় লাগলো খুব। তোমার বালাটার খোঁচা লেগেছে বোধহয়।

বিভা।। সে কী?

গণেশ।। উঃ, এ তো রক্ত পড়ছে! রগের শিরাটা কেটে গেছে মনে হচ্ছে।... পিদিমটা জ্বালা তো শিগগির।

বিভা।। (দেশলাই জ্বালার শব্দ) ইস্, তাইতো! এ যে ফিনকি দিয়ে পড়ছে! ... দাঁড়াও দাঁড়াও, কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দিচ্ছি। ... কই, বন্ধ হচ্ছে না তো? রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে.... শক্ত করে চেপে ধরো দিকি— আমি একটু দুব্বো ঘাস নিয়ে আসি উঠোন থেকে। ভালো করে চিবিয়ে বেঁধে দিলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

যন্ত্রসংগীতে উৎকণ্ঠা। মেঘের ডাক। ঝড়ের শব্দ।

দৃশ্যান্তর

বৃষ্টি পড়ছে। দরজায় প্রবল কড়া নাড়ার শব্দ। বাইরে অনেকের উত্তেজিত স্বর।

বিভা।। (ভিতর থেকে) কে?

দিগম্বর।। দরজা খোলো—

দরজা খোলার শব্দ।

বিধু।। ওই দেখুন হুজুর— ওই যে বউটার হাতে দেখুন আমার সেই শিমুলকাঁটা বালা—

দিগম্বর।। তাইতো, আশ্চর্য! অথচ কাল তো শীতলবাবুর কাছে থেকে রসিদ এনে দিয়ে গেল....

বিধু।। কাল সন্ধেবেলায় এই বালা আপনার নাম করে চেয়ে নিয়ে এলো। আমি কী করে বুঝবো বলুন? পুরোনো বিশ্বাসী চাকর আপনার। ভাবতেই পারিনি যে—

দিগম্বর।। সেটি আছে, না পালিয়েছে?

বিধু।। কোথায় পালাবে? ওই তো খাটে চাদর মুড়ি দিয়ে মটকা মেরে রয়েছে। চলুন তো ভেতরে। ওর চালাকি আমি... (আর্তকণ্ঠে) এ কী!!

দিগম্বর।। (প্রবল মেঘগর্জনের পরে) কী হলো বিধু? আঁতকে উঠলে কেন?

বিধু।। গণেশ পালিয়েছে হুজুর। ... বড়ো সাধ ছিল, বউকে শিমুলকাঁটা বালা পরাবে। তা সেই সাধটুকু মিটিয়ে চোর পালিয়েছে হুজুর। এখানে যেটা পড়ে আছে সেটা... (রুদ্ধস্বরে) ওই গণেশেরই লাশ!

প্রবলবৃষ্টির শব্দের মধ্যে করুণ সুরে এস্রাজ বাজে।

অ ভি ন য়াং শে

কুমার রায়. শাঁওলি মিত্র. ফকিরদাস কুমার. শৌভিক সেনগুপ্ত

প্রযোজনা / বিশ্বনাথ দাস

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত

ভূত-ভবিষ্যৎ

প্রথম. দ্বিতীয়. গোপীদু[illegible] কমলা

মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে একটানা ঝিঁঝির গুঞ্জন ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। থানায় দেউড়ির পেটা ঘড়িটা দুবার ঢং ঢং শব্দে হঠাৎ প্রহর ঘোষণা করলো।

১ম।। ওরে বাবা, দুটো বেজে গেল যে! এত রাত হয়েছে এক্কেবারে খেয়াল করিনি! না না, আর নয়— এবার মোমবাতিটা নিভিয়ে শুয়ে পড়া যাক বাবা। ফুঃ! (বাতি নেভায়) কাল সকাল থেকে আবার না হয় ফ্রেশ মুডে শুরু করা যাবে। দুর্গা! দুর্গা!

অদূরে শেয়াল ডাকে! একক থেকে সমস্বরে। কিছু কুকুরের চিৎকার তাদের দিকে ধাবমান হয়ে ক্রমে মিলিয়ে যায়।

২য়।। ঘুমোলেন নাকি?

১ম।। কে?

২য়।। আজ্ঞে আমি।

১ম।। আমি তো আমিও। আপনি কে?

২য়।। কী বলে পরিচয় দিই বলুন তো? আসলে, কী বলবো— আমার পরিচয়ের ব্যাপারটাই যে একটু গোলমেলে!

১ম।। গোলমেলে?

২য়।। আজ্ঞে হ্যাঁ। যখন বেঁচেছিলাম, তখন অবিশ্যি একটা পরিচয় ছিল—

১ম।। বেঁচেছিলাম মানে? এখন তাহলে কি ভূত?

২য়।। তাও বলতে পারেন। বর্তমান যখন নই তখন তো—

১ম।। আশ্চর্য!

২য়।। তখন জানেন, নন্দদুলাল নন্দী বললে এক ডাকে সবাই আমাকে চিনতো?

১ম।। ও, জানলাম।

২য়।। দেখুন, ভূত হই আর যাই হই— দয়া করে আপনি ভয় পাবেন না। বিশ্বাস করুন, আমার কোনো বদমতলব নেই।

১ম।। থাকলেও আমার কিছু যায় আসে না। ভূতের সঙ্গে কখনও মোকাবিলা হয়নি বটে, তবে ভূত যে আসলে হাওয়া সেটা তো বিলক্ষণ জানি— কাজেই হাওয়া দেখে ভয় পাবো, অতটা গাঁড়োল আমি নই।

৩য়।। বটেই তো। এই সহজ ব্যাপারটা সবাই যদি বুঝতো! ভূত তো দূরের কথা, আচমকা কোনো ছায়া দেখলেই ভিরমি-টিরমি খেয়ে এমন দাঁত ছিরকুটে পড়ে—

১ম।। সে যাদের নার্ভ দুর্বল। যুক্তিজ্ঞান কম। ভূতে আমার ভয় নেই মশাই— আমার ভয় মানুষকে।

২য়।। যা বলেছেন। ভূতেরা বড়ো নিরীহ জীব। মানুষের মতো অত ফেরেববাজ নয়। যা দেখেছি দিনে দিনে...

১ম।। তবেই বলুন?

২য়।। তবে দুচারটে বিটকেল-খিটকেল ভূত যে থাকে না তা নয়, তবে তাদের আমরা বড়ো একট আমল দিইনে। শিক্ষাদীক্ষা না থাকলে যা হয় তাই আর কি, বুঝলেন না?

১ম।। বুঝলাম। তা হঠাৎ আমার কাছে, এই মাঝরাতে? কী মনে করে?

২য়।। তেমন কিছু না। আসলে একা একা ঘুরে বেড়াই। কথা বলার লোক পাই না তো? তা আপনি দেখলুম স্বজাতি— শিক্ষিত মানুষ— তাই....

১ম।। ও, সব খোঁজখবর নিয়েই এসেছেন?

২য়।। বিলক্ষণ! আলাপপরিচয় করতে গেলে শুলুকসন্ধান না নিয়ে কি এগোনো যায়? কেমন স্বভাবচরিত্র? মেজাজমর্জি কেমন? চালচলন আচারবিচারে মিলবে কি না— এই সব আর কী! হুটপাট গিয়ে তো আর একটা অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে ইয়ে করা চলে না বলুন? (দেশলাইয়ের শব্দ) ও কী? দেশলাই জ্বালছেন নাকি?

১ম।। একটা সিগারেট ধরাবো ভাবছিলাম। কেন আপত্তি আছে?

২য়।। ইয়ে, হঠাৎ আলো জ্বাললে একটু অসুবিধে হয়।

১ম।। ও— তবে থাক।

২য়।। কিছু মনে করলেন?

১ম।। আরে না না, এমনিতে কোন দরকারই ছিল না। আসলে আড্ডার মেজাজে ধরাতে যাচ্ছিলাম...! তা যাক সে কথা— আপনি কি কাছেপিঠে কোথাও থাকেন?

২য়।। কাছেপিঠে বলতে— ওই যে ওপাশে— ওই পাঁচিল ঘেরা বড়ো বাগানটা রয়েছে না? ওরই মধ্যে একটা বুড়ো নিমগাছ আছে— সেখানেই বসবাস।

১ম।। ওই নিকুঞ্জবাবুর বাগানে? (হাসে) তাহলে তো দেখছি, আমার মতো আপত্তিও ওনার ভাড়াটে?

২য়।। ভাড়াটে? (দীর্ঘশ্বাস)... দেখুন, ওই বাগান, এই বাড়ি তো একদিন আমারই ছিল— আজই না হয় নিকুঞ্জ পাল আমার প্রপৌত্র গোপীদুলালের কাছ থেকে কিনেছে— তাই বলে...

১ম।। প্রপৌত্র? তার মানে নাতির ছেলে? ... ওরে বাবা, তার মানে তো বেশ বয়েস হয়েছে আপনার?

২য়।। তা বলতে পারেন। সিপাহিযুদ্ধের সময়ের লোক তো? হ্যাঁ, তা অনেক দিনই তো হলো—

১ম।। সিপাহিযুদ্ধ? মানে মিউটিনি? ১৮৫৭? ওরে বাবা— সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

২য়।। উপায় কী? একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে যে! সেটা শেষ না করে...

১ম।। কাজ?

২য়।। হ্যাঁ, একটা জরুরি কাজ! বলবো, পরিচয় যখন হলো, ধীরে ধীরে সবই জানতে পারবেন।

১ম।। মঙ্গল পাঁড়ে, তাঁতিয়া টোপী, বাহাদুর শা, লক্ষ্মীবাঈ... বাপরে বাপ, সেই আমলের লোক কিনা আপনি? আশ্চর্য! ভালোই হলো। অনেক গল্প শোনা যাবে সেকালের— যাকে বলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

২য়।। বিলক্ষণ বিলক্ষণ! কত রকমের লোক দেখেছি মশাই, কত ঘটনা-দুর্ঘটনা নবাব-নাজির-সাহেব-মেম— সে ছিল একটা যুগ— বলবো বলবো, সব বলবো আপনাকে।

১ম।। সেকালে কী করতেন আপনি? মানে আপনার পেশা?

২য়।। মুৎসুদ্দি। মুৎসুদ্দির কাজে ঢুকেছিলাম— বলতে নেই, ভগবানের দয়ায় দুটো পয়সাও করেছিলাম তখন। যাক, সে সব জের টেনে আর কী হবে? গতস্য শোচনা নাস্তি।

১ম।। আপনার প্রপৌত্র সেই গোপীদুলালবাবু কি বেঁচে আছেন এখনও?

২য়।। আছেন— তবে না থাকারই মতো। বড়োই জরাজীর্ণ অবস্থা তার। কালব্যাধিতে ধরেছে।

১ম।। কী হয়েছে?

২য়।। হাঁপানি। বীভৎস। যখন টান ওঠে— চোখ দুটো তার যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে। বুকখানা তখন হাপরে মতো— আহাহা, চোখে দেখা যায় না মশাই... অত কষ্ট!

১ম।। ইস।

২য়।। শরীর তো নয়, যেন চামড়ায় ঢাকা খানকয়েক হাড়। তার ওপরে আবার গলার কাঁটা, ঘাড়ের ওপর সোমত্ত মেয়ে... টাকা নেই, পয়সা নেই, কী যে হবে তা ঈশ্বরই জানেন....

১ম।। যা ভবিতব্য হবেই, আপনি আর ভেবে কী করবেন ?

হাই তোলে। ঝিঁঝি-র মৃদু গুঞ্জন।

২য়।। তা বটে। ইস, আপনার যে হাই উঠছে?

১ম।। হ্যাঁ, রাত তো আর কম হয় নি। আড়াইটে বাজতে চললো।

২য়।। তবে আজ শুয়ে পড়ুন। পরে একদিন গপ্‌পোসপ্‌পো করা যাবে, কেমন? এখন আছেন তো কিছুদিন?

১ম।। কিছুদিন মানে, যে কদিন এই লেখার কাজটা শেষ না হয়, তদ্দিন তো আছিই।

২য়।। সত্যিই তো, কী লেখেন রোজ রোজ এত রাত জেগে?

১ম।। উপন্যাস।

২য়।। ঠিক বুঝলুম না?

১ম।। এই ধরুন, বানিয়ে বানিয়ে গল্পটল্প লিখি—

২য়।। গপ্পো?

১ম।। হ্যাঁ গল্প? অবাক হচ্ছেন? সে সব গল্প আবার বই হয়ে ছেপে বেরোয়— লোকে কিনে পড়ে। — বলতে নেই, আমার একটু নামডাকও আছে...

২য়।। কিতাব? কিতাব লেখেন আপনি? রূপকথা? ভালো ভালো। আমিও ছেলেবেলায় দু-চারখানা পড়েছি... সিন্ধুবাদের সমুদ্রযাত্রা— আরব্যরজনী— পঞ্চতন্ত্রম্— ভালো ভালো। বেশ নতুন ধরনের ব্যবসা আপনার! ঠিক আছে, অবসর মতো একদিন শোনা যাবে, কী বলেন?

১ম।। বেশতো, শেষ হোক আগে, তারপর না হয়...

হাই তোলে। দূরে শিয়ালের প্রহরকালীন ডাক।

২য়।। ওহো, আপনার বেশ ঘনঘন হাই উঠছে! এখন তাহলে বরং শুয়ে পড়ুন। কাল আসবো, কেমন? চলি?

১ম।। আসুন।

বাতাসের তীব্র শব্দ মিলিয়ে যায়। যন্ত্রসংগীতে লঘু সুর।

দৃশ্যান্তর

ঝিঁঝি ও প্যাঁচার ডাক। দূরে কয়েকটি কুকুর চিৎকার করছে।

২য়।। ব্যস্ত আছেন নাকি?

১ম।। আরে! আসুন আসুন নন্দীমশাই, বসুন।

কাগজপত্রের শব্দ।

২য়।। আপনি তো আশ্চর্য লোক মশাই? সবাই ভূত দেখলে আঁতকে ওঠে, আর আপনি খাতির করে বসাচ্ছেন? মোটেই গেরাহ্যি করেন না দেখছি!

১ম।। কী করে করবো বলুন? আমার যে বর্তমানটা ঘোলাটে আর ভবিষ্যৎটা অন্ধকার? কাজেকাজেই ভূতই আমার একমাত্র ভরসা, আশ্রয়ও বলতে পারেন।

২য়।। অদ্ভুত কথা তো! কী যে বলেন— সব সময়ে ঠিক ধরতে পারিনে। হবেই তো! রূপকথা লেখেন যে! ... আপনাদের ভাষাটাই কেমন যেন পিছল-পিছল—

১ম।। হা হা হা বেশ বলেছেন, ভাষাটাই পিছল পিছল! তাই বোধহয় ভাবটাকে সারাজীবন আর সাপ্‌টে ধরে রাখতে পারলুম না। তা যাক সে কথা, রোজ আসতে আসতে হঠাৎ কদিন ডুব দিলেন? শরীরটরির খারাপ করেনি তো?

২য়।। শরীর? হা হা মন্দ বলেন নি। শরীর...

১ম।। না, ভাবছিলাম সেদিন মনের ভুলে হঠাৎ সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছিলুম বলে বুঝি রাগ করলেন!

২য়।। রাগ? না না, রাগ নয়। দেশলাইয়ের আলোয় হঠাৎ চমকে গিয়েছিলুম। চমকে গেলে তো আর শরীরধারন করা যায় না? এই ক-টা দিন ধরে তাই বহু কষ্ট করে... আসলে বায়ুভূত শরীর তো? জলে ঢিল পড়ার মতো— একবার নাড়া খেলে আবার থিতিয়ে আসতে সময় লাগে।

১ম।। স্যরি, ভেরি স্যরি। আর জ্বালবো না।

২য়।। না না, জানা থাকলে এমনিতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। এইতো আপনার মোমবাতি জ্বলছে, আমিও আছি। জানা জিনিস তো? আলোর

কাছ থেকে একটু দূরে থাকলেই হলো?

১ম।। অস্বস্তি হলে বলবেন— নিভিয়ে দেবো।

২য়।। কোনো দরকার নেই। সয়ে গেছে অনেকটা। ... তা আপনার রূপকথা এগোলো কদ্দুর?

১ম।। আরো দিনপনেরো লাগবে মনে হয়। ফরমায়শি লেখা তো! কল্পনার পরি তো ইচ্ছে মতো ডানা মেলতে পারছে না— বেশি উড়তে গেলে পায়ে টান লাগে! দেখা যাক, কদ্দুর সুতো ছাড়তে পারি!

২য়।। পরি? বা বা! বহুত আচ্ছা! ইয়ে হয়েছে, কিছু মনে করবেন না, আপনি সংসার করেছেন?

১ম।। সংসার? ও হো-হো, বিয়ে? সব্বোনাশ! একলা শুতে ঠাঁই পায় না আবার শংকরাকে ডাকে! না না মশাই, ওসবের মধ্যে আমি নেই।

২য়।। কেন? নেই কেন? যুবক মানুষ, রূপকথা লেখেন, মনে মনে কল্পনার পরি ওড়ান... তা মাঝে মধ্যে কোনো রূপসি পরির জন্যে মন কেমন করে না?

১ম।। করে। তবে রূপসি পরির জন্য যতটা নয় রুপোর পিঁড়ির জন্যে তার চেয়ে ঢের বেশি।

২য়।। রুপোর পিঁড়ি?

১ম।। আজ্ঞে হ্যাঁ। এই বয়েসে, বুঝতেই পারছেন, ট্যাকে টাকাকড়ি দিয়ে রুপোর পিঁড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসতে না পারলে জীবনটাই কেমন আলুনি-আলুনি লাগে। ধারকর্জ করে কী আর আজীবন চলে?

২য়।। ঠিক বুঝলুম না?

১ম।। কী করে বুঝবেন? সাপে না কামড়ালে কি আর তার বিষের জ্বালা টের পাওয়া যায়?

২য়।। তা হতে পারে। সাবেকি আমলের ব্যবসাদার আমি। কত গুড় ঢাললে কতটা মিষ্টি হয় সেটুকুই বুঝি। ইদানীং আপনাদের এই আলেয়ার আলোয় ভিয়েনের উনুন ধরানোর চেষ্টাটা ঠিক ধরতে পারিনে।

১ম।। মন্দ বলেন নি তো কথাটা! আলেয়ার আলোয় ভিয়েনের উনুন ধরানোর চেষ্টা... হা হা, তা বটে!

২য়।। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধানে চিট ধরলে তো আমরা তা তুষের গাদিতে ফেলেই দিই, ঢেঁকিতে কুটে আর সময় নষ্ট করিনে। যাক সে কথা। তা আপনার ব্যবসায় রোজগার কেমন? বলছিলেন যে বেশ নামডাক হয়েছে?

১ম।। নামডাক-হলেই কি আর টাকা হয় মশাই? লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ যে চিরকালের। স্রেফ প্রাণ বাঁচাতে এখানে পালিয়ে এসেছি বুঝলেন? পাওনাদার তো নয়, যেন কাঁকড়া বিছে! ভাবলেই কম্প দিয়ে জ্বর আসে!

২য়।। তাহলে তো দেখছি খুবই মুশকিল?

১ম।। তা আর বলতে? তবে পাবলিশার্সের কাছ থেকে নতুন উপন্যাসের জন্যে দাদন নিয়েছি— দেখি, এই বইটা যদি লাগে এখন? লাগে মানে, পাঠকের ভালো লাগে, কাটতি বাড়ে, তা হলেই এ যাত্রায় মুশকিলআসান। বড়ো মনোকষ্টে আছি মশাই।

২য়।। কষ্ট তো হবেই। আপনি যে বড়ো সৎলোক!

১ম।। তাই বুঝি? কী করে টের পেলেন?

২য়।। ওসব আমরা ঠিকই টের পাই। ভৌতিকশক্তিও বলতে পারেন। তাছাড়া অন্ধকারে গোলাপ ফুটলে কি তার গন্ধ চাপা থাকে?

১ম।। হা হা হা, আপনার তো দেখছি কবিতাও আসে!

২য়।। সে যা-ই বলুন, ছ্যাঁচরামি-বাঁদরামি চুরিজোচ্চুরি আপনার কম্মো না! আপনার রুচিতেও বাধবে।

১ম।। খুব একটা মিথ্যে বলেন নি। নোংরাপথে উপার্জন আমি ঘেন্না করি। সৎপথে থেকে আধপেটা খেয়ে থাকবো সেও তবু ভালো, তবু অসৎ উপায়ে পোলাও-কোর্মা? ছ্যাঃ!

২য়।। বড়ো সজ্জন মানুষ আপনি। অনেকদিন ধরে আপনার মতোই একজনকে খুঁজছিলাম— যাকে মানুষ বলে চেনা যায়। আজকাল তো আর চোখেই পড়ে না। ... আমার একটি অনুরোধ আছে, আপনাকে রাখতে হবে।

১ম।। অনুরোধ? সে কী? ঘটকালি করবেন নাকি।

২য়।। না না, ওসব কিছু না। অতি সামান্য ব্যাপার। কথা দিন রাখবেন?

১ম।। কিছু না জেনে কী করে কথা দিই বলুন? যদি সাধ্যে না কুলোয়?

২য়।। কুলোবে নিশ্চয়ই। তবু কিছু না জেনে-শুনে কথা দেওয়াটাও অবিশ্যি ঠিক নয়। কোনো বিবেচক মানুষই দেয় না। ... ভালো ভালো। আজ তাহলে আপনি বিশ্রাম করুন— কাল আসবো। একটু সময় লাগবে বলতে।

১ম।। বেশ তো, তাই আসবেন।

২য়।। বড়ো আনন্দ পেলাম। আপনি ঘুমোন। আমি বরং রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু সাঁতার কাটি— আহা, আজ বেশ হাল্‌কা লাগছে মনটা...

একটা তীব্র হাওয়ায় শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। যন্ত্রসংগীতে লঘু সংগীতের সুর বাজে।

দৃশ্যান্তর

ঝিঁঝির ডাকে রাতের গভীরতা ফুটে ওঠে। কাগজপত্রের শব্দ— যেন গুছিয়ে রাখা হচ্ছে। হঠাৎ মৃদু কাশির শব্দ।

১ম।। আরে নন্দীমশাই যে! কখন এলেন?

২য়।। কিছুক্ষণ। একমনে কাজ করছিলেন দেখে আর বিরক্ত করিনি।

১ম।। কী আশ্চর্য! বসুন। আসলে আজ লেখাটা খুব জমে উঠেছিল— তাই আর কোনোদিকে... কিছু মনে করবেন না।

২য়।। আরে না না, ছি ছি— মনে তো আপনারই করার কথা! কোথায় নিরিবিলিতে বসে দুদণ্ড কাজ করবেন— না আমি বুড়োমানুষ তার মধ্যে এসে বকবক করে যাচ্ছি।

১ম।। সে কী কথা? আপনি আসেন বলেই তো তবু দুটো কথা কয়ে বাঁচি! একা একা আর কতক্ষণ থাকা যায় বলুন? নির্বান্ধব?

২য়।। তাহলে আমার অবস্থাটা বুঝুন? সাধ করে কি আর মাঝরাতে আপনার ঘরে চড়াও হই? ... তা যাক সে কথা— সব গোছগাছ করে রাখলেন, আর লিখবেন না?

১ম।। না, আজ আর নয়। এখন একেবারে নির্ভেজাল আড্ডা। একটু গপ্‌পো-সপ্‌পো করে মাথাটা হালকা করতে না পারলে আর ঘুম আসবে না। বড়্ডো খাটুনি গেছে আজ।

২য়।। এই তো খাটবার বয়েস! এ বয়েসটা যদ্দিন থাকবে, তদ্দিন একেবারে তুর্কি ঘোড়ার মতো ছুটবেন। খাটনিটা তো এখন নেশার মতো। কাজ যা-ই হোক না কেন, কেমন যেন ঘোর লাগে, তাই না?

১ম।। তা খানিকটা সেই রকমই বটে!

২য়।। বুঝি মশাই, বুঝি। ও বয়েসটা তো এককালে আমারও ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দাপটে তখন বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়— সেই সময়ে তাদের তালে তাল দিয়ে, তাদের টেক্কা দিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করেছি, দু-হাতে অঢেল কামিয়েছি— জমিদারি বানিয়েছি— বাগান, ক্ষেত, বালাখানা কিচ্ছু বাদ দিই নি— তবু থামতে পারিনি।

১ম।। কী করে পারবেন? রক্তে তো তখন নেশা লেগেছে— উপার্জনের নেশা। বলুন?

২য়।। ঠিক। নেশা। ভয়ংকর নেশা। মাতালের মতো ছুটতাম— আরো দৌলত— আরো সম্পত্তি— স্থাবর-অস্থাবর সব চাই। সাহেবদের নেকনজরে পড়ে জীবনটা ভালোই কাটছিল জানেন? কিন্তু বাদ সাধলো ওই ম্যুটিনি। সিপাহিবিদ্রোহ!

কামান-বন্দুকের শব্দ, ঘোড়ার ডাক, মানুষের চিৎকার, মিলিটারি ব্যস্ততা। সব মিলিয়ে যেন সেই সিপাহিবিদ্রোহের রূপকল্প।

১ম।। তা সেই মিউটিনিতেই বুঝি লুঠপাট হয়ে গেল আপনার সম্পত্তি?

২য়।। না, তা হয়নি বটে— তবে হতে পারতো খুবই।

১ম।। তাহলে?

২য়।। বলছি। আলোটা নিভিয়ে দেবেন? বড়ডো চোখে লাগছে। (ফুঁ দেবার শব্দ) আঃ! আগুনের আঁচে শরীরটা এমন তেতে গিয়েছিল। আপনার কোনো অসুবিধে হলো না তো?

১ম।। না না, অসুবিধে কিসের? বরং ভালোই লাগছে। ইস্— কত তারা ফুটেছে আকাশে? আলোটা ছিল বলে নজরেই পড়েনি! আপনি বলুন।

২য়।। হ্যাঁ, যা বলছিলুম— সিপাহিরা ঢুকে পাছে লুঠপাট করে, সেই ভয়ে একশোটা আকব্বরি আশর্‌ফি— মানে আপনারা যাকে মোহর বলেন— একটা পিতলের ঘটিতে ভরে গোপনে পুঁতে রেখেছিলাম একটা নিমগাছের গোড়ায়! যদি সব যায়ও, তবু ওটুকু পুঁজি তো থাকবে? কিন্তু মারে হরি রাখে কে?

১ম।। কেন, এই যে বললেন সিপাহিরা লুঠ করেনি, তবে?

২য়।। করবে কী? তার আগেই তো কম্মকাবার!

১ম।। মানে?

২য়।। আরে মশাই, গোরা সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করা কি ওই কেলে সেপাইদের দমে কুলোয়? দুদিনেই তো ওই বিদ্রোহফিদ্রোহর ঝাঁপে লাঠি। কিন্তু হলে কী হবে? দেশে তখন ঘোর দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে! চারদিকে অরাজকতা, হাহাকার— চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি বাড়তে লাগলো হু হু করে। এমনি সময়ে একদিন মাঝরাতে ঘোড়া ছুটিয়ে মশাল জ্বেলে রে রে করে ডাকাত পড়লো আমার বাড়িতে।

দূর থেকে ছুটে আসা কিছু ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। আতঙ্কিত নারী-পুরুষের কলরোল ও আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে।

১ম।। তারপর?

২য়।। তারপরেই তো যাচ্ছেতাই কাণ্ড। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় এমনিতেই মনটা কাহিল ছিল, অতিরিক্ত ঘোরাঘুরিতে শরীরটাও দুর্বল— ডাকাত পড়েছে শুনেই ফট করে আমার হার্টটা ফেল করে গেল। ... ব্যাস, কেলোর কীর্তি আর কাকে বলে!

১ম।। মরে গেলেন?

২য়।। পুরোপুরি। আর ডাকাত ব্যাটাচ্ছেলেরা যা পেলো, দু-হাত্তা কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে হাওয়া। রক্তজমানো টাকা আমার মশাই— কোন বেজম্মার ভোগে

লাগলো কে জানে?

১ম।। তারপর?

২য়।। তারপর আর কী? বাড়িতে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। অবিশ্যি কতটা আমার জন্যে আর কতটা টাকার শোকে কে জানে? প্রতিবেশিরা সামনে চোখ মুছলো, আড়ালে বল্লে— দেখলে তো, ধম্মের কল বাতাসে নড়ে? উৎপাতের ধন কেমন চিৎপাতে গেল? যাকগে সে কথা। যথাকালে দেখলুম শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমার বড়ো ব্যাটা যশোদাদুলাল বাপের গদিতে গ্যাঁট হয়ে বসলো।

১ম।। তা তো বসবেই। বাপের গদি তো ছেলেরই প্রাপ্য। ডাকাতরা হয়তো কিছু টাকাকড়ি সোনাদানা লুঠ করেছে, তাই বলে আপনার অতবড় জমিদারিটা তো আর তুলে নিয়ে যেতে পারেনি?

২য়।। বিলক্ষণ। তাছাড়া দেওয়ান ম্যানেজারগুলো তো ছিলই, ওটুকু সামাল দিতে আর কতক্ষণ লাগে? দেশে তো তখন চরম বিশৃঙ্খলা! সাহেবরা নিজেদের কাছাকোঁচা সামলাতেই ব্যস্ত। এই সময়ে একটা পয়সাওলা লোক যদি দুটো পয়সা বেশি না বানাতে পারে, তাহলে আর কবে পারবে? বলে খাজাঞ্চি গোমস্তাগুলোই একটা-আধটা খুদে জমিদার বনে গেল, আর....

১ম।। বাঃ! বেশ জমে উঠেছে কিন্তু আপনার গল্পটা! তারপর?

২য়।। আপনি দেখছেন জমে উঠছে, আমি দেখছি গলে যাচ্ছে।

১ম।। কী রকম?

২য়।। কী রকম কী মশাই? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিল তিল করে যে তিলোত্তমা গড়েছিলাম, কটা বছর যেতে না যেতেই যে তার এমন নাভিশ্বাস উঠবে তা কি আর আন্দাজ করতে পেরেছিলাম কোনোদিন?

১ম।। ঠিক বুঝলুম না?

২য়।। হাতে জমিদারি পেয়ে ছেলের তো আমার পাখনা গজালো। দোল-দুর্গোৎসবে যে বাড়িতে কীর্তন-কথকতা ছাড়া কোনো বিলাসিতা ছিল না, সেখানে তৈরি হলো কিনা জলসাঘর?

১ম।। জলসাঘর?

২য়।। আজ্ঞে হ্যাঁ, জলসাঘর। একবার ভাবুন, উপরে ঝাড়লণ্ঠনের মিঠে আলো, নিচে বিছানো পালকের মতো নরম পারশিয়ান গালচে... চারদিকে ঘুরঘুর করছে হুক্কা-বরদার, পাংখা-বরদার— কিংখাবে মোড়া বাহারি গদির ওপর ভেলভেটের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে জমিদার যশোদাদুলাল নন্দীমশাই তখন রুপোর গ্লাসে বিলিতি হুইস্কি চুমুক দিতে দিতে বাঈজিকে মুঠো-মুঠো মোহর প্যালা দিচ্ছেন আর চারদিক থেকে ধন্যি ধন্যি রব উঠছে! ভাবতে পারেন?

বাঈজির গলায় গান ভেসে ওঠে। সমবেত জড়িত কণ্ঠে মাঝে মাঝে বাহবাধ্বনি শোনা যায়। ধীরে ধীরে তার ওপর ২য় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়।

২য়।। এদিকে যখন বাঈনাচের হররা ছুটছে, ওদিকে তখন আমার লক্ষ্মীর ভাঁড়ারে তলানি পড়ছে!

১ম।। কী সর্বনাশ। এই তো উনবিংশ শতাব্দীর অভিশাপ!

২য়।। সর্বনাশের এখনই কী দেখছেন? মদ আর মেয়ে মানুষে শরীরটা ঝাঁঝরা করে সুপুত্তুর আমার অকালেই কৈবল্যধামে চলে গেল-- যাবার কালে রেখে গেল আধখানা জমিদারি সমেত বাপকা ব্যাটা লম্পটশিরোমনি ব্রজদুলালকে। তা সে ব্যাটার তো আবার সাহেবি কেতা!

১ম।। তাই নাকি?

২য়।। তবে আর বলছি কী? জলসাঘর ভেঙে বসালো বল-ড্যান্সের আসর-- (সংলাপের পিছনে মৃদুভাবে পাশ্চাত্য নৃত্যের অনুগামী বাদ্যসংগীত বাজবে) ফিটন বেচে কিনলো বিলিতি মোটরগাড়ি-- যথাসর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়ে সে যখন রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে চোখ বুজলো, তখন এই গোপীদুলাল বেচারা বলতে গেলে পথের ভিখিরি...

১ম।। আহাহা, এতোবড়ো সম্পত্তি আপনার তিন-পুরুষেই শেষ? তা সেই গোপীদুলালবাবু আর ফেরতে পারলেন না অবস্থা?

২য়।। কী করবে? মাথার ওপর বাপের দেনার বোঝা ছাড়া আর কিছু পেয়েছিল নাকি গোপীদুলাল? সতীলক্ষ্মী স্ত্রী তো ওকে আগেই ছেড়ে গিয়েছিলেন, এখন বাপ মরতে গাড়ি-বাড়ি বেচে দেনদার-পাওনাদার মিটিয়ে একমাত্র মেয়েটির হাত ধরে পথে নামলো বেচারি!

১ম।। আহা, সত্যিই বেচারি। তা এখন কোথায় থাকেন উনি?

২য়।। ওই তো-- ওই বেনেপাড়ার ধারে একটা ভাঙাবাড়িতে পড়ে আছে এতকাল। তবে তারও শমন ঘনিয়ে এসেছে, আর বেশি দেরি নেই। কালে ধরেছে তাকে। বললাম না, মরণহাঁপানি? (দীর্ঘশ্বাস)... আর কিছু ভাবিনা, যা ভবিতব্য হবেই। তবে গোপীদুলাল মরলে মেয়েটা একেবারে ভেসে যাবে, এটাই ভাবনা।

১ম।। দেখুন, আমি আগেই বলেছি বিয়ে করার মতো আমার অবস্থা নয়... ওই অনুরোধ আমাকে করবেন না।

২য়।। না না, সে অনুরোধ করছি না। বলছিলাম, আপনি যদি ওই মোহরগুলো গোপীদুলালের কাছে পৌঁছে দেন, তাহলে ও বেচারি মেয়েটার বিয়েটা দিতে পারে।

১ম।। সে কী? সেই মোহরের ঘটি কি এখনো নিমতলার পোঁতা আছে নাকি?

২য়।। আছে বইকি। মরার আগে কাউকে তো আর বলে যেতে পারিনি— যেমন পুঁতেছিলাম, তেমনি পোঁতা আছে! তাইতো নিমগাছটা ছাড়তে পারিনি।

১ম।। একশোখানা আকব্বরি আশরৃফি? এত মোহরের দাম যে অনেক! ঠিক জানি না, তবে লাখখানেক টাকার কম হবে বলে তো মনে হয় না।

২য়।। সেইজন্যেই তো কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনে। এখন এক আপনিই ভরসা।

১ম।। আমি? আমি কী করবো?

২য়।। ঘটিটা খুঁড়ে বের করতে হবে। বেশি না, হাতখানেক খুঁড়লেই পাওয়া যাবে।

১ম।। কিন্তু খুঁড়বে কে?

২য়।। আপনাকে ছাড়া আর কাকে অনুরোধ করবো, বলুন? আমি তো বায়ুভূত।

১ম।। আপনি তো বেশ ভূত মশাই? ও বাগান এখন নিকুঞ্জ পালের দখলে, সে আমাকে খুঁড়তে দেবে কেন? আর আমিই বা তাকে বলবো কী— যে মশাই, আপনার বাগানে মোহর পোঁতা আছে, খুঁড়তে এসেছি?

২য়।। না না, দিনেরবেলা যাবেন কেন? দুপুররাতে চুপিচুপি পাঁচিল ডিঙিয়ে... নিমগাছটা বাড়ি থেকে অনেক দূরে, বাগানের এক কোনে... রাতে বাগানে কেউ থাকে না।

১ম।। মাপ করবেন, আমার দ্বারা হবে না। রাত্তিরবেলা পরের বাগানে যদি ধরা পড়ি, ঠ্যাঙে দড়ি পড়বে! নিকুঞ্জ পাল এমনিতেই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। — না না মশাই, অসম্ভব।

২য়।। দয়া করুন, দয়া করুন আমাকে। আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। সদ্‌বংশের মেয়েটা বেঘোরে নষ্ট হয়ে যাবে!

১ম।। কেন, ওই মেয়ে বা তার বাপের কাছে যান না? নিজেদের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নেবে, আমাকে কেন?

২য়।। সে চেষ্টা কি করিনি ভাবছেন? আমাকে দেখে তে দুজনাই ভয়টয় পেয়ে এমন হাঁউমাঁউ করে উঠলো— গোপীদুলাল তো দাঁতে দাঁত লেগে তখনই যায় যায়— সে তখন আরেক কেলেঙ্কারি অবস্থা! তারপর বাড়িতে রোজা ডেকে ঝাড়িয়েছে, গৃহবন্ধন করছে, এমন কী শান্তি-সস্তয়ন পর্যন্ত বাদ দেয়নি।— আমার আর ওদিকে যাবার কোনো উপায় নেই।

১ম।। আমারও নেই। আমি মশাই নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ— এসব উটকো ঝঞ্ঝাটে আমি জড়াতে পারবো না।

২য়।। না বললে শুনবো না— আমাকে দয়া করতেই হবে। আমি বুড়ো মানুষ, আপনার পায়ে ধরছি...

১ম।। আরে ছি ছি, করেন কী? আশ্চর্য! আমি ছাড়া কি দেশে আর লোক নেই?

২য়।। আছে, তবে আপনার মতো নির্লোভ মানুষ বোধহয় নেই?

১ম।। নির্লোভটির্লোভ নয় মশাই, এ সব কাজ করতে গেলে আমাকেও কিন্তু ওই মোহরের ভাগ দিতে হবে।

২য়।। বেশ দেবো। আপনি না হয় পাঁচ পারসেণ্ট নেবেন? ওর থেকে পাঁচখানা মোহর আপনার।

১ম।। পাক্কা কথা?

২য়।। সাবেকি ব্যবসাদার মানুষ আমি। কথার খেলাপ করিনে।

১ম।। বেশ চলুন।

দৃশ্যান্তর

ঝিঁঝির ডাক তীব্র হয়। গাছের ডালে হাওয়া লাগার শিরশিরানি। দূরে কোথায় ব্যাঙের দলের সমবেত গীতানুষ্ঠান। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের মতো প্যাঁচার নিশ্বাস ভৌতিক পরিবেশ গড়ে তুলছে। হঠাৎ শুকনো পাতার উপর দিয়ে কী যেন দৌড়ে পালালো।

১ম।। (চমকে) ওটা কী রে বাবা?

২য়।। হেঁ হেঁ, ভিটরে শেয়াল! ভয় নেই, মানুষ দেখে পালিয়েছে—

১ম।। একটা টর্চ সঙ্গে থাকলে ভালো হতো। ... ওগুলো ব্যাঙ ডাকছে না?

২য়।। হ্যাঁ, বৃষ্টি হবে মনে হয়। এদিক দিয়ে আসুন। এপাশের পাঁচিলটা ভাঙা আছে খানিকটা, আপনার টপকাতে সুবিধে হবে।

১ম।। আমার মশাই বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছে, যদি ধরা পড়ে যাই?

২য়।। পাগল নাকি? ভূত, চোর আর শেয়াল কুকুর ছাড়া কেউ জেগে থাকে নাকি এত রাতে? এই যে— এখান দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে নেমে পড়ুন ও দিকটায়।

উৎকণ্ঠা মেশানো বিরতির আবহ সুর।

১ম।। ও নন্দীমশাই, কারা যেন জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে?

২য়।। জ্বালালেন মশাই। ভূতের সঙ্গে ঘুরতে পারছেন, তাতে ভয় নেই, আর... ওগুলো প্যাঁচা। ভয় নেই, উঠে আসুন। এ্যাই-এ্যাই (ধপ করে লাফিয়ে পড়ার শব্দ) ব্যাস।

১ম। এবার?

২য়।। এবার ওই বাঁ-দিকটায় এগিয়ে যান, দেখবেন কতকগুলো কোদাল, কুড়ুল, খন্তা পড়ে আছে, ওখান থেকে খন্তাটা নিয়ে আসুন একটা। খুঁড়তে হবে

তো? ... ওই যে জোনাকের ঝাঁক উড়ছে, ওর পাশেই নিমগাছটা। চট করে আসুন।

শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলার শব্দ দূরে সরে যেতে থাকে। দূরে কোথায় কুকুর ডাকছে। গাছের ডালে হাওয়ার কাঁপন।

দৃশ্যান্তর

কমলা।। তোমার কী খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা?

গোপী।। কষ্ট? নরকযন্ত্রণা মাগো, এ ব্যাধি যেন শত্তুরেরও না হয়। উঃ। ... হ্যাঁরে কমলা, টানের ওষুধটা কি সবটাই ফুরিয়ে গেছে?

কমলা।। হ্যাঁ বাবা, তবে কাল তো তোমার হাসপাতালে দেখানোর দিন— কাল আবার আনতে পারবে?

গোপী।। হ্যাঁ, অবশ্য কাল পর্যন্ত যদি টিকে থাকি।

কমলা।। অমন করে বললে আমার ভয় করে না বুঝি? এইতো আমি তোমার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তোমার একটু ভালো লাগছে না?

গোপী।। লাগছে মা, লাগছে। তোর এই হাতের ছোঁয়াটুকুতেই তো আমার স্বর্গের সুখ। আঃ!

দূরে কোথায় শেয়াল ডাকে। একক থেকে সমস্বরে। একটু পরে কুকুরের চিৎকারে সে ডাক থেমে যায়।

গোপী। রাত কত হলে কে জানে? আড়াইটে-তিনটে বেজে গেছে বোধ হয়। তুই এবার ঘুমিয়ে পড় মা। আর কত রাত জাগবি?

কমলা।। তুমি ঘুমোও তো? আমার ঘুম পায়নি। দাঁড়াও, তেলটা একটু গরম করে আনি, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। যাবো আর আসবো—

গোপী।। ভগবান, এই সোনার পুতুলি যদি হাতে তুলে দিলে, তবে আমাকে এই কালব্যাধি কেন দিলে বিধাতা? ওর যে আর কেউ নেই— আমি চোখ বুজলেই তো সব অন্ধকার.......

দৃশ্যান্তর

গাছের ডালে হাওয়ার শব্দ। মৃদু ঝিঁঝির ডাক।

১ম। ইস্ কী অন্ধকার। নন্দী মশাই—

২য়।। বলুন।

১ম।। আলোটা জ্বালছি, চমকাবেন না যেন—

২য়।। ঠিক আছে, জ্বালুন।

দেশলাই জ্বালানোর শব্দ।

১ম।। দাঁড়ান, আগে ভালো করে খিলটা এঁটে দিই। এ্যাই— এ্যাই। (খিল দেবার শব্দ) ব্যাস, এবারে নিশ্চিন্ত।

২য়।। বলেছিলুম কিনা? এবারে বিশ্বাস হলো তো?

১ম।। (মোহর ঢালার শব্দ) কতো মোহর হেঁ? হেঁ— যেন আলিবাবার গপ্পো— তাই না? একটু পেতে শুয়ে থাকবো?

২য়।। হা হা হা—

যন্ত্রসংগীতে 'আলিবাবা নাটকের 'আয়া হুকুম বরদার' গানের সুরটি বাজবে। কেমন বাদশাহি আনন্দের পরিবেশ।

দৃশ্যান্তর

পাখির কলরবে সকালের পরিবেশ। একটু পরে দরজায় শোনা যায় কড়ানাড়ার শব্দ। দরজা খোলে কেউ।

কমলা।। কে?

১ম।। এটা কি গোপীদুলালবাবুর বাড়ি?

কমলা।। হ্যাঁ, কিন্তু বাবা তো একটু আগে বেরিয়ে গেলেন?

১ম।। কোথায়?

কমলা।। হাসপাতালে।

১ম।। কখন ফিরবেন?

কমলা।। ঠিক বলতে পারিনা, তবে মনে হয় দেরি হবে।

১ম।। জরুরি দরকার ছিল—। ঠিক আছে চলি। ... ইয়ে, তোমার নাম কী?

কমলা।। কমলা।

১ম।। কমলা, ইয়ে হয়েছে, বাবাকে বোলো— আমি ওবেলায় আবার আসবো, কেমন?

কমলা।। আচ্ছা।

দৃশ্যান্তর

মৃদু যন্ত্রসংগীতে চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রকাশ পাবে।

১ম।। (স্বগত) কমলা! আহা, বড়ো মিষ্টি নাম! ... কমলা মানে তো লক্ষ্মী। তা বটে, মেয়েটি সত্যিই যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। হবে না? কত বড়ো জমিদার বংশের মেয়ে। ... বুঝতে পারছি, গোপীদুলালবাবু খুবই অনটনে পড়েছেন। মেয়েটার তো দেখলাম একখানা শাড়িও নেই, বাপের ধুতি পরে ঘুরছে। বাইরের মানুষ দেখে বেচারা বড্ডো লজ্জা পেয়েছে!... ওই ভরা যৌবন, এই কাঁচা বয়েস, অমন মুখশ্রী— নাঃ। দেখছি টাকাটা ওদের খুবই দরকার। ... আচ্ছা, সন্ধেবেলায় একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে যাবো? — না না, সেটা বড়ো বাড়াবাড়ি হবে। আমার কী? যার মেয়ে সে বুঝবে, টাকা তো পাচ্ছেই। ... নন্দীমশাইয়ের সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে পারলে হতো— তা তিনিও তো আবার মাঝরাত্তিরের আগে বেরুতে পারবেন না। ... মরুকগে যা হবার হবে। ... ভাবছি আমার মোহর পাঁচখানাও ওদের দিয়ে দিই। আমার তো চলেই যাচ্ছে— তবে? একটা লোকের উপকার করেছি বলে কি তার দাম নিতে হবে নাকি? কেন, আমি কি দালাল? ছ্যাঃ!

দৃশ্যান্তর

তিনবার শঙ্খধ্বনিতে সন্ধ্যার পরিবেশ। একটু পরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

কমলা।। বাবা, ইনিই তোমার সঙ্গে সকালে দেখা করতে এসেছিলেন...
গোপী।। আপনাকে তো ঠিক... মানে, কী জন্যে আমাকে খুঁজছেন?
১ম।। আপনার কিছু টাকা পাওনা আছে আমার কাছে। দিতে এসেছিলাম।
গোপী।। টাকা?
১ম।। আজ্ঞে হ্যাঁ।
গোপী।। আমার পাওনা! আপনার কাছে?
১ম।। আজ্ঞে হ্যাঁ।
গোপী।। কই, মনে তো পড়ে না?
১ম।। টাকার কথা পরে বলছি, এখন আমার একটি প্রস্তাব আছে।
গোপী।। বলুন।
১ম।। আমি আপনার স্বজাতি, ভদ্রসন্তান। আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।
গোপী।। বিয়ে? ... আমার মেয়েকে? ... আপনি?

১ম।। আমার পরিচয় বিস্তারিত ভাবে আপনাকে দিচ্ছি-- শুনে খোঁজখবর নিয়ে যদি আপনি বিবেচনা করেন...

গোপী।। সে সব তো পরের কথা। আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারবো এ যে আমার স্বপ্নের অতীত। কিন্তু বাবা, আমার তো পয়সা নেই?

১ম।। আছে বইকি। এই দেখুন না-- (মোহর ঢালার শব্দ) এ সবই আপনার!

বসন্তবাহারে সানাইয়ের সুর। কোলাহল মুখরিত উৎসবের পরিবেশ।

দৃশ্যান্তর

কলকাতার রাজপথে যানবাহনের শব্দ।

১ম।। এ বাড়ি তোমার পছন্দ হয়েছে কমলা?

কমলা।। বাব্বা। হয়নি আবার? দোতলার ওপর কী চমৎকার ঘরগুলো... কত আলো হাওয়া... চারদিকে গাড়িঘোড়া, হইচই... এমন মজা লাগে!

১ম।। এই-- এরই নাম কলকাতা, বুঝেছ? শহর কলকাতা। তোমার মতো জমিদারকন্যাকে কি আর ওই অজপাড়াগাঁয়ে মানায়?

কমলা।। ইস্, খুব যে!

১ম।। শোনো, দেনাপত্তর যা ছিল মিটিয়ে দিয়েছি। এখন আমি দায়মুক্ত। কলেজ স্ট্রিটে ঘরভাড়া নিয়েছি একখানা। বইয়ের ব্যবসা শুরু করবো। নাম দিয়েছি তোমার নামে কমলা প্রকাশনী। কী ভালো লাগছে না কমলা?

কমলা।। (দীর্ঘশ্বাস) আমাদের এত সুখ বাবা দেখে যেতে পারলেন না...

১ম।। তা সত্যি। হাঁপানিতে ভুগে ভুগে শরীরের এমন অবস্থা হয়েছিল-- মেয়েকে সম্প্রদান করার জন্যেই যেন বেঁচেছিলেন! .. তবে একটা কথা ঠিক, রাজার ছেলে, রাজার মতোই মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেলেন!

কমলা।। আচ্ছা, ভূতদাদুর সঙ্গে তোমার আর দেখা হয় নি?

১ম।। হয়নি আবার? ফুলশয্যের রাতেই তো দেখা হয়েছিল-- বলিনি বুঝি? আহা, ভূতের দয়াতেই তো আজ আমাদের ভবিষ্যৎটা পাকা হলো।

কমলা।। কী বল্লেন উনি? খুশি হয়েছেন?

১ম।। হয়েছেন বইকি! চোখ টিপে একটু মুচকি হেসে বল্লেন-- 'দালালিটা একটু বেশিই নিলে হে বাবাজি' -- বলেই চোখের পলকে হাওয়া।

আবহসংগীতের সুরে আনন্দময় পরিবেশ।

ই জ্জ ত

সুমিত্রা. বাসন্তী. মহীতোষ

শিরোনাম সংগীতের পরে দরজার ঘণ্টি বাজে।

সুমিত্রা।। (ভেতর থেকে) কে? (দরজা খোলার শব্দ) এ কী, বাসন্তী যে! এসো এসো, ভেতরে এসো। (দরজা বন্ধ হয়) তুমি হঠাৎ?

বাসন্তী।। এই এলাম বৌদিদি। ভালো আছেন? দাদাবাবু?

সুমিত্রা।। ওই আছি সবাই। বোসো। তোমরা?

বাসন্তী।। আমাদের আর ভালোমন্দ বৌদিদি। দুঃখী মানুষ। এখনও বেঁচেবর্তে আচি আপনাদের দয়ায়। কতবার ভাবি এসে একবার পেন্নাম করে যাবো, তা পাঁচবাড়ির ঝক্কি পুইয়ে য্যাখন ঘরে ফিরি, ত্যাখন তো রাত নিষুত!

সুমিত্রা।। তবু যে এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও আমাদের মনে রেখেছ, এই তো ঢের! কাজ ফুরোলে কে আর কবে...

বাসন্তী।। বলেন কী বৌদিদি? মাথার উপরি ধম্ম আচে না? কাজ তো কম করলুম না এ জীবনে? বলতি গেলি আপনার এখানেই মোটে তিনমাস— তাও বদলির ঠিকে। কিন্তু আপনার ব্যবহার? আদরযত্ন? কাজের মানুষ বলে কোনোদিন আলাদা চোকে দ্যাকেননি, এ কী কম কতা? ভোলা যায়?

সুমিত্রা।। সত্যি বলতে কী, তোমার কাজ যেমন পরিষ্কার ছিল বাসন্তী, তেমনি কথাবার্তাও মিষ্টি। আমার তো খুবই পছন্দ ছিল তোমাকে। কিন্তু কী করবো বলো? সুলেখা অনেককাল আছে এ বাড়িতে। বিনা দোষে তাকে

ছাড়াই কী করে? যেকালে নিজেই তোমাকে বদলি দিয়ে গিয়েছিল দেশে যাবার সময়ে!

বাসন্তী।। সে তো হাজারবার। গতর থাকলি ভাতের অভাব হয় না বৌদিদি, কিন্তু বেইমানির অন্ন কি মুখি তোলা যায়, না উচিত?

সুমিত্রা।। সে কথা আজ আর কজন মানে বাসন্তী? যাক, তোমার মেয়ে কেমন আছে?

বাসন্তী।। (দীর্ঘশ্বাস) আর আচে বৌদিদি! সে তো এখন আমার গলার কাঁটা! আমার কী কম জ্বালা?

সুমিত্রা।। মেয়ে বড়ো হলে মা-বাপের ভাবনা তো হয়ই— কী আর করবে বলো? নিজের ধন নিজেকেই সামলাতে হবে।

বাসন্তী।। (বিষণ্ণ) ওর বাপ বেঁচে থাকলি কী এত ভাবতাম বৌদিদি? যার মেয়ে সে বুঝতো। বড়ো মেয়ে-সোহাগী ছেল মানুষটা! কিন্তু বরাত? সেই ওর কোন ছোটোকালেই তো চলে গেল সব ফেলেছইড়ে।

সুমিত্রা।। কী হয়েছিল? অসুখবিসুক?

বাসন্তী।। না গো বৌদিদি। অপঘাত। সাপের কামড়ে অমন দশাসই মানুষটা ছটফট করতি করতি নীলবন্ন হয়ে গেল গা— ওজা ডেকে কত ঝাড়ফুক করানো হলো... কিছুতেই কিছু হলনি গো!

সুমিত্রা।। ইস্!

দুরে কোথায় যেন সাপুড়ের বাঁশী মৃদু শোনা যায়।

বাসন্তী।। (বেদনার্ত) সবাই বলে, সাপে কাটা মানুষিরি নাকি কলার মান্দাসে কইরে ভাইস্যে দিতি হয় নদীর জলে। বউ ভাগ্যমতী হলি নকিন্দর হয়ে ফিরে আসে আবার। তা তেমন ভাগ্যি তো করিনি বৌদিদি... তাহলি আর পাপের ভোগ ভুগবে কে?

সুমিত্রা।। মেয়ের বয়েস কত হলো তোমার?

বাসন্তী।। চোদ্দ, বৌদিদি। কিন্তু বাপের আড়া পেয়েছে? এমন বাড়ন্তগড়ন, নোকে ভাবে সতের-আঠেরোর কম লয়। তাতেই তো আরও জ্বালা!

সুমিত্রা।। তোমার শ্বশুরবাড়িতে কেউ নেই?

বাসন্তী।। আচে বইকি? অ্যাকোনো শাউড়ি বেঁচে আচে। দুই দেওর— জা। ননদের অবিশ্যি বে হয়ে গেছলো... তবে বহুকাল আমার আর যোগাযোগ নেইকো ওদের সঙ্গে।

সুমিত্রা।। তা ছেড়ে এলে কেন খামোকা?

বাসন্তী।। সাদে কী আর এয়েছি বৌদিদি? মান বাঁচাতেই পথে বেইরেছি। মানুষটা

মরতেই শাউড়ির কী গঞ্জনা! ঝ্যানো আমিই সাপ হয়ে কেটেছি ওনার ছেলেরি!

সুমিত্রা।। আশ্চর্য!

বাসন্তী।। সেই জ্বালাতে জ্বলতি জ্বলতিই তো মেয়ে নে চলে এয়েছিলাম গো— বৌদিদি। স্বাধীনজেবন। এতে যদি তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হয় তো হোক?

সুমিত্রা।। সত্যি, মানুষের মন কী আজব। ছেলে নেই— তাই বলে কি নাতনির মুখখানাও মনে পড়বে না ঠাকুমার?

বাসন্তী।। পড়তো বৌদিদি, ঝদি অনেক ট্যাকা গোছ করি রেখে যেতি পারতো ওর বাপ? ... দরাজ দিলের মানুষ ছেল। দুহাতে আয় করতো, তো দশ হাতে খরচা। তখন কী সুখির দিনই না গেছে আমাদের!

সুমিত্রা।। কী কাজ করতো তোমার বর?

বাসন্তী।। মোটরগাড়ি সারাই করতো বৌদিদি। পয়লানম্বরের মিস্তিরি ছেল। ঝ্যাত রকম ভাঙাচোরা লঝ্ঝড় গাড়িই হোক না কেন, হাত ছোঁয়ালিই পংখিরাজ। বাড়ি ফিরতো, পকেটভর্তি ট্যাকা। কী খাতির তখন বাড়িতি!

সুমিত্রা।। বোসো বাসন্তী, একটু চা করে আনি।

বাসন্তী।। ওমা, আপনি করবেন কেন? আমিই তো আচি।

সুমিত্রা।। দোষ কী? অনেকদিন তো তুমিই করে খাইয়েছ। একদিন না হয় আমিই খাওয়াই? মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

দুজনে হাসে।

দৃশ্যান্তর

আবার দরজায় ঘণ্টি।

সুমিত্রা।। এসো বাসন্তী। ও— মা! এই বুঝি মেয়ে? কী নাম?

বাসন্তী।। জয়ন্তী। জয়ী বলেই ডাকে সবাই।

সুমিত্রা।। বাঃ, এতো বেশ বড়ো হয়েছে দেখছি!

বাসন্তী।। বংশের ধারা বৌদিদি। একটুখানি মাটি পেলিই নকনকিয়ে ওঠে। ও জয়ী, এই হলো তোর মামি। মা দুগগার মতো মানুষ!

সুমিত্রা।। আঃ, তুমি বড্ডো বাড়িয়ে বলো বাসন্তী!

বাসন্তী।। কী করবো বৌদিদি? ঝার চোকির ঝ্যামন লজর... নে, পেন্নাম কর মা।

সুমিত্রা।। থাক থাক। বেঁচে থাকো মা। সুখী হও।

বাসন্তী।। হ্যাঁ সেই আশীব্বাদই করেন বৌদিদি। মায়ের জীবন থেকে শুধু দুঃখুটুকুই

কুড়োলো, নিজের জীবন হলি ঝ্যানো একটু সুক পায়।

সুমিত্রা।। পাবে বইকি বাসন্তী। জীবনটাতো ওর পড়েই রয়েছে। এত ভেবো না।

বাসন্তী।। যা মা, ছাতে উটি দেখে আয়গে, মামি কেমন ফুলির বাগান বাইনেছে নিজির হাতে। ভারি শৌকিন মানুষ।... আমরা একটু গপ্‌পো সপ্‌পো করি?

সুমিত্রা।। তা বেশ তো— যাক না। ওই তো বাঁদিকে সিঁড়ি। এমন কিছু না— টবের বাগান। যাও—

বাসন্তী।। একটু সইরে দেলাম মেয়েডারে বৌদিদি। ওর সামনে তো আর সব কতা বলা যায় না?

সুমিত্রা।। সে তো বুঝলাম। কিন্তু বাসন্তী, আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি! এটি কী তোমার মেয়ে? মানে তোমার নিজের?

বাসন্তী।। (হাসে) যা বলেছেন বৌদিদি, আমার মতো পেত্নিরি দেকি সবাই তাই বলে। বলে— বাবুদের বাড়ি থেকে চুরি করে এনিছিস নাকি? কিন্তু ওর বাপরে তো দ্যাকেন নি বৌদিদি... সে রুপির আধখানাও পায়নি মেয়েটা...

সুমিত্রা।। কী জানি বাপু। এতো মেয়ে নয়— আগুনের খাপরা। এমন সুন্দরী তো হালফিল দেখেছি বলে মনে পড়ে না!

বাসন্তী।। সেই তো আমার আর এক বিপদ বৌদিদি! থাকি বস্তিতি। নোকের বাড়ি-বাড়ি ঠিকে খেটে দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটাই। মেয়ে কোলে করি বসি থাকলি কী আমার দিন চলে, বলেন?

সুমিত্রা।। বটেই তো। পাঁচবাড়ির কাজ, দশরকম বায়না। বুঝি বইকি।

বাসন্তী।। আবার বলেন তো কার ভরসাতেই বা ওরে একলা ফেলি রেখি কাজে বেরোই? আমার তো ফিরতি ফিরতি সেই সাঁজ পেইরে আত্তির। এতক্ষণ কোতায় থাকে মেয়েটা? কার কাচে, বলেন? আমার কী মাথার উপরি কেউ আচে?

সুমিত্রা।। তাই তো।

বাসন্তী।। ঝ্যাতোদিন ছোটো ছেলো, সঙ্গে নে মুনিবদের বাড়ি বাড়ি কাজে গিইচি। হাতে-হাতে কাজের জোগান দিত, ফুট ফরমাস খাটতো, এত জ্বালা ছেল না। তা অ্যাকনে আর বেরোতি চায় না। বলে, 'নজ্জা করে মা, আমি না হয় ঘরের কাজ করবো?' কী বলি বলেন তো?

সুমিত্রা।। লজ্জা তো করতেই পারে বাসন্তী। একে ডাগর হয়েছে, তায় রূপের ফুলঝুরি। লোকের চোখে তো হাত চাপা দিয়ে রাখা যাবে না?

বাসন্তী।। তবে? সেই যে কতায় বলে না, কপালে নেই ঘি— তো ঠকঠকালে হবে কী? কপালগুণে একটা কাজ পেয়েছিনু, এক বড়লোক বুড়ির কন্না করা। সত্তর টাকা মাইনে! তার ওপর খাওয়া-পরা, তেল-সাবান, ইচ্ছে মতো

পান-দোক্তা-চা। কাজের মদ্যি শুধু বুড়ির দ্যাকাশুনো, ফাইফরমাস খাটা। বাতে পঙ্গু বুড়ি, কিন্তু শক খুব। সাবান মাখ্যে চান করাও, গন্ধতেল মাখ্যে চুল বেঁদে দাও, বাতের তেল মালিশ করার পর পাঁউডার ঘসে দাও... বউরা আর কত পারবে? তাছাড়া পয়সা রয়েছে যেকালে—

সুমিত্রা।। ভালো তো? সুখের চাকরি।

বাসন্তী।। সুখের সাগরেই তো ভাসতি ছেলাম গো বৌদিদি...। ভোর পাঁচটায় কাজে যেতাম, আর ফিরতি সেই আত্তির দশটা। মেয়েটা তেতক্ষণ এঘর-ওঘর বসি থাকতো। ফিরে এসে নে আসতাম ঘরে।

সুমিত্রা।। সে কী! তারপর অত রাতে ফিরে রান্নাবান্না? বলো কী?

বাসন্তী।। না গো বৌদিদি। দুবেলা খোরাক তো মুনিববাড়ি থেকেই দিতো? আতেরটা না খেইয়ে নিয়ে আসতাম। ওতেই কুল্যে যেত মা-বেটির। সক্কালবেলায় নিজির জন্যি দুটি ভাতেভাত ফুট্যে নিতো মেয়েটা।

সুমিত্রা।। বাঃ! তাহলে তোমার তো এতে একটু সাশ্রয়ই হয়েছে বলো?

বাসন্তী।। বলতি নি বৌদিদি, খাইখরচা ছেল না বলে মাইনের ট্যাকাটাও বেশ জমে যাচ্ছিল কমাস। মেয়েটার বিয়ের জন্যি জম্যে রাখছিনু...।

সুমিত্রা।। ভালোই তো। ওর ভবিষ্যৎটাও তে ভাবতে হবে? তা কী হল? ছাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

বাসন্তী।। কী বলবো বৌদিদি, ভগমান নোকটা বড় দিষ্টিকেপ্পন। দিতি গিয়েও প্রাণ ভরে দিতি পারে না। এক হাতে দ্যায় তো আরেক হাতে কেড়ে নেয়। এ সুখ আর বেশিদিন ভোগ করা হলনি গো—

সুমিত্রা।। এমন চাকরিটা তোমার। আহাহা! তা কী অপরাধে ছাড়িয়ে দিলো?

বাসন্তী।। এখনো ছাড়ায়নি বৌদিদি। তবে ধরে যে আকবো তেমন সাধ্যিও তো নেই আমার।

সুমিত্রা।। কেন, এই তো বলছো চাকরিটা আছে। তবে?

বাসন্তী।। বুড়ির এক নতুন উপসগ্‌গ শুরু হয়েছে বৌদিদি। আত্তির জাগা।

সুমিত্রা।। এ্যাঁ?

বাসন্তী।। হ্যাঁগো। সারা আত্তির জেগে বসে খালি ফরমাস... আলো জ্বেলে দে, পাখা নিব্যে দে। আবার পরক্ষণেই হয়তো বলবে, আলো নিব্যে দে। পাখা জ্বালা, গরম নাগছে। নয়তো বলবে, পান ছেঁচে দে। কী, জল দে— খাবো। কচিবাচ্চার মতো বায়না। তিলেক দেরি হলিই গালমন্দ। ... সারাদিন খাটা-খাটনির পর আর ভালো নাগে— না, পারে বউগুলো?

সুমিত্রা।। ঠিকই তো। বুড়ো বয়েসে মানুষের ঘুম কমে যায়, তা বলে এত বায়না...

বাসন্তী।। আবার অ-গেরাহ্যি করবে সে মুরোদও নেই। এই যে এত বোলবোলাও, সবই তো বুড়ির জন্যি? বুড়োকত্তা তো বাড়ি-ঘর, বিষয়-আশয়, ট্যাকা-

পয়সা সবই নিকে দিয়ে গেছে গিন্নির নামে। ছেলেদের আয় আর কতটুকু? বুড়িকে তুইয়েতাইয়ে না রেখে উপায় আছে ওদের?

সুমিত্রা।। সে ওদের ব্যাপার, ওরা বুঝবে। তোমার তাতে কী?

বাসন্তী।। সেই তো কতা। উপায় না দেকে এখন যে আমারেই ধরেছে। বলছে, দশ-ট্যাকা মাইনে বাইড়ে দিচ্চি, তুই বরং আতেও থেকে যা বাসন্তী। নইলি আমাদের আবার অন্য নোক দেখতি হবে।

সুমিত্রা।। বারে আবদার! মানুষের সুবিধে-অসুবিধে বুঝবে না?

বাসন্তী।। সে কথা বলে কে? সবাই কি আপনার মতো বুজদার বৌদিদি? এদিকি এ কাজটা পেয়ে ঠিকে কাজগুলো সব ঘুচ্যে বসে আচি। এখন তো আমার উভয়সমিস্যে। বড়ো মানুষির মজ্জি। আমাদের মতো গরিবগুব্বোর কতা ভাবতি বয়েই গেছে ওদের!

সুমিত্রা।। তা কী করবে এখন— কিছু ভেবেছ?

বাসন্তী।। সেইজন্যেই তো আপনার ছিচরণে এসে পড়িচি বৌদিদি। মেয়ে বাঁচাতি গেলি চাকরি থাকে না, আবার চাকরি রাখতি গেলি....। ওই তো দেখলেন মেয়েরে নিজির চোকি। ওই পোড়া রূপই তো ওর কাল।

সুমিত্রা।। আমি বলি কী বাসন্তী, যেখানে কাজ করছ, সেখানেই নিয়ে গিয়ে রাখো ওকে। বড়লোকের বাড়ি বলছ যখন, ... তোমার বাড়িভাড়াও বাঁচবে, আবার রুগি সামলানোর সঙ্গে মেয়ে আগলানোও হবে?

বাসন্তী।। সে কথা বলতি কী কসুর করিচি বৌদিদি? কত হাতেপায়ে ধরিছি। তা বাবুরা বড়ো কড়া। রাজি হলনি। বলে, বাড়িভরতি চাকরবাকর... না বাপু, শেষে একটা....। তা সেই থেকে আজ দুদিন ধরি ঝ্যাতো চেনাজানা বাড়ি আচে, দোরে দোরে ঘুরিচি একটুখানি আচ্ছয়ের জন্যি। তা কেউ রাজি হলোনি বৌদিদি। এক-একজনের এক-এক রকম ছুতো। .... এখন মেয়েডারে সাথে নে ঘুরতিছি, যদি ওরে দেখলি একটু মায়া আসে!

সুমিত্রা।। এইখানেই তো তোমার ভুল হয়েছে বাসন্তী। মেয়েকে না দেখলে তবু যদি বা রাজি হতো কেউ, এখন ওই আগুনের খাপরাকে দেখে কে ঠাঁই দেবে ঘরে? তার ওপর তুমি নিজেও থাকবে না কাছে। তাই কখনও হয়?

বাঁশীতে একটা করুণ সুর বাজে বিলম্বিত লয়ে।

বাসন্তী।। বৌদিদি, ঝেখানে বাস করি সেটা বুনোবাগের ডেরা। কালকেউটির গত্ত। জান বাঁচাতি, মান বাঁচাতি, তাইতো মানুষির দরজায় এসে ডাইরেছি...

সুমিত্রা।। সবই তো বুঝলাম বাসন্তী, কিন্তু—

বাসন্তী।। আমি গরিব বৌদিদি। নোকের বাড়ি বাসনমেজে খাই। তবু মেয়েমানষির

একটা ইজ্জত আছে তো— বলেন? আপনারা নেকাপড়া জানা মানুষ, বোঝেন সব। আপনি দয়া করলি সেই ইজ্জতটুক বাঁচে মেয়েটার। তা নইলি সাপ-বাঘের ছোবলে-কামড়ে বেঘোরে একদিন প্রাণটা যাবে ছুঁড়ির। আমি যে বড়ো আশা নে এয়েছি গো বৌদিদি?

ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজে।

সুমিত্রা।। দ্যাখো বাসন্তী, তোমার সব কথা শুনলাম। বেশ বুঝতে পারছি, মেয়ে নিয়ে তুমি খুব ঝামেলায় পড়েছ। তাছাড়া ও মেয়ের যা রূপ, তোমার ভাঙাঘরের চালে যখন তখন আগুন লাগা অসম্ভব নয়। যা দিনকাল এখন! এতদিন যে সামলেসুমলে রখতে পেরেছ, সেই তো ঢের!

বাসন্তী।। তাহলেই বুঝুন বৌদিদি, সাদ করে কি পাগল হইচি? আপনি বলে বুজলেন। এখন ঝেদি উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে যায়, আমি তো গলায় দড়ি দিয়েও শান্তি পাবো না। কতায় বলে, মেয়েমানষির ইজ্জত, পদ্মপাতায় জল। ঝ্যাতক্ষণ আচে, দেখন সুখ। বদহাওয়া লাগলিই শেষ।

সুমিত্রা।। (অন্যমনস্ক) তা সত্যি। মানুষজনও যেন কেমন হয়ে গেছে আজকাল।

ঘড়ির টিকটিক শব্দ।

বাসন্তী।। তাহলে আজ থেকেই একে যাই বৌদিদি? আপনাদের এঁটেকাটা দুটো খাবে, ঝ্যাতোটা পারে খাটবে খুটবে। রান্নাঘরে যদি ঢুকতে দ্যান তো রান্নাবান্নাও করে দিতি পারবে। ঘরের কাজকর্মও। ঝ্যামন-ঝ্যামন বলবেন—

সুমিত্রা।। (চিন্তাগ্রস্ত) কাজের জন্যে কিছু না বাসন্তী, কাজের লোক তো রয়েছে। আর দুটো মানুষের রান্নাই বা কত? ভাবছি— তোমার দাদাবাবুকে একবারটি জিগ্যেস না করে..

বাসন্তী।। দাদাবাবু আবার আপনার উপরি কী বলবেন বৌদিদি? উনি কী তেমন মানুষ? আপনিও ঝা দাদাবাবুও তাই। ঘরে-সংসারে আপনিই তো রাজা। আপনার বাড়িতি বামুন-চাকর নেই, শুধু মেয়েছেলে। তাথেই আপনারে ধরিচি বৌদিদি— মেয়েডার ইজ্জত আপনি বাঁচান!

সুমিত্রা।। (দ্বিধাগ্রস্ত) বড়ো মুশকিলে ফেললে বাসন্তী। আমি মানে...

বাসন্তী।। (উৎসাহিত গলায়) ওরে ও জয়ী, আয় আয়, লেমে আয়। (আবহে আনন্দ-মূর্ছনা) দেখলি মামির বাগান? যেমন ফুলির মতো মন, তেমনি ফুলির বাগান। নে নে, পেন্নাম কর মামিরে। এখানেই থাকবি। মামির হাতে-হাতে মুখি মুখি কাজ করবি। ঝ্যাদ্দিন না বে হয়ে শ্বশুরঘর যাচ্ছিস, এই

মামার বাড়িই তোর সব। এখানেই তোর ঠাঁই। তোর বসত।

সুমিত্রা।। থাক থাক মা। ... কিন্তু আমি বলছিলাম কী বাসন্তী, এমন হুটপাট করে রেখে যাওয়া...। নতুন জায়গা, মন টিকবে কী টিকবে না...

বাসন্তী।। আপনি আর কিন্তু করবেন না বৌদিদি। মন টিকবে না মানে? দিনরাত যমের মুখি থাকতি থাকতি মেয়েটা আমার সিঁটিয়ে কাট হয়ে আচে। ছোঁড়াগুলো দ্যাখ-না-দ্যাখ শুইনে শুইনে সিটি দেবে, অসভ্য-অসভ্য গান গাইবে। অঙ্গভঙ্গি করবে। টিপকলে যেতি-আসতি ইচ্ছে করি গায়ে ধাক্কা দিয়ে যাবে... আরো কত যে জ্বালা, সে সব মুকি আনাও পাপ!

সুমিত্রা।। থাক থাক, সে সব আর শুনতে চাইনে। সবই বুঝেছি—

বাসন্তী।। আমি জানতাম বৌদিদি, আপনার দয়া হবেই। কত নোকের তো পায়ে ধরিছি... আপনি সাক্ষাৎ ভগমতী।... যাই, মুনিববাড়িতি বলে আসি গিয়ে। এতেরবেলায় এসে ওরে নে যাবো। আজ আত্তিরটা মায়ে-ঝিয়ে থাকি? কাল ভোরভোর এসি... বৌদিদি, বিপদে-আপদে মানুষ তো মানুষের কাছে গিয়েই ডাঁড়াবে। মানুষ ছাড়া মানুষের ইজ্জত কে বাঁচাবে বলেন?

দৃশ্যান্তর

মহীতোষ।। (উত্তেজিত) কী বলছো তুমি সুমিত্রা— বলা নেই, কওয়া নেই একেবারে কথা দিয়ে ফেললে? একটিবার জিগ্যেস করার দরকারও মনে করলে না?

সুমিত্রা।। কী করবো বলো? বলেছিলাম তো? তা এমন কাকুতিমিনতি করতে লাগলো...

মহীতোষ।। করবে না কেন? কাজ গুছোনোর জন্যে ওরা পায়ের ধুলোও চাটতে পারে। তা বলে এতবড়ো একটা দায়িত্ব নেবার আগে দুদণ্ড ভাববে না? মানুষের একটা সুবিধে-অসুবিধেও তো থাকতে পারে?

সুমিত্রা।। কী এমন অসুবিধে শুনি? একটা গরিবের মেয়ে যদি আমাদের বাড়ির এক কোনায় একটুখানি আশ্রয় পায়...

মহীতোষ।। কেন? বলি, আমার বাড়িটা কি পান্থশালা না অনাথআশ্রম? কোথায় কোন মেয়ে বস্তিতে টিকতে পারছে না, তারজন্যে আমাকে... যত্তসব বাজে ন্যাকামি! (ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ) উঃ! এই হয়েছে আরেক আপদ— সন্ধের মুখে নিত্যি ঝড়বৃষ্টি!

সুমিত্রা।। কালবোশেখিতে অমন হয়েই থাকে।

মহীতোষ।। সে তো বুঝতেই পারছি। তা নইলে ওইসব মেয়েকে হঠাৎ করে ঠাঁই দেবে কেন ঘরে?

সুমিত্রা।। মেয়েটা ভালো বলেই তো টিকতে পারছে না গো। খারাপ হলে তো

করেই উচ্ছন্নে যেত ওই পরিবেশে। জেনেশুনে অমন মেয়েকে নেকড়ের মুখে ফেলে দেবো, বলো?

মহীতোষ।। কতটুকু জানো তুমি ওই সব মেয়েদের? কতটুকু চেনো? আগুপিছু ভেবে তবেই পা ফেলতে হয়, বুঝলে? হ্যাঃ — ছোটোলোকের ঘরে ওই মেয়ে আবার ভালো থাকতে গেছে!

সুমিত্রা।। দ্যাখো, ওদের ছোটলোক বানাতে গিয়ে তুমি নিজে ছোটোলোকের মতো কথা বলো না। তাই যদি, তবে ওর মা ওকে বাঁচাতে অমন আকুল হয়ে কেঁদে পড়বে কেন পায়ে?

মহীতোষ।। ওইটুকুতেই মজে গেলে? কত রকম মতলব থাকতে পারে ওদের জানো?

সুমিত্রা।। এর আবার মতলব কী? অমন সুন্দর মেয়েটার চারদিকে হিলহিল করছে সাপ! মাথার উপর ফণা তুলে ফোঁসাচ্ছে দিনরাত্তির। একটু দয়া করলে যদি বেঁচে যায়, ক্ষতি কী? সব শুনলে তুমিও না করতে পারতে না।

মহীতোষ।। আমার তো আর ভীমরতি ধরেনি যে চোখ বুজে সব মেনে নেবো?

সুমিত্রা।। তুমি বুঝতে পারছো না। কতকগুলো নষ্ট ইতরছেলে ওকে রাতদিন এমন জ্বালাচ্ছে যে মনের দুঃখে ও মাকে বলেছে— একদিন ঘরে এসে দেখবি আমি গলায় দড়ি দিয়ে আড়ায় ঝুলছি!

মহীতোষ।। তা ওর মায়েরই বা ওই চাকরিতে যাবার দরকারটা কী? আগে যেমন এ বাড়িবাড়িতে ঠিকে করছিল, তেমনি করলেই পারতো? তাতে তো আর মেয়েকে সারারাত একলা ফেলে রাখতে হতো না তো? লোভ, বুঝলে লোভ।

সুমিত্রা।। দ্যাখো, টাকা সকলেরই দরকার। গরিবমানুষের তো আরও বেশি। মেয়েটার বিয়ের জন্যে বেচারি...

মহীতোষ।। (তাচ্ছিল্যের সুরে) হ্যাঃ! বাসনমাজা ঝিয়ের মেয়ের বিয়ে! তাতে কী আবার রোশনচৌকি বসবে নাকি? কত হাজার লাগবে শুনবি শুনি?

সুমিত্রা।। (স্বগত বিষাদ) মানুষকে ছোটো ভাবার মধ্যে কী যে আনন্দ! ... আচ্ছা, তোমার কী ধারণা, ওই চাকরিটা ছেড়ে পাহারা দিলেই মেয়েকে আগলে রাখতে পারবে বাসন্তী? কতটুকু ক্ষমতা ওর? যা শুরু হয়েছে— হয়তো একদিন পাশ থেকেই ছেত্তই হয়ে যাবে মেয়েটা, তখন?

মহীতোষ।। বহুত আচ্ছা। বৌদির ব্রেনওয়াশ করার মতো ইনিয়েবিনিয়ে তো বেশ ভালোগপ্পোই ফেঁদে গেছে দেখছি!

সুমিত্রা।। গল্প?

মহীতোষ।। তাছাড়া কী? গপ্পো বানানোর অসীম ক্ষমতা ওদের। ধানাইপানাই করে মেয়েটিকে গছিয়ে দিয়ে এখন যদি পুলিশ ডেকে আনে, তখন?

সুমিত্রা।। (অবাক) পুলিশ ডাকবে? কেন?

মহীতোষ।। কেন কী? ভুজুংভাজুং দিয়ে ওর মেয়েকে তুমি আটকে রেখেছ বলে?

সুমিত্রা।। (হাসে) বাপরে! গল্প বানানোর ক্ষমতা তো দেখছি তোমারও কিছু কম নেই। এটাও তোমার মাথায় এলো?

মহীতোষ।। আসবে না কেন? তোমার মতো তো চোখে ঠুলি এঁটে দুনিয়ায় ঘুরি না? এই কলকাতা শহরে কত রকমের বদমায়েশি আছে তুমি জানো? কত রকমের জোচ্চুরি? ডেইলি কত রকমের কেস হচ্ছে খবর রাখে কিছু? সোহাগ দেখাতে গিয়ে দেখবে, ওই মেয়েই ফাঁসিয়ে দিয়েছে তোমাকে শেষপর্যন্ত।

সুমিত্রা।। (হেসে) উঃ, পারোও বাপু গল্পের গরু গাছে তুলতে।

মহীতোষ।। ঠাট্টা নয় সুমিত্রা। বাস্তববুদ্ধি কম বলেই ব্যাপারটা হালকা করে দেখছ। পুলিশ এলে ওই মেয়েই যখন সরলতার মুখোশ খুলে ফেলে বলবে— হ্যাঁ, এই বাবুরাই আমাকে কাজ করতে এনে জবরদস্তি ধরে রেখেছে, তখন? চাই কী আমার নামে একটা কেলেঙ্কারির কেসও ঠুকে দিতে পারে!

সুমিত্রা।। আর অমনি পুলিশ সব বিশ্বাস করবে?

মহীতোষ।। করবে বই কী? জানো না, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র? একে চোখধাঁধানো সুন্দরী, তায় তকতকে তাজা যুবতী...

সুমিত্রা।। কিন্তু তাতে ওর লাভ কী?

মহীতোষ।। (ব্যঙ্গের হাসি) তোমার কথা শুনে মনে হয় এইমাত্র ভূমিষ্ঠ হলে! লাভ কী বোঝো না? কমপেনসশন আদায় করা। মোটা খেসারত। যে সব গুণ্ডা-বদমাস ছোঁড়াগুলোর কথা বলেছে, কে বলতে পারে, তারাই ওদের পিছনে আছে কিনা? শেষে বাড়ি চড়াও হয়ে হল্লা করবে, মস্তানি দেখাবে, সে তখন আর এক চিত্তির। ন-সিকের কেত্তন গাইতে গিয়ে তখন তো তের-সিকের খোল ফেঁসে যাবে আমার!

গুড়গুড় করে মেঘের ডাক, সঙ্গে অল্প ঝড়ের হাওয়া।

সুমিত্রা।। সত্যি, একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুমি যে এমন সাতকাহন করবে তা কিন্তু সত্যিই ভাবতে পারিনি। আশ্চর্য! মানুষকে বিশ্বাস করো না তুমি?

মহীতোষ।। করবো না কেন? সে যাদের নীতিজ্ঞান আছে। অনেক ঠেকে শিখেছি সুমিত্রা, ছোটোলোকদের মধ্যে ওসবের বালাই নেই। ওরা জানে শুধু ধান্দাবাজি। ... না না, অসম্ভব। তুমি পত্রপাঠ বিদেয় করে দাও ওদের। ওই যে বললে রাত্তিরে নিতে আসবে না কী, তখনই বলবে— না বাপু, দাদাবাবু রাজি হলো না।

ঝড়ের শব্দ অপেক্ষাকৃত বাড়তে থাকে। সুমিত্রা একটুকাল নীরব।

সুমিত্রা।। তার মানে, তোমার ভাষায় ওই বাসনমাজা ঝিটার কাছে স্বীকার করতে হবে, এ সংসারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই?

মহীতোষ।। (তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) ছাড়োতো! ভারি একখানা লোকের কাছে তোমার মানটা খাটো হবে। ওসব কবিত্ব রেখে, বী প্র্যাকটিক্যাল সুমিত্রা। ধরো, যদি ওইসব অঘটন ঘটে যায়, কী করবে তখন তুমি?

সুমিত্রা।। আর ধরো, কিছুই ঘটলো না? ধরো, দৈবক্রমে বাসনমাজা ঝিটা সত্যি কথাই বলেছে?

মহীতোষ।। তা সে ওর মেয়ের কথা ও বুঝবে। বস্তির সবাইকে বলে রাখুক না?

সুমিত্রা।। তাহলে স্বীকার করছো, বস্তির সবাইকে বললে, তারা ওর মেয়ের ইজ্জত রক্ষার দায়টা নেবে?

মহীতোষ।। নেবে না কেন? সবাই তো আর খারাপ নয়। অনেক গেরস্তলোকও তো আছে ওখানে, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করে? তারা সবাই একজোট হলে ছোঁড়াগুলোকে টিট করতে কতক্ষণ?

সুমিত্রা।। তার মানে তুমি বিশ্বাস করো, তোমার চেয়ে অন্তত বেশি মনুষ্যত্ব আছে এমন লোকও ওই বস্তিতে বাস করে? তাদের ক্ষমতাও বেশি?

মহীতোষ।। (বিরক্ত) বলো বলো, যা খুশি বলে নাও। তবে আমার সাফ কথা, তোমার ওই বাসন্তীবালার রূপসি কন্যাটিকে আশ্রয় দেবার ব্যাপারে আমি রাজি নই, ব্যাস। এ সব জালজোচ্চুরি না হলেও ও মেয়ে ঘরে বসেই ঢের কেলেঙ্কারি ঘটাতে পারবে।

সুমিত্রা।। (শ্লেষ হাসিতে) তাই? কার সঙ্গে? চাকর-বাকর তো নেই বাড়িতে?

মহীতোষ।। (হ্যা হ্যা করে হাসে) তা মনিবের সঙ্গেও তো হতে পারে? যা মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার মত রূপ!

সুমিত্রা।। তাহলে তো আরোই রাখতে হয়। সোনা কী পেতল যাচাই হয়ে যায়।

মহীতোষ।। (রেগে যায়) থামো থামো। ঢের আদিখ্যেতা হয়েছে। ওর মা এলে সাফ বলে দিও, ওসব রাখাটাখা, আশ্রয়টাশ্রয় এখানে হবে না।

সুমিত্র।। বেশ তো, বলার ভারটা তুমিই নাও।

মহীতোষ।। (অবাক) আমি? কেন? তোমাদের ওই সব ঝি-ফিয়ের সঙ্গে আমি কথা বলি নাকি? যা বলার তুমিই বলে দিও।

সুমিত্রা।। (শান্ত অথচ দৃঢ়) আমি পারবো না। আমি ওকে কথা দিয়েছি।

ঝড়ের শব্দ উত্তাল হয়ে ওঠে।

মহীতোষ।। (রাগ ও বিরক্তি নিয়ে) নিজের ওজন না বুঝে কথা দিলে এরকম অসুবিধেয় তো পড়তেই হয়। হুঁ! কোথাকার একটা ঝি এসে ভুজুংভাজুং দিয়ে কী কথা আদায় করে নিয়ে গেছে— সেই কথা রাখার আবার এত দায়!

প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত। বেহালার করুণসুরে দৃশ্যান্তর হয়।

দৃশ্যান্তর

সুমিত্রা।। (ক্লান্ত, বিধ্বস্ত) চলে গেল বাসন্তী? মেয়ে নিয়ে?

মহীতোষ।। (বীরদর্পে) যাবে না মানে? প্রথমে খুবই ধানাই-পানাই করছিল... শেষে শক্ত ঘাঁটি বুঝতে পেরে.... বলে কিনা, বৌদিদি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, তাতেই আমি মুনিববাড়িতে বলে এলাম... আরে বাপু, তুমি যা ভালো বুঝেছ করেছ, আমরা তার কী বলবো? কিন্তু মেয়েটা এমন বেতরিবৎ, অসভ্য...

সুমিত্রা।। (ক্লান্ত) কিছু বলে গেল বুঝি?

মহীতোষ।। বলে— চলে আয় মা, কার কত মুরোদ বোঝা গেছে! মেয়ের মান-ইজ্জতের ধুয়ো তুলে আর বাবুদের পায়ে ধরতে আসিস নে। ওদের কাছে আমাদের ইজ্জতের কী দাম? আমরা যখন ছোটোলোক, ছোটোলোকের মতোই ব্যবস্থা নেবো। মন্দ হতে হয়, মন্দই হবো, কার তাতে কী?

সুমিত্রা।। (যেন ঘুম ভেঙে উঠে) জয়ী বললো এ কথা? জয়ী বললো?

মহীতোষ।। বললো তো! ছোটোলোক কী আর গাছে ফলে?

সুমিত্রা।। (উদ্ভাসিত) সাবাস বেটি। সাবাস!!

মহীতোষ।। (অবাক) কী বলছ তুমি সুমিত্রা? ছুঁড়িটা আমাকে এমনভাবে বেইজ্জত করলো, আর তুমি কিনা...?

বজ্রপাত। আকাশ ভেঙে মুশলধারায় বৃষ্টি নামে।

দী পা ন্বি

শিশির. বীরেন. মিনতি. অরুণা. সুধাময়ী. ভদ্রলোক

সূত্রপাতে ট্রাম-বাস-রিকসা-ফেরিওয়ালার হাক-ডাক আর জনকোলাহলে মুখর উত্তর কলকাতার কোনো ঘিঞ্জি এলাকার পরিবেশ ফুটে ওঠে ধ্বনিতরঙ্গে। ক্রমে সেই শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতেই সংলাপ শোনা যাবে।

শিশির।। (দূর থেকে কাছে আসে) আয় আয় বীরেন, বোস। (চিৎকার করে) মিন— মিনু— মিনতি—

বীরেন।। কদ্দিন আছিস এ বাড়িতে?

শিশির।। তা প্রায় বছর তিনেক। শুধু এই পজিশনটার জন্যে। নইলে এমন সাতকেলে বাড়িতে বাস করার যে কী যন্ত্রণা—! এটা ফাটছে তো ওটা ভাঙছে, এখানে ফুটো তো ওখানে ফাটা— কী করবো বল? এতেই দশহাজার অ্যাডভান্স, সাড়ে-তিনশো ভাড়া? মাসে মাসে পঞ্চাশ করে বাদ যায়।

বীরেন।। তা সত্যি, বাড়িঘরের এখন যা সমস্যা, আমাদের মতো মানুষজনের ভদ্রভাবে বাস করাই দায়।

শিশির।। বল? উঃ! কতকাল পরে যে তোর সঙ্গে দেখা হলো! এত ভালো লাগছে! মিনু—

কথা বলতে বলতে মিনতি আসে।

মিনতি।। কী হলো? এত চ্যাঁচামেচি—

শিশির।। (হাসে) কী— লজ্জা পেয়ে গেলে তো? ওকে আর লজ্জা করতে হবে না। ও বীরেন। বীরেন চক্কোত্তি— আমার সেই ইস্কুলের বন্ধু। আর বীরেন— এই হলো আমার শ্রীমতী। পেন্নাম কর ব্যাটা।

মিনতি।। কী হচ্ছে? ছিঃ!

বীরেন।। নমস্কার বৌদি।

মিনতি।। নমস্কার। বসুন ভাই।

বীরেন।। আপনিও বসুন। সদর্থেই কিন্তু আপনি আমার বৌদি। শিশিরের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়লেও আমি বোধহয় ওর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোটোই হবো।

মিনতি।। তা এতকাল ছিলেন কোথায়?

বীরেন।। কলকাতাতেই। আমি, জানেন তো— ছেলেবেলা থেকেই বাউণ্ডুলে? শিশির জানে। এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে শেষে কলকাতাতেই ঠেক নিয়েছি। অনেকদিন। আসলে আপনাদের ঠিকানা জানা ছিলনা তো—

শিশির।। আরে, আজ বাস থেকে নেমেছি, বুঝলে মিনু, দেখি বাবু চলেছেন। আদ্দির পাঞ্জাবি-পাজামায় পুরো কাপ্তেন। আমি তো এক নজরেই চিনেছি। অমন রাজপুত্তুরের মতো চেহারা, লুকোবে কোথায় বাবা? অরুণাকে বলোতো একটু চা দিতে।

মিনতি।। বসুন, আসছি।

শিশির।। তারপর? কোথায় ছিলি, কী করছিলি অ্যাদ্দিন— সব খুলে বল দেখি। বাপরে বাপ, সেই যে স্কুল ফাইনালের পর উধাও হলি, ব্যাস—

বীরেন।। তারপর আর কী? দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ালাম— কখনও সাধুর চেলা হয়ে, কখনও মোটরমিস্ত্রি, জাহাজের খালাসি, একদল বেদের সঙ্গে ঘুরলাম কিছুদিন সাপুড়ে সেজে—

শিশির।। বলিস কী?

বীরেন।। তারপর যখন আর ভালো লাগলো না— ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন।

শিশির।। সেই মামাবাড়ি?

বীরেন।। তাছাড়া আমার কোন চুলো আছে? জানিস তো— মা-বাবা সেই কোন ছেলেবেলাতেই গন উইথ দ্য উইণ্ড। তা মামা-মামি বললে— যা ঢের হয়েছে, এবার আবার মন দিয়ে পড়াশুনো কর। স্থিতু হ।

শিশির।। ঠিক।

বীরেন।। আসলে মামা-মামির ছেলেপুলে ছিল না তো? অতিরিক্ত আদরে ফেঁসে গেলাম। তুই তো জানিস লেখাপড়ায় আমার কত মন? তবু ক'টা দিন একটু—

শিশির।। ভালোই তো।

বীরেন।। তা বি এ পরীক্ষা দেবার মুখে আবার মাথার পোকা নড়ে উঠল। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে— ব্যাস, আবার সেই দীনদুনিয়ার মালিক। হা হা—

প্রাণখুলে হাসতে থাকে বীরেন।

শিশির।। সত্যি, তোর খ্যপামি আর গেল না। তা হ্যাঁরে, এখনও তোর সেই আগের মতো পরোপকারের বাতিক আছে নাকি? তেমনি ব্যাগার খাটা?

অরুণা।। চা।

শিশির।। রুনাকে মনে আছে তোর? আমার ছোটো বোন, অরুণা?

বীরেন।। হ্যাঁ, তখন তো—

শিশির।। পাকামি করো না। তখন তুমিও তো প্রায় তাই। (হেসে) নে, চা-টা ধর।

চায়ে চুমুক দেবার শব্দ।

বীরেন।। এ কী? আলোটা—

অরুণা।। আমি যাই। দেখি ভেতরটায়—

বীরেন।। লোডশেডিং হয়ে গেল নাকি রে? ... কই, নাতো! ওইতো সব বাড়িতে আলো জ্বলছে। তবে মেইনে কোনো গোলমাল-টোলমাল আছে নাকি?

শিশির।। আর বলিস না ভাই, এ বাড়িতে এসে থেকে এই চলছে। তুলনায় ভাড়াটা একটু কম, তো ইলেকট্রিক মিস্ত্রির পিছনেই তো গুচ্ছের বেরিয়ে যাচ্ছে! বাড়িওয়ালা কিছু করবে না, এই শর্তেই ভাড়া নেওয়া। এখন মরো তুমি। আর ব্যাটারা কী যে সারিয়ে যায় ভাই, দুদিন ভালো তো তারপরেই যে-কে সেই। আজকালকার এই মিস্ত্রিগুলো এত ফাঁকিবাজ!

বীরেন।। যা বলেছিস। ... যাক বাবা, আলো আনছে বোধ হয়।

শিশির।। এ কী রে রুনি, এটা আবার কী একটা মোমবাতি আনলি? রোগা-মড়া-বাঁটকুল? এ আর কতক্ষণ জ্বলবে? কেন, হ্যারিকেন কী হলো?

অরুণা।। তেল নেই। এবার র‍্যাশনে তো— তুমি কটা মোমবাতি এনে দাও না দাদা, দোকান থেকে?

সুধাময়ী।। (ভিতর থেকে) ও রুনি, এ ঘরে তোরা কি একটা আলোটালো কিছু দিবি? নাকি সারারাত অন্ধকারেই থাকবো? ছেলেটা যে ভয় পেয়ে কঁকিয়ে উঠছে?

অরুণা।। শুনছ তো?

শিশির।। জানিস ইলেকট্রিকের এই অবস্থা। আগে থাকতে দুচারটে আনিয়ে রাখলে — সবটাতেই তোদের ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে। একটু বোস রে বীরেন,

আসছি। যাবো আর আসবো, নিচেই দোকান।

অরুণা।। আপনি বসুন। অন্ধকারে বৌদিটা কী করছে কে জানে?

বীরেন।। তার চেয়ে এই মোমবাতিটুকু বৌদিকে দিয়ে এলে হয় না?

অরুণা।। বারে, আর আপনি বুঝি অন্ধকারে থাকবেন?

বীরেন।। এক্ষুনি তো শিশির ফিরে আসবে। দুচার মিনিট।

ঘড়ির টিকটিক শব্দ শোনা যায়।

অরুণা।। মা?

সুধাময়ী।। বল?

অরুণা।। দাদা মোমবাতি আনতে গেছে, এক্ষুনি চলে আসবে। অন্ধকারে চলাফেরা করো না, একটু অপেক্ষা করো।

সুধাময়ী।। আর উপায় কী মা। আমার যেমন বরাত।

আবার ঘড়ির শব্দ।

অরুণা।। বৌদি গো–

মিনতি।। বলো–

অরুণা।। এই আলোটুকু দিয়ে সামলে নাও। দাদা এক্ষুণি মোম নিয়ে আসছে।

মিনতি।। বাঁচালে ভাই। তরকারিটা বোধহয় এতক্ষণে–

আবার সেই টিকটিক শব্দ।

শিশির।। যাঃ! এ ঘরের বাতিটাও হাওয়া?

বীরেন।। আমিই বললাম। চারদিক যা কুপকুপ করছে–

শিশির।। দাঁড়া, আগে একটা মোমবাতি জ্বালি এ ঘরে। (দেশলাইয়ের শব্দ) রুনা, রুনা–

অরুণা।। কী বলছ?

শিশির।। এই নে। এবার জ্বেলে দিগে যা ঘরে ঘরে। যা অস্থির সব। ... এই নে বীরেন।

বীরেন।। কী?

শিশির।। সিগারেট। নে ধরা। এবার বসে একটু যুত করে গপ্পো করি। ... কত কথা যে মনে পড়ছে– একেবারে সিনেমার মতো। সেই বাঁশবন, কুলতলির জঙ্গল, ডোঙায় চড়ে বিলের মধ্যে শালুক তুলতে যাওয়া– সেই তুই একবার পড়ে গেলি জলে?

বীরেন।। সে তো তোর জন্যে। এমন করে লগি চালালি।
শিশির।। ইয়েস, তালডিঙিতে ব্যালান্সটাই আসল। একটু ট্যারাবাঁকা হয়েছ কী—
বীরেন।। কিন্তু আমি ভাবছি মোমই বা কম কী?
শিশির।। অ্যাঁ?
বীরেন।। না, বলছি মোমবাতি তো তাহলে কম পোড়ে না মাসে?
শিশির।। হুদো হুদো। আর কেরোসিন? সেটা বল?
বীরেন।। এর ওপর তো আবার ইলেকট্রিক চার্জ!
শিশির।। সে তো গোদের ওপর বিষফোঁড়া। বিলে একবার চোখ পড়লেই শিবনেত্র। হবে না কেন বল? ক্লাইভের আমলের বাড়ি। ড্যাম্প লাগা দেয়াল, পুরোনো তার— কারেন্টপোড়ার কোনো মাথামুণ্ডু আছে?
বীরেন।। রি-ওয়্যারিং করিয়ে নিলেই পারিস?
শিশির।। পুরো? খরচ কম নাকি? একজনকে দেখিয়েও ছিলাম, সে তো প্রায় সাত-আটশো টাকার বাজেট দিলো। ওটা তো ধরতাই— তারপর কাজে নেমে আমাকে যে কোন গাড্ডায় ফেলত! মিস্ত্রিদের কথা তো— এ সব গয়লার খাঁটি দুধের মতো, বুঝিলি না?
বীরেন।। তা ঠিক। আচ্ছা চলতো, তোর মেইনটা একবার দেখে আসি?
শিশির।। তুই? থাক বাপু, ওখানে তোমার আর বিদ্যে ফলিয়ে কাজ নেই। কলম পিষে যাচ্ছ, তাই যাও। তোমার মতো ফিটবাবু— ইলেকট্রিক শক খেয়ে মরে আমার হাতে দড়ি পড়াও আর কী। (বীরেন হাসে) এই দ্যাখ, একবার মেইনে হাত দিতে গিয়ে আমার কী হয়েছিল—
অরুণা।। কিছু দেখতে পেলেন হাতে?
বীরেন।। (অবাক) না?
অরুণা।। (হেসে) পাবেনও না। কিছু থাকলে তো পাবেন?
শিশির।। ফিচলেমো করিস না। দে, হাত পাখাটা দে। গরমে মোমবাতির মতো গলে যাচ্ছি।
অরুণা।। সেজন্যই নিয়ে এলাম। নাও। (বীরেনকে) দাদা, জানেন তো-- এসব ব্যাপারে খুব ভীতু। নিজে তো হাত দেবেই না, আমাদেরও ধারে কাছে যাবার উপায় নেই। অথচ অমন শক আমরা দিনের মধ্যে চোদ্দোবার খাচ্ছি।
বীরেন।। (হেসে) তুমি বুঝি ইলেকট্রিসিটিকে ভয় পাও না? খুব সাহস তো?

এই 'তুমি' বলাতে যেন সেতারের ঝঙ্কার উঠলো।

শিশির।। তোর চেনাজানা কোনো ভালো মিস্ত্রি আছে— একটু সস্তায়গণ্ডায় করে

দিতে পারে?

বীরেন।। মিস্ত্রিদের ওপর তোর তো কোনো বিশ্বাস নেই ভাই— বল তো আমিই না হয় লেগে যাই কাল সকালে থেকে?

মিনতি।। আপনি লাইট ফিট করবেন? তবেই হয়েছে। বন্ধুর মতো আঙুলে বরিক কমপ্রেস করে আপনাকেও তাহলে দিন তিনেক বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

অরুণা।। উনি না হয় তিনদিন শুয়ে কাটালেন বৌদি, কিন্তু আমাদের কদিন অন্ধকারে কাটাতে হবে বলো তো? দাদা কেমন সেবার মেইনটা বিগড়ে দিয়েছিলেন মনে আছে?

মিনতি।। যা বলেছ। রান্নাঘর থেকে চা-টা একটু নিয়ে এসো না ঠাকুরঝি, রেখে এসেছি? হাত দুটো জোড়া বলে আনতে পারলাম না।

অরুণা।। যাই।

বীরেন।। এ সব আবার কী আনলেন বৌদি?

মিনতি।। কী আবার? অন্ধকারে কী কিছু করার উপায় আছে? হাতড়েটাতরে যা পেলাম—

শিশির।। নে নে। অফিস থেকে এসেছিস—

বীরেন।। তুই?

শিশির।। আমি স্নানটান সেরে তারপর। যা গরম—

অরুণা।। এই যে চা—

বীরেন।। থ্যাঙ্ক ইউ।

শিশির।। এসো মা, এসো। দ্যাখো— কে এসেছে। চিনতে পারো? বীরেন। ওকে তোমার মনে আছে? সেই যে দেশের বাড়িতে—

সুধাময়ী।। ওমা— মনে থাকবে না? থাক থাক বাবা, বেঁচে থাকো, সুখে থাকো। কতটুকু ছেলে ছিল। খোকা না বলে দিলে বোধহয় হুট করে— তা কোথায় থাকো বাবা আজকাল?

বীরেন।। বাগবাজারে। আপনি ভালো আছেন মাসিমা?

সুধাময়ী।। আর বাবা, আমাদের আর ভালোমন্দ! ওই চলে যাচ্ছে সুখেদুঃখে। তা তুমি এখন কোন আপিসে আছ বীরেন?

বীরেন।। ও একটা মাড়োয়ারি মার্চেণ্ট ফার্ম।

সুধাময়ী।। বে থা করেছ তো?

বীরেন।। না না মাসিমা, ওসব ভাবিনা। বাউণ্ডুলে মানুষ, কখন কোথায় ভেসে যাই—

সুধাময়ী।। (হাসেন) পাগল ছেলে! এখনই তো নোঙর ফেলার সময়। সত্যি, কতকাল পরে তোমাকে দেখলাম। এসো কিন্তু মাঝে মাঝে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই তো— (বাচ্চার কান্না শুনতে পেয়ে) ঐ দ্যাখ, টুটুল বোধহয় ভয়

পাচ্ছে একা। তুমি বোস বাবা। আমি একটু—

বীরেন।। সত্যি, এ অন্ধকার তো আর সহ্য করা যাচ্ছে না রে শিশির? এভাবে দিনের পর দিন তোরা— নাঃ! কালই হাত লাগাবো কাজে।

শিশির।। তাহলেই বোঝ। এইটুকুতেই তুই—

বীরেন।। আসলে কী জানিস, তোর ওপর এদের কোনও আস্থা নেই তো, তাই তোর বন্ধু বলে আমার উপরেও ভরসা কম। কিন্তু সেটা তো ঠিক মেনে নেওয়া যায় না? ফলেন পরিচীয়তে। কার হাতে কী ম্যাজিক আছে কে বলতে পারে? শোন, শ-দেড়েক টাকা চাই আমার।

শিশির।। কেন?

বীরেন।। নিয়ে পালাবো।

শিশির।। ইলেকট্রিকের কাজ তুই জানিস?

বীরেন।। বিয়ে না করলেও বরযাত্রী তো গেছি। একবার ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার খেয়াল হয়েছিল। ... দ্যাখই না রে ব্যাটা, টাকাটা জলে যাবে না।

অরুণা।। দাদা, একটু শোনো এ ঘরে—

আবার ঘড়ির টিকটিক শোনা গেল।

শিশির।। কী বলছিস বল।

অরুণা।। উনি যখন বলছেন অত করে, দিয়ে দাও না টাকাটা? আসলে নিজে তো আর একা আসবেন না, একজন মিস্ত্রিটিস্ত্রি নিশ্চয়ই সঙ্গে করে আনবেন? মজা করছেন তোমার সঙ্গে। এ কী অবস্থা বলোতো নিত্যিদিন? ভালো লাগে?

শিশির।। বুঝলাম। কিন্তু অত টাকা এখন পাব কোথায়, মাসের শেষে?

অরুণা।। বেশ তো, এখন না হয় আমার থেকে নাও, মাসের গোড়ায় মাইনে পেয়ে দিয়ে দিলেই হবে।

শিশির।। তোর সেই টিউশানি— আচ্ছা, ঠিক আছে, নিয়ে আয়। উঃ! কী গরমটাই না পড়েছে আজকে— টুটুল ঘুমিয়েছে মা?

সুধাময়ী।। এই তো সমানে পাখা টেনে যাচ্ছি। একটু থামলেই— তা হ্যাঁ রে খোকা, বীরেনরা তো চক্কোত্তি, তাই না?

শিশির।। হ্যাঁ, কেন?

সুধময়ী।। চক্কোত্তিরা তো কুলীন বামুন নয়?

শিশির।। ও সব বাছবিচার কি আজকের দিনে কেউ করে মা? দিনকাল অনেক পাল্টে গেছে।

সুধাময়ী।। না— তাই বলছি, আমরা তো চাটুয্যে? কুলীন। চক্কোত্তিরা তো তা নয়।

তবে ছেলেটি দেখতে শুনতে কিন্তু বেশ হয়েছে। কতখানি লম্বা, দশাসই চেহারা, আর মুখখানাও বেশ মিষ্টি— মায়া পড়ে যায়।

ঘড়ির টিকটিক শব্দ।

মিনতি।। সত্যি সত্যি কাল থেকে কাজে লাগলে তো আপনার আপিসটা কামাই হবে ফরনাথিং?

বীরেন।। একেবারে ফরনাথিং নয় বৌদি, অফিস পালাবার এমন একটা সুযোগ— তা ছাড়া এমন চমৎকার এক্সপেরিমেণ্ট? এ কী হাতছাড়া করা যায়?

শিশির।। ইস্কুল পালানোতে ওর জুড়ি ছিল না, জানো তো মিনু? আর ব্যাগার খাটতে পেলে তো কথাই নেই! একবার কী হল, গোপাল ঘরামির সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমাদের দেশের বাড়ির আটচালাটা ছেয়ে দিয়েছিল বীরেন।

বীরেন।। (হাসে) তোর মনে আছে?

শিশির।। নেই আবার? ছুতোর বাড়িতে গিয়ে ওদের নৌকো গড়ার কাজে সাকরেদি করতো। তখন কত কী যে করেছে, এখন আর মনেও নেই। বরাবরের পাগলা! ওর সাধেরও সীমা নেই, সাধ্যেরও শেষ নেই।

বীরেন।। থাম থাম। ঢের হয়েছে— এবার আমি কাটবো।

শিশির।। নে, টাকাটা ধর। তবে আমি কিন্তু কাল অফিস কামাই করতে পারব না ভাই। জরুরি কাজ আছে।

বীরেন।। ও. কে. বস্।

দৃশ্যান্তর

দরজার কড়ানাড়ার শব্দ। দূর থেকে মিনতির গলা : কে?

মিনতি।। আরে, বীরেন ঠাকুরপো? আসুন আসুন।

বীরেন।। সকাল সকালই চলে এলাম বৌদি। কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম্। শিশির?

মিনতি।। ঘরে। তৈরি হচ্ছেন। অফিস বেরোবার তাড়া তো— এই সময়টায় ব্যারোমিটারের পারা ঘনঘন ওঠানামা করে। বসুন। এটি কে?

বীরেন।। আমাদের পাড়ারই এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির ছেলে। কানাই। বাচ্চা হলে কী হবে, বেশ চালাক চতুর।

মিনতি।। বোসো কানাই, বোসো। (হাসে) তোমার চেয়ে তো তোমার বিগ শপারটা বড়ো দেখছি?

বীরেন।। ওতে ওর মালপত্তর কম আছে নাকি? তা ছাড়া আপনাদের তার, বাটাম,

সুইচবোর্ড, হ্যানাত্যানা সাতসতেরো—

মিনতি।। সত্যি, পারেনও বাপু!

বীরেন।। মিস্ত্রিকে আর আনলাম না বৌদি। অনেক চার্জ। তারচেয়ে নিজেরাই দেখি না খেটেখুটে কী করা যায়।

মিনতি।। দেখুন। আমি আপনাদের চা নিয়ে আসছি।

বীরেন।। আরে না না, এখন এক্কেবারে ব্যস্ত হবেন না। অফিসটাইম। সারাদিন তো আছিই। শুধু একটা মই জোগাড় করা যায় কিনা দেখুন।

মিনতি।। মই?

বীরেন।। দেখুন, না পেলে অন্য কিছু ভাবতে হবে।

মিনতি।। ঠিক আছে, দেখছি।

ঘড়ির টিকটিক শব্দ।

শিশির।। বীরেনটা তাহলে সত্যিসত্যিই এসে গেল?

মিনতি।। আসবেন না? কাল টাকা নিয়ে গেলেন তো আসবার জন্যেই।

শিশির।। রুন্নাটা বললে, করিয়েই নাও, এত করে বলছে যখন—

মিনতি।। তা কী আর বুঝিনি? আমি বললেই তো তখন মাসের শেষ হয়ে যেত।

শিশির।। কী আশ্চর্য!

মিনতি।। করেছ, ভালোই হয়েছে। রোজ রোজ এত দুর্গতি! ছেলেপুলের ঘর। পারা যায়?

শিশির।। একটু চা-টা করে দিও। বন্ধুবান্ধব মানুষ—

মিনতি।। দেবো। সঙ্গে আবার একটা বাচ্চামতো ছেলে এনেছেন, কোন মিস্ত্রির ছেলে নাকি। বিগ শপার বোঝাই একগাদা মালপত্তর।

শিশির।। সত্যি, ওর খ্যাপামি আর গেল না! কী যে করবে শেষ পর্যন্ত?

সুধাময়ী।। হ্যাঁরে খোকা—

শিশির।। বলো মা?

সুধাময়ী।। বলছি, ওরা দুপুরে এখানে খাবে তো?

শিশির।। নিশ্চয়ই। নিজে থেকে উপকার করতে এসেছে, সারাদিন থাকবে, খাওয়াতে হবে বইকি? একটু যত্নটত্ন কোরো।

সুধাময়ী।। সে তোকে ভাবতে হবে না। ... ছেলেটাকে আমার বেশ লেগেছে।

মিনতি।। তোমার টিফিনবক্স।

শিশির।। দাও। পানটা? ও— পেয়েছি।

মিনতি।। একটা মইয়ের কথা বলছিলেন—

শিশির।। মই? মই এখন— আচ্ছা, পাশে শচীনবাবুর বাড়িতে একটা মই আছে না?

ঠিক আছে, আমি যাবার পথে বলে যাচ্ছি। চলি।

সুধাময়ী।। দুগগা, দুগগা।

ঘড়িতে আবার টিকটিক।

বীরেন।। ইয়েস বস্। অফিস চললে?

শিশির।। উপায় কী ভাই? দিনগত পাপক্ষয়। তুমি তাহলে সারাদিন বসে বসে এখন ভূতের ব্যাগার খাটো? সাকরেদটি তো জুটিয়েছিস বেশ। তা হ্যাঁরে— শেষ পর্যন্ত পারবি তো?

বীরেন।। দেখা যাক। তোর কপাল আর আমার হাতযশ!

শিশির।। দুপুরে কিন্তু এখানে খেয়ে যাবি তোরা।

বীরেন।। সে আবার কী?

শিশির।। জানিনে বাবা, মায়ের অর্ডার। চলি। ও হ্যাঁ, পাশের বাড়িতে বলে যাচ্ছি— ওদের বোধহয় একটা মই আছে। এ ছেলেটি নিয়ে আসতে পারবে না?

বীরেন।। খুউব। তুই ভাবিস না, আমরা ঠিক ম্যানেজ করে নেবো।

শিশির।। অলরাইট। বেস্ট অফ লাক।

বীরেন।। থ্যাঙ্ক ইউ।

ঘড়ির টিকটিক।

অরুণা।। এই যে মিস্ত্রিমশাই, আপনাদের চা নিন।

বীরেন।। যাক্, তবু আমাদের দিকে এতক্ষণে একটু নজর দেবার সময় হলো। চা-টা হাত বাড়িয়ে নে রে কানাই।

অরুণা।। বাব্বা, কত কী এনেছেন? এক্কেবারে পাকাপোক্ত মিস্ত্রি।

বীরেন।। তবে? যে পুজোর যে মন্তর! বসোই না?

অরুণা।। পাগল? এখন হাজার-একটা কাজ। আমাদের সংসারের অফিস তো আর আপনাদের মতো যখন ইচ্ছে কামাই করলে চলে না— সব চলে ঘড়ির কাঁটায়, বুঝলেন মশাই?

বীরেন।। কে জানে? সংসার তো করিনি—

অরুণা।। আছিই তো? কাজ করুন না— মাঝে মাঝে ঠিক খোঁজখবর নিয়ে যাবো।

বীরেন।। তথাস্তু।

ঘড়ির টিকটিক।

সুধাময়ী।। কানাইকে খেতে দিয়েছ বৌমা?

মিনতি।। হ্যাঁ মা, বারান্দায় বসেছে।

সুধাময়ী।। ভালোই করেছ। ওদিকটায় তবু একটু আলো-হাওয়া আছে। বুঝলে বাবা বীরেন, চোখে আর তেমন দেখতে পাই না আজকাল। একটা চোখে ছানি পড়েছে, তার ওপর নানা উঠকো ব্যাধি। কিছুই দেখতে শুনতে পারি না। তোমার খাওয়ার খুবই কষ্ট হল বাবা।

বীরেন।। তা আয়োজন বাড়িয়ে বৌদি কিছুটা কষ্টই দিয়েছেন বৈকি।

মিনতি।। আহা, কী এমন করতে পেরেছি? এমন বলেন—

সুধাময়ী।। দ্যাখো তো, মিছিমিছি অফিসটা কামাই করলে! যত অদ্ভুত খেয়াল। এসব মিস্তিরিদের কাজ, তাদের দিয়ে করালেই হতো। তোমার শখের সঙ্গে কি পারবার জো আছে?

মিনতি।। আরেকটু তরকারি দিই?

বীরেন।। পাগল নাকি? যা দিয়েছেন, তাই এখন সামলে উঠতে পারলে হয়।

মিনতি।। ছাই। আসলে আমাদের রান্না ভালো লাগছে না আপনার।

বীরেন।। বৌদি, ঘরে একটা ইকমিক কুকার। একা মানুষ দুটি ফুটিয়ে খাই। ভালো-মন্দ বাছবিচার করার শৌখিনতা কোথায় পাবো বলুন?

সুধাময়ী।। তা হ্যাঁ বাবা, কিছু মনে করো না, অফিসে কত করে পাও আজকাল?

বীরেন।। বলবার মতো কিছু নয় মাসিমা। ওই কেটেকুটে হাজারচারেকের মতো হয় কোনোমতে।

সুধাময়ী।। বল কী? চারহাজার কি কম হলো? আমাদের শিশির তো এখনও— আঃ! রুনা আবার গেল কোথায়? ওকে ডাকোনা বৌমা, পাখাটা নিয়ে বসুক এসে এখানে। বেচারি গরমে হাঁপিয়ে উঠেছে। কারো যদি কোনো আক্কেল থাকে তোমাদের।

ঘড়ির টিকটিক, হাতুড়ি ঠোকার ঠকঠক আওয়াজ।

বীরেন।। আসুন ম্যাডাম, আসতে আজ্ঞা হোক। বাড়িতে অতিথি এলে শুনেছি গেরস্থরা একটু দেখাশোনা করেন— তা এ বাড়ির দেখছি সবই উল্টো।

অরুণা।। বাঃ! আর সারাদিন যে আপনার জোগাড়ে হয়ে খেটে গেলাম তার বেলায়? মই আনো। জলচৌকি আছে? বালবটা একটু ধরোতো। এখানে কি নতুন সুইচ হবে? এতসব ফরমাস সারাদিন ধরে কে করছিল মশাই? একবার কি গা ধুতেও যাবো না?

বীরেন।। কে বারণ করেছে?

অরুণা।। তাহলে যে এত কথা শোনালেন? আপনার চেলাটি কোথায়?

বীরেন।। নেই।

অরুণা।। নেই মানে? ছেড়ে দিয়েছেন?

বীরেন।। না, বাইরে পাঠিয়েছি। বিড়ি আনতে।

অরুণা।। এ মা— আপনি বিড়ি খান? কেন? বললেই পারতেন— দাদার সিগারেট এনে দিতাম।

বীরেন।। জানা রইলো।

হাতুড়ির ঠুকঠাক শব্দ।

অরুণা।। তা এত যে কসরত করলেন ঃ সন্ধেবেলায় শেষপর্যন্ত জ্বলবে তো আপনার আলো?

বীরেন।। সন্ধেপর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কেন, আলো তো দেখছি আমার চোখের সামনেই জ্বলে উঠেছে।

অরুণা।। ধ্যাৎ। আপনি যদি আলো জ্বালতে পারেন তো কী বলেছি।

বীরেন।। তাই? রেডি, ওয়ান-টু-থ্রি।

যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠল।

অরুণা।। (উচ্ছ্বসিত) ও মা— সত্যি সত্যি জ্বালিয়ে দিয়েছেন? কী মজা!

বীরেন।। খুশি তো?

অরুণা।। খুব খুব।

বীরেন।। তাহলে আমার পুরস্কার?

অরুণা।। পুরস্কার? দাঁড়ান, সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছি। (কাগজের শব্দ) আপনি জাত মিস্ত্রির চেয়েও সেরা।

বীরেন।। থাক, আর বিদ্যে ফলাতে হবে না, (কাগজের শব্দ) ঢের হয়েছে।

জুতোর শব্দ দোতলায় উঠে আসছে।

অরুণা।। (চাপা গলায়) হাত ছাড়ুন, দাদা আসছে।

জুতোর শব্দ আরও নিকটবর্তী।

শিশির।। বাঃ! এ যে আলো ঝলমল! মিরাকল্ দেখালে যে ম্যাজিশিয়ান

আনন্দের পরিবেশ।

দৃশ্যান্তর

শিশির। তাইতো বলছি, আজ রোববারের ছুটির দিনে সিনেমার পাস পেলুম চারখানা, এখন বীরেনটাকে পেলে বেশ চারজনে মিলে যাওয়া যেত? এত উপকার করে গেল ছেলেটা! তা কোথায় কে?

মিনতি।। কেন, ধরে আনলেই তো হয়? ধরা দেবার জন্যে তিনিও নিশ্চয়ই দিন গুনছেন।

শিশির।। ধরবো কোত্থেকে? ঠিকানা কি জানি?

মিনতি।। ঠিকানার ভাবনা কী? ঠিকানা ঠিক লোকের কাছেই আছে। ঠাকুরঝি—

অরুণা।। ডাকছিলে বৌদি?

মিনতি।। হ্যাঁ, বলছিলাম, বীরেনবাবুর ঠিকানাটা জানো?

অরুণা।। কী জানি, কাঁটাপুকুর লেন না কী যেন বলেছিলেন। নম্বর জানি না তো?

শিশির।। (বিরক্ত) কী যে করিস।

মিনতি।। এই দ্যাখো দ্যাখো—

শিশির।। কী?

মিনতি।। এই জানলায় এসো। দ্যাখো তো— সেই ছেলেটা না?

শিশির।। কোন ছেলে?

মিনতি।। সেই যে— কানাই না কী নাম যেন? ওই যে বীরেনবাবুর সঙ্গে এসেছিল?

শিশির।। কই দেখি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। (চিৎকার করে) এই কানাই— কানাই? এই এদিকে একটু শোনো—

মিনতি।। যাক আসছে। ও ঠিক বলতে পারবে, দেখো?

দৃশ্যান্তর

ভদ্রলোক।। কাকে চাইছেন?

শিশির।। বীরেন চক্রবর্তীকে খুঁজছিলাম।

ভদ্রলোক।। (হেসে) লাইট বিগড়েছে তো? বিয়ের লগন... এখন কী আর... তাছাড়া আজ তো ওকে ছাড়তেই পারবো না ভাই, কালও না, সেই পরশু। ও বীরু মিস্তিরি, দ্যাখো কারা যেন তোমাকে খুঁজতে এয়েছেন—

বীরেন।। কে? কই, এ কী!!

বিলম্বিত লয়ে তারসানাই তীব্র কান্নার মতো বেজে ওঠে।

অ ভি ন য়া ং শে

অঞ্জন বিশ্বাস. মানস মিশ্র. রামজীবন মিত্র. ঊর্মিমালা বসু.
দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রীতত দত্ত চক্রবর্তী

প্রযোজনা / বিশ্বনাথ দাস

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত

সুশীল জানা
(১৯২১)

ফা ল তু

অফিসার. ভদ্রলোক. মহেশ. ব্রজ. হরিপদ. অনাদি. পরান. রাখাল।

কলকাতার রাজপথে যানবাহন চলাচলের শব্দ। একটি মিছিল এগিয়ে আসার দূরায়ত ধ্বনি শোনা যায়। মূল বক্তার শ্লোগান যানবাহনের শব্দে ম্রিয়মাণ কিন্তু সমবেত কণ্ঠে : "মানছি না মানবো না", "চলছে চলবে", "রুখছি রুখবো" ইত্যাদি ধ্বনি ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে। টেলিফোন বাজে। কেউ যেন ফোন তুলে কথা বলে।

অফিসার।। হ্যালো— ইয়েস্, হেডকোয়ার্টার্স... হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, আমিই বলছি। স্বাভাবিক। এ্যাঁ? হ্যাঁ। ... মিছিল তো বাড়তেই পারে... না না— ভায়োলেন্সের কোনো লক্ষণ না থাকলে ভয় কিসের? ইয়েস্, অ্যাজ-পার-ইন্সট্রাকশানই চলবে। ... ও. কে.।

টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ। সেই মিছিলের ধ্বনি নিকটতর হচ্ছে। সেই ধ্বনি ছাপিয়ে ক্রমে গড়গড়ার শব্দ স্পষ্ট হবে এবং সংলাপের মধ্যে মাঝে-মাঝে চলতে থাকবে।

মহেশ।। এই দিলাম কিস্তি। নাও, এবার তোমার রাজা সামলাও হে ব্রজ।

ব্রজ।। বসে না।

মহেশ।। এ্যাঁ?

ব্রজ।। বলছি— কিস্তি বসে না। ঘোড়ায় ধরা আছে। আড়াই।

মহেশ।। ও-হো-হো, তাই তো বটে। ও ঘুঁটিটায় তো নজর পড়েনি?

ব্রজ।। কী করে আর পড়বে? লোকে বলে— মহেশউকিলের নজর নাকি দিনরাত মক্কেলের পকেটের ওপরেই পড়ে থাকে, হ্যা হ্যা— নজর ফেরালে তবে তো দেখতে পাবে? নাও, চাল দাও।

মহেশ।। (বিরতি) ব্রজ, মনে হচ্ছে বাইরে কেউ যেন তোমাকে খুঁজছে!

ব্রজ।। আঃ, ছাড়ো তো? ছুটির দিনে যত উৎপাত! কাকে না কাকে খুঁজছে...

মহেশ।। যাকেই খুঁজুক, একবার ন্যাজ তুলে দেখতে ক্ষতি কী? কথায় বলে, খদ্দের লক্ষ্মী! (ভদ্রলোকের উদ্দেশে) ও মশাই, আপনি কি ব্রজবাবুকে খুঁজেছেন?

ভদ্রলোক।। (বাইরে থেকে) আজ্ঞে হ্যাঁ... ইয়ে... মানে, একটু...

মহেশ।। ঠিকই ধরেছি। পাশের গলিতে ঢুকেই প্রথম দরজা। খোলা আছে। ভেতরে চলে আসুন।

ভদ্রলোক।। (বাইরে থেকে) অনেক ধন্যবাদ।

মহেশ।। কী বুঝলে হে ব্রজলাল? নজর দেখেছ? যাকে বলে শকুনের দৃষ্টি! হ্যা হ্যা হ্যা...

ব্রজ।। স্বাভাবিক। শাস্ত্রে বলেছে— একশোটা শকুন মরেই নাকি একটা উকিল হয়।

মহেশ।। বিলক্ষণ বিলক্ষণ। বুঝলে ব্রজ, ছেলেবেলায় কী একটা পোয়েট্রিতে পড়েছিলাম— 'যখনই দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্যরতন।' ভেরি ইম্পর্ট্যাণ্ট কথা। পাইলে পাইতে পারো— আরে আসুন-আসুন। না না, জুতো খুলতে হবে না, সোজা চলে আসুন। বসুন।

ভদ্রলোক।। ধন্যবাদ।

চেয়ার টানার শব্দ।

মহেশ।। ইনিই ব্রজলাল আচায্যি— অ্যাডভোকেট।

ভদ্রলোক।। নমস্কার।

ব্রজ।। নমস্কার। ইনিই আমার বন্ধু মহেশ দত্ত... ভেরি একস্‌পিরিয়াল্সড ল-ইয়ার। অসুবিধে না থাকলে ওঁর সামনেই বলতে পারেন।

ভদ্রলোক।। না না, অসুবিধে কিসের? এতো বরং ভালোই হলো। আপনারা দুজনেই যখন এ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি... আমি আসলে মানে... ইয়ে, অসময়ে এসে আপনাদের বিরক্ত করলুম...

মহেশ।। না না, বিরক্ত কিসের? মানুষ তো মানুষের কাছেই আসবে, বলুন?

ভদ্রলোক।। ইয়ে, মানে... একটা লোকের খোঁজ করছিলাম...

ব্রজ।। লোক?

ভদ্রলোক।। আজ্ঞে হ্যাঁ, রোগামতো, কালোমতো, লম্বায় ধরুন বড়োজোর পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চিটাক হবে? এ এলাকায় নতুনই এসেছে। চেনেন নাকি?

ব্রজ।। চেহারার যা বর্ণনা দিলেন-- অ্যাভারেজ বাঙালিমাত্রেরই তো এই চেহারা। নাম কী?

ভদ্রলোক।। তা হলে তো সমস্যা মিটেই যেত। বয়েস ধরুন, বছর চল্লিশেক হবে? জুলপির কাছে দু-চারটে চুলে পাক ধরেছে। এমনিতে শান্তশিষ্ট দেখতে....

মহেশ।। এ এলাকায় নতুন এসেছে বলছেন?

ভদ্রলোক।। আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়োজোর মাসছয়েক?

মহেশ।। কে বলো দেখি?

মহেশ।। আরে ওই যে— সেই পুবপাড়ার কেরানিটোলার দিকে থাকতো হে...

ব্রজ।। দাঁড়াও দাঁড়াও, মনে পড়েছে... একটা তাপ্পিমারা থলে হাতে করে বাজারের দিকে মাঝে মাঝে যেত। হ্যাঁ, কী যেন নাম?

মহেশ।। বলছি.... শচীবিলাস.... না না, শ্রীবিলাস। হ্যাঁ— শ্রীবিলাস রায়।

গড়গড়ায় তামাক টানার শব্দ।

ব্রজ।। না হে, মনে হচ্ছে ওর নামটা যেন শুধু বিলাস। শচীও নয়, শ্রীও নয়। কারণ আমার কাছে লোকটা একদিন এসেছিল কোন এক বিধবার কী একটা ব্যাপার নিয়ে...

মহেশ।। আরে সেই তো ওর বাড়িউলি... সেই-যে মদের দোকান ছিল না? মুরারী সাহা? তারই বিধবা। ওদের বাড়ির নিচের তলাতেই তো থাকে বলে শুনেছি।

মহেশ।। তা তোমার কাছে এসেছিল, নিশ্চয়ই ওই বিধবার বাড়ি সম্পর্কে অথবা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সের ব্যাপারে কিছু...

ব্রজ।। একজ্যাক্টলি। (তামাক টানার শব্দ) আচ্ছা, শুনছি ওই বিধবা মহিলাটির নাকি একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে?

মহেশ।। ঠিকই শুনেছ।

ব্রজ।। তাছাড়া ও বাড়িটারও কিছু বদনাম... অবিশ্যি কানাঘুসোয় শুনেছি.....

মহেশ।। তাহলে তোমার কানেও এসেছে?

ব্রজ।। উপায় কী? কান যখন আছে। অন্ধকার বলে কি আর গন্ধ চাপা থাকে?

মহেশ।। বটেই তো, তার ওপর গন্ধটা যদি আবার একটু আঁশটে হয়, কী?

ব্রজ।। হ্যা হ্যা, বলেছ ভালোই। তবু আর একটু খোলসা করো তো বাপু, বুঝে দেখি।

মহেশ।। বোঝাবুঝির কিছু নেই হে। বাড়িতে দুটি মেয়েমানুষ একা রেখে মুরারী সাহা তো চোখ বুজলো। একটি বিধবা, আর একটি বিবাহযোগ্যা। আর রয়ে গেল মদ-বেচা থাউকো কিছু কাঁচা পয়সা। এমন কামিনীকাঞ্চনের মোহ কি আর ছাড়া যায় ভাই? যথাকালে ওই পরিবারের একান্ত উপদেষ্টা হিসেবে আবির্ভাব হলো তোমাদের ওই অবলাবান্ধব শচীবিলাস— না শ্রীবিলাস— না কী শুধু বিলাসের। ব্যাস।

গড়গড়ায় তামাকটানার শব্দ।

ব্রজ।। তাহলে লোকটা খুবই পরার্থপর বলো? হ্যা হ্যা— মধুর খোঁজে মৌমাছি তো আসবেই। তা মধুর কোনটি?

মহেশ।। শুনেছি তো দুটোই। একটি মধুর আর একটি মধুরতর! হ্যা হ্যা....

ব্রজ।। তা তুমি তো দেখি অনেক খবরই রাখো হে মহেশ?

মহেশ।। আরে, আমার মুহুরি হরিপদর যে একদা ওটাই ছিল মধু-বৃন্দাবন। চেনো তো হরিপদকে, কী ঘোড়েল মাল? তা ওই বিলাসই এসে তাকে শেষপর্যন্ত ঘায়েল করে দিলে! তারপর থেকে বেচারি তো আর ওমুখো হতেই পারলো না। আহাহা, আফশোষ কী কম?

ব্রজ।। অবিশ্যি ছুটির দিনে আমি কিন্তু কখনোসখনো বউ-ছেলেপুলে নিয়ে ওকে গঙ্গার দিকে বেড়াতে যেতে দেখেছি—

মহেশ।। আরে তাতে কী আর শাক চাপা দিয়ে মাছ ঢাকা যায় হে? একটা চরিত্রহীন লুচ্চা।

ভদ্রলোক।। আমি তাহলে আজ উঠি....

ব্রজ।। ও হ্যাঁ... এই তো শুনলেন সব। ওর বেশি আর কিছু জানি না আমরা। মানে, আমাদের সঙ্গে তো বিশেষ মেলামেশা নেই, বুঝতেই পারছেন...

ভদ্রলোক।। আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে যেটুকু শুনলাম, তাতে মোটামুটি একটা ছবি পাওয়া গেল... আচ্ছা, নমস্কার।

দূরায়ত মিছিলটি যেন আরো কিছুটা এগিয়ে এসেছে। সমবেত কণ্ঠের শ্লোগান এখন যেন পূর্বাপেক্ষা স্পষ্ট। যানবাহনের শব্দে রাজপথ মুখর। দূর থেকে একটা ভ্যান এগিয়ে এসে থামলো। অন্য অফিসার ওয়্যারলেসে কথা বলছে।

অন্য অফিসার।। হেড কোয়ার্টার্স? ... ইয়েস স্যার। পার্ডন? ... ইয়েস স্যার, এদিকে প্রোটেকশানের সব ব্যবস্থাই ঠিক আছে... না না, সে সব কিছু ভাবছি না... মুশকিল হচ্ছে প্রোসেশনের সামনের দিকটায় কেবল মেয়েরা রয়েছে... অল রাইট স্যার... না না, নিশ্চয়ই জানাবো— ছাড়ছি?

মিছিলের শব্দ আবার বাড়তে থাকে। পুলিশের গাড়িটা দূরে চলে যায়।

দৃশ্যান্তর

কড়ানাড়ার শব্দ।

নেপথ্যে।। কে?
ভদ্রলোক।। হরিপদবাবু আছেন?

দরজা খোলার শব্দ।

জনৈক।। কোত্থেকে আসছেন?
ভদ্রলোক।। আপনিই হরিপদবাবু?
জনৈক।। আজ্ঞে না, উনি। আমি অনাদি পাত্র। আমরা দুজনেই মুহুরি। উনি পরেশ দত্তর, আমি ঘনশ্যাম হালদারের।
হরিপদ।। তা কী কেস আপনার?
ভদ্রলোক।। বলছি। ভেতরে আসতে পারি?
হরিপদ।। নিশ্চয়। আসুন। (চেয়ার টানার শব্দ) ইয়ে— চা খাবেন?
ভদ্রলোক।। চা? মন্দ কী। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।
হরিপদ।। অনাদি, আর একটা বলে দে।

দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ।

হরিপদ।। এইবার চট করে বলে ফেলুন তো কিসের মামলা? ও ব্যাটাকে ওই জন্যেই সরিয়ে দিলাম। মুখে শুধু লম্বাচওড়া, কাজের নামে টুঁ-টুঁ। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই, সব কিছুতেই নাক গলানো স্বভাব। মোটে পাত্তা দেবেন না ওকে। ... আমার কিন্তু শস্তার সিগারেট, চলবে?
ভদ্রলোক।। ধন্যবাদ, আমি খাই না।
হরিপদ।। খুব ভালো, ভেরি গুড। অতি বদ অভ্যেস মশাই। ভেরি ইনজুরি...

দেশলাই জ্বলে উঠলো। মৌজ করে সিগারেটে টান দেবার শব্দ। পরক্ষণেই কাশি।

ভদ্রলোক।। বিলাস রায় বলে কাউকে চেনেন? নতুন এসেছে? ওই যে মদের দোকান ছিল মুরারি সাহার....

হরিপদ।। ব্যাস ব্যাস, আর বলতে হবে না— খুব চিনি। চিটিং কেস তো?

ভদ্রলোক।। প্রায়।

হরিপদ।। হবেই। ও আমি আগেই জানতাম। আরে মশাই, ওর জন্যে আড়াল-আবডাল কি— ওকে তো আমরা সব্বাই চিনি...

দরজা ঠেলার শব্দ। চায়ের গ্লাসের টুং-টাং আওয়াজ।

অনাদি।। দে, এই দাদাকে আগে দে। ধরুন দাদা, হরিপদ দা ধরো...

হরিপদ।। (সশব্দে চুমুক) আঃ! ... বুঝলি অনাদি, তোদের বলিনি ওই বিলাসের কথা? এবারে কান করে শোন— দাদাকে কী ভাবে ফাঁসিয়েছে হারামজাদা! ওরে বাবা, হরিপদ নন্দী ছায়া দেখলে মানুষ চেনে। ... তা কত টাকায় ফাঁসলেন?

ভদ্রলোক।। মানে, ঠিক টাকা নয়... ইয়ে, একটা জমির ব্যাপারে... মানে...

হরিপদ।। জমি? কিনবেন? ওর কাছ থেকে? খেয়েছে। ওর যে চালাচুলো কিছুই নেই মশাই? তবে নেই বলেই বোধহয় 'আত্মবৎ' সব কিছু! আহা, গোপাল বড়ো সুবোধবালক, যাহা পায় তাহাই খায়। তা সে টাকা-পয়সা, জমিজিরেত, বৌ-ঝি, যাই হোক— কিছুই বাদ যায় না। পয়লা নম্বরের ফোরটোয়েণ্টি মশাই। কোত্থেকে যে এখানে এসে পত্তন গাড়লো! আবার ঢুকলো গিয়ে কিনা ওই বজ্জাত মাগিটারই ঘরে? আরে, ওই যে মুরারি সাহা বললেন না? তাঁরই তো বিধবা ওই প্রভাবতী!

অনাদি।। প্রভাবতীর ওপর তোমার রাগ আছে হরিপদদা, তুমিও তো ওখানে সেঁধোবার চেষ্টা করেছিলে একদিন! আহা রে অঢেল টাকার বিধবা মালকাইন...

হরিপদ।। বাজে বকিসনে। মুরারি মরতে আত্মীয়স্বজনরা ওকে উৎখাত করার চেষ্টা করছিল না? সেইজন্যেই তো মোকাদ্দমার ব্যাপারে পরামর্শ নিতে মাঝেমাঝে ডেকে পাঠাতো। আমারই তো মক্কেল ছিল....

অনাদি।। ছিল। তবে শুনেছি বিলাস এসে তোমার নাকি আক্কেল দাঁত উপড়ে দিয়েছিল? আমি জানি না, পাঁচজনে বলাবলি করে— তাই শুনি।

ভদ্রলোক।। যাক যাক— এ সব ব্যক্তিগত আলোচনায় কাজ নেই। আচ্ছা

হরিপদবাবু, ওই পরান মুদি লোকটা কেমন? শুনেছি ওর সঙ্গে নাকি বিলাসের খুব ভাবসাব? বাড়িতে পর্যন্ত যাতায়াত আছে?

হরিপদ।। এ্যাই— এ্যাই— এ্যাই। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি বোঝেন? একদিকে ধড়িবাজ পরান, অন্যদিকে ফোরটোয়েণ্টি বিলাসচন্দ্র। একেই বলে রাজযোটক। নির্ঘাত মোটা টাকা ধার খেয়েছে ওই পরানের দোকানে। নইলে তাগাদা ছাড়া আর কোন কুটুম্বিতে করতে ওর বাড়িতে যাবে পরান? ব্যাটাকে দেখলে আমারই তো পরান উড়ে যায়।

অনাদি।। সে তো তোমারই পরানের কাছে অনেক ধারবাকি আছে তাই। কিন্তু ওই যে রাখাল সা— এখন যার মদের দোকান, তার সঙ্গে তো রাত নটার পর বিলাসকে খুব গল্পসল্প করতে করতে ফিরতে দেখি মাঝে মাঝে। কী? শুনে চমকালে নাকি?

হরিপদ।। চমকাবার কী আছে? খোঁজ নিয়ে দেখ গে যা— ওই মদের দোকানে কমপক্ষে পাঁচশোটাকার ধার খেয়েছে ওই বিলেস। আহাহা, প্রভাবতী বাড়িউলি রয়েছে ঘরে, আর ওগুলো সব— কী যে বলে...অনু... অনু... অনুপান। হ্যা হ্যা হ্যা....

অনাদি।। কী যে বলো তার ঠিক নেই। ওই একই বাড়িতেই তো বউ ছেলে নিয়ে বাস করে বিলাস। রাখাল সা-র মেয়েরাও তো ওর বাড়িতে যায় দেখেছি মাঝেমধ্যে।

হরিপদ।। ও ব্যাটাচ্ছেলের নির্ঘাৎ কন্যারাশি বুঝলি না? মেয়েছেলের ব্যাপারে ওর স্টারটা খেলে ভালো। মাঝেমাঝে ওর বউটা যে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে... কেন করে বল দেখি?

অনাদি।। কেন-র কী আছে। ঘর-সংসারে মাঝেমধ্যে একটুআধটু ঝগড়াঝাঁটি হয়েই থাকে।

হরিপদ।। আমি তোকে বলে দিচ্ছি অনাদি, একদিন একটা খুনখারাপি হবে ওই বাড়িতে— দেখে নিস তোরা? সেদিন সব কেচ্ছা বেরিয়ে পড়বে। গরিবের কথা বাসি না হলে তো আর....

অনাদি।। তোমার কথা বাসি হবে কিনা জানি না হরিপদদা, তবে গত রথের মেলায়ও দেখেছি ছেলেমেয়েদের হাতে তালপাতার বাঁশী আর পাঁপড় ভাজা কিনে দিয়ে কর্তা-গিন্নী দুজনে পথ চলেছে ডগমগ হয়ে।

হরিপদ।। তাতে কী? তাতে প্রভাবতীর সঙ্গে ওর যে ইয়ের ব্যাপারটা, সেটা তো আর...

ভদ্রলোক।। আমি তাহলে আজ উঠি? অনেক উপকার হলো আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে...

হরিপদ।। উঠবেন? আসুন তাহলে। তবে বিলাসের ব্যাপারে কিন্তু সাবধান মশাই। ফট করে কোনো জমি জায়গা কিনবেন না। কেনার দরকার থাকলে এখানে আসবেন, শস্তায় ভালো জমির ব্যবস্থা করে দেবো আমরা। বিলাস ব্যাটা পয়লা নম্বরের চিটিংবাজ!

মিছিল ক্রমান্বয়ে নিকটতর হচ্ছে। জনকণ্ঠ বলিষ্ঠ ও অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। যানবাহনের শব্দও সঙ্গে সমতা রেখে চলছে।

দৃশ্যান্তর

পরাণ।। সাত আর দুই নয় পাঁচে চোদ্দ আর ছয় কুড়ি আর তিনে তেইশের তিন নামে, হাতে রইল দুই— দুই দুই দুই আর তিনে পাঁচ আর সাতে বারো আর—

ভদ্রলোক।। আপনার নাম কি পরান—

পরান।। আজ্ঞে হ্যাঁ, পরানচন্দ্র গড়াই। পিতার নাম ঈশ্বর...

ভদ্রলোক।। বিলাস রায়কে চেনেন?

পরান।। নিশ্চয়। ওই যে শাদা বাড়িটার বাঁ-হাতি—

ভদ্রলোক।। লোকটা কীরকম?

পরান।। আজ্ঞে খুব ভালো... সদাশয় ব্যক্তি... তবে আমার একটু ক্ষেতি করে দিয়েছেন....

ভদ্রলোক।। ক্ষতি? কী রকম? টাকা বাকি? কত?

পরান।। বাকি যৎকিঞ্চিৎ— সে তো সব বাবুদেরই বাকি থাকে। তা সে ক্ষেতির কথা হচ্ছে না। ক্ষেতি হলো আমার ছেলেটারে নিয়ে—

ভদ্রলোক।। কী রকম? বদসংসর্গে ভিড়িয়েছে বুঝি?

পরান।। আজ্ঞে না না, ছি ছি। আসলে ছেলেটা আমার এইট-কেলাস অবধি পড়েছিল— তারপর থেকে ওরে দোকানে বসিয়েছিলাম। তা বিলাসবাবু আমারে বুঝিয়েসুঝিয়ে ওরে আবার ইস্কুলে ঢুকিয়ে দিলেন। শুনেছি ছোঁড়াটার নাকি লেখাপড়ায় খুব মাথা, মাস্টারমশাইরা সুখ্যাত করেন খুব... তা লাভের মধ্যে এই হলো— বুড়োবয়সে এখন একা এই মুদি দোকানের জোয়াল টেনে মরছি আমি (হাসে)। তা আপনি কি—

ভদ্রলোক।। বলছি। আচ্ছা ওই প্রভাবতীটা কে? তার সঙ্গে বিলাসের কী সম্পর্ক?

পরান।। সম্পক্ক? বিলাসবাবুরে বৌদিদি ভগবানের মতো ভক্তি করেন। কী বলবো, ভক্ত আর ভগবানের সম্পক্কও বলতি পারেন।

ভদ্রলোক।। কিন্তু প্রভাবতীর তো শুনেছি খুব বদনাম? তাছাড়া বিলাসেরও তো বউছেলেমেয়ে আছে...

পরান।। বাবুমশাই— অবলা মেয়েছেলের গায়ে কাদা ছিটোতে কতক্ষণ লাগে বলেন তো? তারা তো আর সাফাই গাইতে পথে বেরুবে না?

দুটো কুকুর ঝগড়া করছে। দূরে একটা সাইকেল রিকসা হর্ন বাজিয়ে চলে গেল।

ভদ্রলোক।। থাক সে কথা। আচ্ছা, বিলাস লোকটা বুঝি খুব অহংকারী? গোঁয়ার টাইপের? বদমেজাজি?

পরান।। আজ্ঞে তা-তা.... মানে কখনোসখনো... মানে, সে রকম ঠিক... মানে এমনিতে তো খুব ঠাণ্ডা! অমন ভদ্র, শান্ত মানুষ এ তল্লাটে তো বড়ো একটা চোখে পড়ে না বাবু!

ভদ্রলোক।। আশ্চর্য? ... আচ্ছা চলি।

পরান।। আজ্ঞে আপনার নাম? পরিচয়?

ভদ্রলোক।। জানার দরকার নেই।

এবারের মিছিল যেন আরো কাছে। ক্রমশঃ তার উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাচ্ছে তীব্রতা। যানবাহনের শব্দ যেন ম্রিয়মান।

দৃশ্যান্তর

বোতল-গ্লাসের টুং-টাং। মদ ঢালার শব্দ। মাতালদের হল্লোড়, মাতলামি।

ভদ্রলোক।। আপনি তো মদ বিক্রি করছেন, লাইসেন্স আছে?

রাখাল।। নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক।। আপনার নাম?

রাখাল।। শ্রীরাখালচন্দ্র সাহা।

ভদ্রলোক।। কিন্তু এ দোকানের মালিকের নাম তো মুরারি সাহা?

রাখাল।। আজ্ঞে, তিনি গত হবার পর তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে আমি কিনে নিই। কিন্তু আপনি কি....

ভদ্রলোক।। সে কথা পরে হবে। মদের জন্যে বিলাস রায়ের কাছে আপনার কত পাওনা?

রাখাল।। পা-ও-না? বিলাসবাবুর কাছে? এক পয়সাও না?

ভদ্রলোক।। সব মেটানো আছে তাহলে?

রাখাল।। বলেন কী? উনি আবার মদ খেলেন কবে?

ভদ্রলোক।। মানে? আপনি ওকে কখনও মদ বেচেন নি?

রাখাল।। কখনো বেচি নি— মানে, একবার একটা ব্যাণ্ডি কিনেছিলেন ওর স্ত্রীর ছেলে হবার পর। সেটা আমিই কিনিয়ে দিয়েছিলাম। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছিল।

মাতালদের কোলাহল বেড়ে ওঠে। গ্লাসে মদ ঢালার শব্দ।

ভদ্রলোক।। আপনার সঙ্গে তো ওর খুব দহরম-মহরম। আপনার ছেলেমেয়েরাও পর্যন্ত যাওয়া-আসা করে ওর বাড়ি....

রাখাল।। তা করে। আমার মেয়েকে যে উনি পড়ান।

ভদ্রলোক।। মাইনেটাইনে নেন? নাকি বিনে পয়সায়? মাঝেমধ্যে ব্র্যাণ্ডিট্র্যাণ্ডি...

রাখাল।। (ঈষৎ কঠিন গলায়) না, উনি টাকা নেন। আর কিছু?

ভদ্রলোক।। আচ্ছা প্রভাবতী নামে এক মহিলার সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?

রাখাল।। (বিরক্ত) আপনার কী দরকার?

ভদ্রলোক।। দরকারটা আমার নয়— ওপরমহলের। গোপন করার কিংবা বাধা দেবার চেষ্টা করলে বিপদে পড়বেন।

রাখাল।। প্রভাবতী আমার বৌদি। মুরারী সাহা ছিলেন আমার জ্যাঠতুতো দাদা। পাড়ারলোকের বদ-মতলবে মাঝে বৌদির সঙ্গে একটা মামলার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম— বিলাসবাবুই তখন মধ্যস্থতা করে সেটা মিটিয়ে দেন। সে কারনে আমি আর বৌদি, কী বলবো, দুজনেই ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ভদ্রলোক।। ঠিক আছে, চলি।

রাখাল।। আপনার পরিচয়টা—

ভদ্রলোক।। সময়মতোই জানতে পারবেন।

চর্তুদিক থেকে যেন পুলিশের বাঁশী তীব্র স্বরে বাজে। মিছিলের ধ্বনি তার মধ্য থেকে তীব্রতর। শব্দের মধ্যে ক্রমে যেন যুদ্ধমান শরীর স্পষ্ট হতে থাকে। চূড়ান্ত মুহূর্ত যেন আসন্ন।

দৃশ্যান্তর

মহেশ।। খবর শুনেছ ব্রজ? আজ কলকাতায় নাকি গুলি চলেছে....

ব্রজ।। গুলি? হঠাৎ?

মহেশ।। কী একটা মিছিল নাকি বেরিয়েছিল...

ব্রজ।। সে তো হামেশাই বেরুচ্ছে। আজ চাল নেই, কাল কাপড় নেই, পরশু

কেরোসিন চাই— দাবির কী আর অন্ত আছে?

মহেশ।। মেয়েরাই নাকি ছিল সামনের দিকের অনেকটা জুড়ে...

ব্রজ।। উপায় কী? সংসার সামাল দিতে গেলে অসূর্যম্পশ্যাদের বাইরে না বেরুলে এখন আর চলছে কই? আর পুলিশই বা কী করবে হে? পরিস্থিতি সামলাতে না পারলে লাঠি-গুলি চালাতেই হয়।

মহেশ।। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা— কে একটা খ্যাপামতো লোক নাকি গুলির মুখে ছুটে যায় মেয়েদের আড়াল করতে—

ব্রজ।। সে কী? তারপর? মরে গেছে নাকি?

মহেশ।। প্রায়। শুনলাম তো অ্যাম্বুলেন্স এসে নাকি নিয়ে গেছে হাসপাতালে।

ব্রজ।। কে আনলে খবরটা?

মহেশ।। ওই যে কেরানিপাড়ার হরেন সোম। অফিসের জানলা দিয়ে নাকি পুরো ব্যাপারটা দেখেছে! বললে— গুলি চলার মুখে উনি নাকি ছুটে গিয়েছিলেন মেয়েদের সামনে দুহাত মেলে গুলি আটকাতে। (হাসে) কোনো মানে হয়?

ব্রজ।। (তাচ্ছিল্য) মিছিলের চাঁইটাই হবে বোধ হয়?

মহেশ।। না হে, বললে তো অফিসফেরতা বাড়ি ফিরছিল। ... এক্কেবারে সাধারণ। মনে হয় কেরানি-টেরানি হবে—

ব্রজ।। আশ্চর্য!

মহেশ।। (হাসে) খ্যাপা... পুরো খ্যাপা...

তীব্র গুলির শব্দ... অগণ্য মানুষের চিৎকার, ক্ষোভ, আর্তনাদ, গাড়ির ছুটোছুটি— হঠাৎ সব শব্দ থেমে যায় আকস্মিক। ... একটা কাক ডাকছে। পুলিশের প্যারেড... টেলিফোন বাজে... কেউ যেন তুললো।

দৃশ্যান্তর

অফিসার।। ইয়েস, হেড কোয়ার্টাস... স্পিকিং... নো, ইটস ইমপসেবল্.... ইয়েস্... ইয়েস্... অলরাইট... টেক ইট ইজি... ইয়েস... ও. কে.।

টেলিফোন রাখার শব্দ।

দৃশ্যান্তর

ভদ্রলোক।। মে আই কাম ইন স্যার?

অফিসার।। ইয়েস। ও আপনি? কোনো খবর পেলেন?

ভদ্রলোক।। পাওয়া গেছে স্যার। আর দশজনের মতোই অতি সাধারণ—কমোনার। মোস্ট নেগলিজিবল্... নন-পোলিটিক্যাল এলিমেণ্ট। নেহাৎই ফালতু লোক স্যার...

অফিসার।। লাসটা কী ওর বাড়ির লোকেরা নিয়ে গেছে?

ভদ্রলোক।। ইয়েস স্যার।

অফিসার।। বাঁচা গেছে। ও. কে.।

দৃশ্যান্তর

একাধিক শঙ্খ ও উলুধ্বনি শোনা যায়। মৃদু বিলাপ ছাপিয়ে সমবেত কণ্ঠে হরিধ্বনি ভেসে আসে। মিছিল ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসতে থাকে।

ব্রজ।। (দূরের কাউকে) কে মারা গেল হে?

জনৈক।। (দূরে থেকে) একজন মানুষ। কাল পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন।

ব্রজ।। নাম কী?

জনৈক।। বিলাসমোহন রায়।

মহেশ।। ছাড়ো তো—? নেহাতই ফালতু লোক!

সমবেত।। বল হরি হরিবোল... বল হরি হরিবোল...

নিচু গলায়

মিছিলটি ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। যন্ত্রসংগীতে "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো" সুরটি মিলিটারি ব্যাণ্ডের মতো বাজতে বাজতে দূরে চলে যায়।

শ্যামল ঘোষ
(১৯৩৩)

কা র্গি লে র মা

প্র স্তা ব না

'আমার মা' নিয়ে লিখতে চেয়েছিলাম। হলো না। সেই প্রিয়তমা শ্রেয়সী রমণীটি আমাকে ছেড়ে গেছেন কোন শৈশবে... তাঁর ধূসর বিমূর্তস্মৃতি ছাড়া আজ আর কিছুই অবশেষ নেই। এখন জীবনের প্রান্তিক সময়ে এসে সেই স্মৃতি গভীর রাতে যুঁইফুলের স্নিগ্ধগন্ধের মতো সহসা ভেসে আসে। আমার সমস্ত চেতনা তখন নিবিড় ঘুমের নীলে মজ্জমান। আমার স্বপ্নের পাখিরা দূর আকাশে পরিযায়ী হয়ে কোথায় উড়াল দেয় হদিশ পাইনে। একদিন ফিরে আসবে এই আকাঙ্ক্ষাতেই আমার আমরণ প্রতীক্ষা।

দুর্ভাগ্য, আমার মায়ের মুখটুকু আজ আর তেমন মনে পড়ে না। তাই বোধহয় পৃথিবীর সব মায়ের মুখই আমার মায়ের মুখের সঙ্গে মিলে যায়। তাঁর নাম ছিল শৈলবালা। শৈলবালা তো পর্বতদুহিতা। পাহাড়ের মেয়ে। তাই তেমনি এক শৈলবালা মায়ের গল্প, নাটুকে মানুষ আমি, শ্রুতিনাট্যের আদলে লিখে ফেললাম। এ আমাদের সম্প্রতিকালের এক রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা। আমার সেই শৈলবালা মা তাই আমারে স্মৃতিতে এখন 'কার্গিলের মা' হয়ে গেছেন।

মা. শবনম. পরভেজ. কায়ুম. ঘোষক

একটি হেলিকপ্টার উড়ে আসছে দূর থেকে। প্রথমে একটা। তারপরে অনেক। উড়ে আসছে, উড়ে যাচ্ছে। দূরে গোলাগুলি ফাটছে। যুদ্ধ চলছে কোথাও বোঝা যাচ্ছে। একটুকাল পরে কড়া নড়ল দরজায়। মৃদু। কোথায় যেন ম্যাণ্ডোলিনে পাহাড়ি সুর বাজছে।

মা।। কে?

শবনম।। আমি।

মা।। শবনম? দাঁড়া, খুলছি। (দরজাখোলার শব্দ। মোরগ ডাকে। মা অবাক) ওমা, মুরগা পেলি কোথায়?

শবনম।। রহমতচাচার কাছে। নিয়ে এলাম একটা। বলেছি, এ হপ্তার সরকারি ক্যাশডোল পেলেই দামটা দিয়ে আসবো।

মা।। কী দরকার ছিল? কালই তো মাণ্ডি থেকে সব কিনে আনলি! সজ্জি, আণ্ডা, গেহু.. দুটো তো মানুষ আমরা... (মোরগ ডাকে) এখন কী আর চাইলেই আগের মতো চলতে পারবো মা?

শবনম। না মানে— আসলে রহমতচাচা বললো কিনা, ভাইজান নাকি আজ কী একটা কাজে আসছে এদিকে? তাই ভাবলাম—

মা।। কে? পরভেজ? (সাগ্রহে) এখানে আসবে? আজ? (অবিশ্বাস) যাঃ!

শবনম।। হ্যাঁ গো আম্মি, আমাদের ক্যাম্পের অফিসে নাকি ভাইজানের টেলিফোন এসেছিল। রহমতচাচা ছিলেন তো তখন ওখানে? খবরটা শুনে নিজেই আসছিলেন। তা হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে—

মা।। তাই? (ব্যাকুল) তা হ্যাঁ রে, কী বললো পরভেজ? কেমন আছে? কোথায় আছে এখন?

শবনম।। দূর, অত কথা হয়েছে নাকি? বলল, ওরা নাকি বদলি হয়ে এখানে এসেছে কদিন আগে।

মা।। এখানে মানে?

শবনম।। এখানে মানে— আমাদের কার্গিলে? এই তো ঘরের পাশেই। ষাট-সত্তর কিলোমিটার আবার দূর নাকি? তাছাড়া ওখানে তো এখন আমাদের মতো মানুষজন কেউ নেই? সবই মিলিটারি। আমরা যে কোথায় আছি সেটাই তো জানতো না ওরা। আজই নাকি পেয়েছে খবরটা।

মা।। কিন্তু কার্গিলে তো শুনছি ভীষণ যুদ্ধ চলছে এখন?

শবনম।। চলছেই তো। (হাসে) সেইজন্যেই তো ওরা ওখানে এসেছে— আর সেইজন্যেই আমরা এখানে পড়ে আছি। (মোরগ ডাকে) ওরে বাবা, এখন গল্পগাছা মাথায় থাক। রসুইটা সেরে নিই আগে চটপট। ফস্ করে কখন আবার চলে আসবে, আর এসেই বলবে— 'ভুখ্ লাগ গিয়া বহিন, খানা লাগাও'— তখন?

মা।। কখন আসবে-টাসবে কিছু বললো? আগের চিঠিতে তো লিখেছিল এ মাসের শেষে ওর ছুটি পড়বে। (দূরে ম্যাণ্ডোলিনে পাহাড়ি সুর) সেই থেকে দিন গুনছি। ওর জন্যে যে মাফলারটা বুনেছিলাম--

শবনম।। লড়াই লাগলে কী আর ফৌজিরা ইচ্ছেমতো ছুটি পায় আম্মি? যখন-তখন? তাছাড়া এখন ফিরবেই বা কোথায়? বাড়ি কই আমাদের? ঘর-দোর জমিজিরেত সব ফেলেই তো এখানে এসেছি আমরা। কার্গিলের সব্বাই এই ক্যাম্পে।

মা।। চুপ কর। (শ্লেষ) ক্যাম্প। এর নাম ক্যাম্প? খোঁয়াড়ের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের মতো গাদাগাদি করা কতকগুলো মানুষ। ... জোর করে ওরা শরণার্থী বানিয়ে দিলো আমাদের?

শবনম।। তা ঠিক। ঘরসংসার সব থাকতেও আজ ভাঙাচোরা, শেকড়ছেঁড়া মানুষ আমরা। কী জীবন-- ছিঃ।

হেলিকপ্টার নিকটবর্তী হয়ে আবার চলে যায়। দূরে কামান গর্জন। উদাস ম্যাণ্ডোলিন বেজে চলে একটানা।

মা।। জানিস শবনম--

শবনম।। আম্মি?

মা।। এইসব হানাদারি, খুনখারাবি আমার একেবারে ভালো লাগে না...

শবনম।। (ম্লান হাসে) কারই বা লাগে বলো?

মা।। কী জানি? লাগে হয়তো কারও কারও। নইলে লড়াই বাধবে কেন বল?

শবনম।। তা ঠিক। কিছু মানুষ তো নিজেদের স্বার্থেই বাধায়। অবিশ্যি তারা অনেক ওপরতলার লোক। রাষ্ট্রনেতা। ক্ষমতার লোভে পাগল।

মা।। (দীর্ঘশ্বাস) কতকালের মানুষ আমরা এই কার্গিলের। নাই বা রইলাম শহরে। কিন্তু গ্রামটা তো আমাদের ফ্যালনা ছিল না? কী চমৎকার খেতি ছিল বল? আনার আপেল আঙুর আখরোটের বাগান। চারদিকে কত ফুল কত রকমের, কত পাখি, রঙবেরঙের কত প্রজাপতি...

নীরবতা। ম্যাণ্ডোলিনে স্মৃতিচারণার উদাসী সুর।

...এই বরফের দেশে কত মেহনত করে এই সব ফসল ফলিয়েছিল তোর বাপচাচারা। ছবির মতো সাজিয়েছিল সংসার। সেই ভরভরন্ত ঘরগিরস্থি ফেলে জিপসিদের মতন জীবনভর এমনি চক্কর খেতে কার ভালো লাগে বল?

শবনম।। (ম্লান হাসে) আমাদের ভালোমন্দে কার কী এসে যায় আম্মি?

মা।। টুকটাক হানাদারি তো লেগেই আছে সারা বচ্ছর। তার ওপর দুদিন বাদে-বাদেই এমনি মানুষখেকো লড়াই! অসহ্য।

হেলিকপ্টারের শব্দ আবার নিকটবর্তী। দূরে কামানগর্জন।

শবনম।। আমাদের এই কাশ্মীর নিয়ে গোলমাল মনে হয় কোনোদিনই আর মিটবে না...

মা।। কে মেটাবে? এসব হলো রাজা-বাদশার লড়াই, সেখানে আমাদের মতো খড়কুটোর কী দাম?... বদনসিব! নিজেদের সব থেকেও সরকারি খাতায় আজ আমরা রিফিউজি! ক্যাশডোল নিয়ে সংসার চালাতে হয়। ... (দূরে কোথায় যেন আজানের সুর ভাসে) কিন্তু এদিকে বেলা যে গড়িয়ে এলো, তোর ভাইজান— কই, এলো না তো?

দূর থেকে একটা জিপগাড়ি এগিয়ে আসে। থামে।

পরভেজ।। (দূর থেকে উচ্ছ্বসিত) আ গিয়া আম্মি, হামে আ গিয়া...

শবনম।। ওই তো ভাইজান। নাম করতে করতেই এসে গেছে। বাঁচবে অনেকদিন। দ্যাখো দ্যাখো আম্মি, ক্যাপ্টেনের পোশাকে কী চমৎকার দেখাচ্ছে? (মজা করে) আইয়ে-আইয়ে, তসরিফ লাইয়ে— ক্যাপ্টেন জনাব পরভেজ ইসলাম সাহাব...

সবাই হাসে।

মা।। আয় আয় বাপজান, আয়। ইস্, কত রোগা হয়ে গেছিস রে? বোস।

পরভেজ।। রোগা? (হাসে) বলো কী। হপ্তায়-হপ্তায় যে আমাদের মেডিকেল চেকআপ হয় আম্মি? সব ঠিক আছে। (শবনমকে) হ্যাঁরে শবনম, আসবো বলে যে খবর পাঠিয়ে ছিলাম ক্যাম্পে?

শবনম।। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছে রহমতচাচা। (একটুকাল নীরবতার ম্যাণ্ডোলিনে পাহাড়ি সুর) ভাইজান— আজকের রাত্তিরটা থাকবি আমাদের সঙ্গে? কতকাল আমরা একসঙ্গে থাকিনি বল?

পরভেজ।। আজ? ... আমাকে যে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে রে বহিন। একটা সার্ভে করার কাজ ছিল এদিকটায়, সেই ফাঁকে এক ঝলক দেখে গেলাম তোদের। (হাসে) ... মন খারাপ করিস না ভাই। ... আরে ছুটি তো আমার

পাওনা হয়েই আছে। এই যুদ্ধটা মিটে যাক, তখন দেখিস কতদিন একসঙ্গে কাটাবো। আর ততদিনে তো মনে হয় আমাদের কার্গিলের বাড়িতেও ফিরে যেতে পারি আমরা, তাই না আম্মি?

মা।। কে জানে বাপ, আর কতকাল চলবে এই পোড়ার যুদ্ধু। ফিবছরই তো আমাদের নিয়েই এমনি ছিনিমিনি।

পরভেজ।। (হাসে) সে তো হবেই। সাহেবরা যে চলে যাবার আগে আমাদের কতকগুলো বর্ডার তোফা দিয়ে গেছে আম্মি। আর যারা সেই বর্ডারের ধারে ঘর বেঁধেছে বদনসিব তাদের। উপায় কী বলো? তবে এবারের লড়াইটা আর বেশিদিন নয়। মনে হয়, এ হপ্তার মধ্যেই মিটে যাবে। ... ভালো কথা, চেরাগ চাচা আছে নাকি এই ক্যাম্পে?

শবনম।। আছে বই কি। প্রায়ই তো আসে। তবে মানুষটা এখন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। কেমন দিশেহারা। পাগল পাগল ভাব... যেন বুড়িয়ে যাচ্ছে।

পরভেজ।। এবার এলে বলিস, কায়ুম আমাদের সঙ্গেই আছে। ভালো আছে। ছুটি পড়লেই আসবে। বলেছে, এসেই রোশনির সাদি দেবে। যেন ছেলে দেখে রাখে..

শবনম।। (উচ্ছ্বসিত) সত্যি?

পরভেজ।। সত্যি। সত্যি। সত্যি।

মা।। আহা বেচারি, মা-মরা ছেলেমেয়েদের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই অমন হয়ে গেল মানুষটা! এ সব শুনলে যদি আবার...

নীরবতা। ম্যাণ্ডোলিনে পাহাড়ি সুর।

মা।। হ্যাঁরে পরভেজ— শুনছি হানাদারগুলো নাকি সব পাহাড়ের চুড়ো থেকে গুলিগোলা ছুঁড়ছে? আর আমাদের ফৌজিরা সব পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে? সত্যি?

পরভেজ।। কে বললো?

মা।। এই সকলে বলাবলি করে তো...

পরভেজ।। তা কিছুটা তো ঠিকই। ওরা যে চুপিচুপি বর্ডার পার হয়ে এসেছিল। আমাদের উঁচু-উঁচু পয়েন্টগুলো দখল করে বসেছিল আগেভাগেই। সুযোগ বুঝে ওখান থেকেই গুলিগোলা ছুঁড়ছিল। এতে সত্যি বলতে কী, প্রথমটায় আমরা তো হকচকিয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই— তবে হাওয়া এখন ঘুরে গেছে আম্মি। এখন ওরাই পালাচ্ছে।

শবনম।। আশ্চর্য। একটা দেশ না হয় ভাগ হয়েছে। দুটো আলাদা পক্ষ। কিন্তু চুক্তি

তো একটা হয়েছিল ঠিকই দু-পক্ষের মধ্যে? সেটা ওরা মানবে না?

পরভেজ।। (হাসে) চুক্তিটুক্তি তো ভদ্রলোকের জন্যে রে শবনম, ওরা মানতে যাবে কোন দুঃখে? উল্টে বরং আমরাই চুক্তি ভেঙেছি বলে এমন চ্যাঁচাবে, দেশ-বিদেশে এমন উল্টোপাল্টা কথা ছড়াবে যে তখন আসল সত্যিটাই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে। বলে না, চোরের মায়ের বড়ো গলা? ... এই দ্যাখো, এত সব আবার কী দিলি রে?

শবনম।। এত কিছু না। খেতে খেতে গল্প কর না? একটু পরেই তো বলবি— সময় ফুরিয়ে গেছে?

পরভেজ।। দেখলে আম্মি, স্বভাব যায় না মলে? (হাসে) রিফিউজি ক্যাম্পে থেকেও বহিনটি আমার যে-কে সেই!

আবার হেলিকপ্টারের শব্দ তীব্র হয়। দূরে কামানগর্জন।

পরভেজ।। সময় আমাদের হাতে এখন সত্যিই খুব কম রে শবনম। একবার ভাব— আমাদের সব কামানের মুখগুলো এখন দুশমনদের বাংকার তাক করে আছে। এক-একটা পয়েন্ট দখল করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। চোদ্দ আনাই হাতে এসে গেছে। এখন বাকি টাইগার হিল। আর আজ রাতেই সেই অভিযান... টাইগার হিল... চমৎকার রেঁধেছিস কিন্তু মুরগিটা!

মা।। তুই আসবি খবর পেয়ে রহমতের কাছ থেকে তো কিনে আনলো। তুই যে মুরগি ভালোবাসিস খুব...। এক মিনিট একটু দাঁড়া তো।

পরভেজ।। কেন?

মা।। মাফলারটা একটু গলায় জড়িয়ে দ্যাখ তো? তোর নাম করে বুনেছিলাম... কোথায় কোথায় দিনরাত বরফের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিস...

নীরবতা। ম্যাণ্ডোলিনে আবার পাহাড়ের উদাসী সুর।

পরভেজ।। (উদাস গলায়) জানো আম্মি, আমাদের এই ফৌজি জীবনটা বড়ো অদ্ভুত। কে কোথায় কখন থাকি— কতদূরে— সত্যিই তো তার ঠিক ঠিকানা নেই। আর শুধু আমাদের কেন? ভেবে দ্যাখো, আকাশে পাহাড়ে সমুদ্রে কত জওয়ান— যাতে বাইরের কোনো শত্রু আমাদের দেশের মাটিতে পা রাখতে না পারে, তার জন্যে বন্দুক-কামান নিয়ে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে দিন-রাত...?

মা।। জানি তো।

পরভেজ।। তবু ওরই মধ্যে যখন একটু ছুটি পাই, একটুখানি অবসর জোটে, তখনই

কিন্তু তোমাদের এই ভালোবাসা, শবনমদের এই ভালোবাসা আমাদের মতো বাউণ্ডুলে-ঘরছাড়াদের সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয় আম্মি? তোমাদের এই ভালোবাসা তখন আবার আমাদের নতুন করে কোমর বাঁধতে শক্তি দেয়। রিকয়লেস রাইফেল হাতে তখন শিরদাঁড়া টানটান করে আবার আমরা উঠে দাঁড়াই...

শবনম।। তোর কথাগুলোয় কেমন যেন কবিতার রঙ লেগে থাকে ভাইজান, কেমন কবিতার আবেগ। বন্দুক ধরতে গিয়ে তোর কবিতার কলমটা হারিয়ে যাবে ভাবলে বড়ো কষ্ট হয়।

পরভেজ।। কবিতা হারায় না রে শবনম। বুকের মধ্যে বসে নিলামওলার মতো হাতুড়ি বাজায় ঃ 'ভালোবাসা এক, ভালোবাসা দুই'...। কিন্তু সময়টা যে হারিয়ে যাচ্ছে! এক দুরন্ত ঘোড়সওয়ারের মতো ছুটে যাচ্ছে... দ্রুত... অজানা এক দিগন্তের দিকে...

কবিতা আবৃত্তি করে পরভেজ। কবিতার আড়ালে ম্যাণ্ডোলিনে কবির অস্থিরতা ধরা পড়ে।

"তুষারে শোণিত ঢালে কার্গিল, দ্রাস।
উপমহাদেশে রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাস
হেসে কুটিপাটি, কম হলে ভাতে নুন
কিসের পরোয়া? চাই আরো তাজা খুন।

রণহুঙ্কার ছেয়েছে আকাশপাতাল,
দেশপ্রেমের কড়া মদে পুরো মাতাল
করে দাও জোর যুদ্ধের রোজনামচায়,
ভুখা পেটে কষে বাঁধো অভাবের গামছা!

'সুমন', 'সুমন'— যত ডেকে ফেরে অম্বা,
নিখাকি ভাঁড়ারে যতই অষ্টরম্ভা,
যতই শকুন উড়ুক অবাধ শূন্যে,
ততই হাজার তরুণ প্রাণের পণ্যে,
হেসে কুটিপাটি রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাস—
তুষারে শোণিত ঢালে কার্গিল, দ্রাস।"

শবনম।। (উচ্ছ্বসিত) দারুণ, দারুণ! এইতো আমার ভাইজান, যার এক হাতে রাইফেল অন্য হাতে কলম— দুশমনের সাধ্য কী ওর মুখোমুখি দাঁড়ায়?

ম্যাণ্ডোলিনে আবেগের সুর। হাওয়ায় ঝড়ের আভাস।

পরভেজ।। (কণ্ঠস্বরে কেমন যেন ঘোর লেগে আছে) সময় বড়ো দ্রুত চলে যাচ্ছে... বড়ো দ্রুত...। চলি আম্মি, চলি বহিন, সবাই মিলে তোমরা একটু দোয়া কোরো, এবাদৎ কোরো, টাইগার-হিল আজ যেন আমরা কামিয়াব করতে পারি। ... জিততে আমাদের হবেই আম্মি। ওই হানাদারদের রক্তে টাইগার-হিলের বরফ আমরা লাল করে দেবো... লাল...

ঝড়ের হাওয়া বাড়ছে।

শবনম।। ঝড় উঠছে...

পরভেজ।। উঠুক...

মা।। মেহেরবান খোদাতালা তোদের ঠিক জিতিয়ে দেবেন বেটা। জিত তোদের হবেই দেখিস? অন্যায়কে হার মানতেই হবে! আজাজিলকে হারতেই হবে...

জিপ স্টার্ট দেবার শব্দ। গাড়িটা দূরে চলে যায়। ম্যাণ্ডোলিনে মন-উদাস করা সুর। ঝড়ের শব্দ ক্রমে বাড়তে থাকে। তার মধ্যে যুদ্ধবিমানের ছুটোছুটি আর কামানের শব্দ। দূরে যেন প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

শবনম। আম্মি?

মা।। বল?

শবনম।। কত রাত হয়ে গেল, ঘুমোওনি এখনো?

মা।। তুইও তো ঘুমোসনি মা?

শবনম।। কী ঝড় উঠেছে! আমার কেমন ভয় করছে আম্মি?

মা।। তাহলে উঠে বোস। শুয়ে থাকতে আমারও আর ভালো লাগছে না।

শবনম।। লণ্ঠনটা জ্বালি?

মা।। জ্বাল। অন্ধকারটা একটু কাটুক।

ঝড়ের শব্দ বাড়ছে। সেই সঙ্গে গোলাগুলির শব্দ।

শবনম।। জানালার ফুটো দিয়ে দেখলাম চারদিকটা বরফের গুঁড়োয় শাদা...

মা।। ওদের দল এতক্ষণে নিশ্চয়ই টাইগার হিলে পৌঁছে গেছে না?

শবনম।। কত গুলিগোলার শব্দ শুনছ না? কত কামান বন্দুক রকেটের শব্দ?

মা।। আমি ভাবছি এই প্রচণ্ড ঝড় জলে কিনা পিছল পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে

ছেলেগুলো...

শবনম।। তা তো উঠছেই আম্মি। আর টাইগার হিল শুনেছি এদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। ওটার দখল নিতে পারলে বহুদূর পর্যন্ত আমাদের নজরদারিতে থাকবে।

ঝড়ের শব্দের মধ্যে গোলা-গুলি-কামানের গর্জন।

মা।। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বেলে রেখেছি— তাতেই দ্যাখ, হাত-পা সব জমে যাচ্ছে! আর এই খোলা আকাশের নিচে, এই ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে, ওই উড়ে আসা বরফের গুঁড়ো মাথায় নিয়ে বন্দুক-কামান ঘাড়ে টাইগার হিলের গা বেয়ে এখন উঠছে আমার বাহাদুর বেটা...

শবনম।। ঠিকই আম্মি। বুঝতে পারছি সেই জন্যেই তোমার চোখে আজ ঘুম নেই... হয়তো এমনি গোটা দেশ জুড়ে তোমার মতো লক্ষ লক্ষ আম্মা, আমার মতো কোটি কোটি বহিন তাদের ছেলের কথা ভেবে, ভাইয়ের কথা ভেবে— কোনো বিবি তার খসমের কথা ভেবে এমনি করেই রাত জাগছে। সক্কলের ছেলে, সক্কলের ভাই, সক্কলের স্বামী আজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে আম্মি— তার নাম জওয়ান, বীর জওয়ান।

মা।। ওরা রাত জেগে, জান বাজি রেখে আমাদের বাঁচানোর জন্যে লড়াই করছে। আয় মা, আমরাও ওদের জন্যে খোদাতালার কাছে এবাদৎ করি : আল্লা-রসুল, তুমি ওদের জিন্দা রাখো, তুমি ওদের কামিয়াবি দাও।

ওদের প্রার্থনার পিছনে আজানের সুর ভেসে আসে। তার মধ্যে গোলা-গুলির শব্দ ও ঝড়ের মাতামাতি। এই শব্দ মিলিয়ে যেতে ম্যাণ্ডোলিনে সকালের সুর। রেডিওতে খবর শোনা যাচ্ছে।

ঘোষক।। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল : টাইগার হিলে আবার ভারতসূর্য উঠেছে। শ্রীনগর-কার্গিলে জাতীয় সড়কের গুরুত্বপূর্ণ ৪০ কিলোমিটার রাস্তা এখন পাকিস্তানের কামানের নিশানামুক্ত।

গতকাল সারারাত এবং আজ সন্ধ্যার রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর প্রায় দেড়মাসের বেশি সময় ধরে চলা টাইগার হিলের লড়াই আজ শেষ হলো। বাংকার থেকে বাংকারে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। বেয়নেটে-বেয়নেটে মুখোমুখি লড়াই। রাতে এবং সকালেও বর্কস, হাউইটজার কামান গর্জন করেছে। তার সাথে ছিল মাল্টিব্যারেল রকেটলঞ্চার। নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে বসানো পাকিস্তানের দূরপাল্লার কামান রাত পৌনে তিনটেয় স্তব্ধ হয়ে যায়...

রেডিওর খবর ক্রমে মিলিয়ে যায়। ম্যাণ্ডোলিনে আনন্দের সুর। একটুপরে একটি জিপগাড়ির শব্দ দূর থেকে এগিয়ে এসে থামে।

মা।। একটা জিপ থামলো না?

শবনম।। বোধহয় ভাইজান এলো। এতবড়ো লড়াইয়ের গল্পটা শোনাতে হবেনা আম্মাকে?

মা।। তুই তাড়াতাড়ি একটু চায়ের জল চাপিয়ে দে। আমি দেখছি। (হর্ন বাজে) যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। ... ইস্, আর তর সয় না ছেলের! (দরজা খোলার শব্দ) আয়— (অবাক) ওমা কায়ুম যে? আমি ভাবি... আয় আয়, ভিতরে আয়। বাপজানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলি বুঝি?

কায়ুম।। না, আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি চাচি, তারপর আব্বাজান।

মা।। কাল তোরা তো জিতেছিস? একটু আগে শুনলাম রেডিও-খবরে।

কায়ুম।। হ্যাঁ চাচি, টাইগার হিল এখন আবার আমাদের কব্জায়।

শবনম।। কিন্তু ভাইজান—

কায়ুম।। (কথা কেড়ে নিয়ে) হ্যাঁ— ক্যাপ্টেনেরই তো অর্ডার এ খবরটা আগে তোমাদের শোনাতে হবে! ওখানে এখন আর একটা হানাদারের ছায়াও নেই শবনম।

মা।। তোমরা তো সবাই একসঙ্গে ছিলে?

কায়ুম।। হ্যাঁ চাচি, ছিলুম বইকি?

মা।। পরভেজ ভালো লড়াই করতে পেরেছে?

কায়ুম।। দারুণ চাচি। অসাধারণ। এমনিতে ও একটু নরমসরম মানুষ, কবি-কবি— ও যে এমন সাংঘাতিক লড়াই করবে আমরা ভাবিই নি কেউ? কিন্তু কালকের যুদ্ধে ক্যাপ্টেনই তো ছিল আমাদের আদর্শ।

শবনম।। কেমন? আমি তোমাকে বলিনি আম্মি, ভাইজান আজ দারুণ লড়াই করবে। এখান থেকে যাবার সময়ে ওর চোখ দেখেই বুঝেছিলাম।

কায়ুম।। ওরা ভাবতেও পারেনি শবনম, যে আমাদের জওয়ানরা ওদের এমনিভাবে ঘায়েল করবে! একবার ভাবো চাচি, সাড়ে-সতের হাজার ফুট উঁচু টাইগার হিলের বাঙ্কারে বসে আছে ওই বদমাসগুলো, ওই পাকিস্তানি হানাদারের দল... তাদের ঘিরে ওপরে উঠে আসছে শিখ রেজিমেণ্টস, গোর্খা রেজিমেণ্ট, নাগা ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা—

শবনম।। তারপর?

কায়ুম।। ওদিকে আমাদের প্যারাকমাণ্ডোবাহিনী তখন পিছনের নালা আর রসদ সরবরাহের পথও আটকে দিয়েছে! বলতে গেলে সবদিক থেকেই ওরা ঘেরাবন্দী।

মা।। আর পরভেজ? পরভেজ কী করছে তখন?

কায়ুম।। ওইতো তখন ওয়্যারলেসে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে— কখন কীভাবে আমাদের আক্রমণ করতে হবে।

মা।। (উৎসাহিত এবং অবাক) পরভেজ?

কায়ুম।। হ্যাঁ, ও আমাদের ট্রুপের ক্যাপ্টেন কি না? অর্ডার ছিল ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টাইগার-হিল মুক্ত করতে হবে। তবে তার অনেক আগেই আমরা অবশ্য চূড়োয় পৌঁছে গিয়েছিলাম, আর তার অনেকখানি কৃতিত্বই ছিল ক্যাপ্টেন পরভেজের, চাচি। ওর পরিচালনাতেই তো একটা শত্রুকেও জ্যান্ত ফিরতে দিইনি আমরা!

মা।। কিন্তু ও কোথায়? তোর সঙ্গে একসঙ্গে এলোনা কেন? কীযে দেখতে ইচ্ছে করছে!

কায়ুম।। আসবে আসবে। তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই আসবে চাচি। কিন্তু তার আগে ওর সেই আসার খবরটা যে আমাকেই বয়ে আনতে হলো! টাইগার-হিল মুক্ত করতে গিয়ে যে সাতজন জওয়ান শহীদ হয়েছেন, আমাদের ক্যাপ্টেন তাদেরই একজন...

এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল শব্দ করে।

শবনম।। (কাঁদতে কাঁদতে) কিন্তু ও যে বলেছিল— ফিরে আসবে? একসঙ্গে ছুটি কাটাবে? কবিতা শোনাবে? নিজের লেখা কবিতা?

কায়ুম।। এখানে আসার সময়ে ওর কবিতার খাতা আমি নিয়ে এসেছি শবনম। ও বলেছিল ঃ 'যদি মারা যাই, এই খাতা আমার বোনকে দিস কায়ুম, ও আমার কবিতা বড়ো ভালোবাসে। আর এই মাফলারটা আমার আম্মাকে। যে উষ্ণতার জন্যে এটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল, এরপরে সেই উষ্ণতা নিশ্চয়ই অন্য কারো দরকার হবে? ঠিক মানুষকে দেবার জন্যে এটা তাঁর কাছে পৌঁছে দিস ভাই।'

নীরবতা। ম্যাণ্ডোলিনে বেদনার্ত সুর।

মা।। (পাথরের মতো শান্ত গলায়) কায়ুম, গুলিটা পরভেজের কোথায় লেগেছিল রে?

কায়ুম।। ওর বুকে চাচি।

মা।। পিঠে নয়? ঠিক দেখেছিস?

কায়ুম।। হ্যাঁ চাচি, বুকের ঠিক মাঝখানে।

মা।। (তৃপ্ত) আমি জানতাম, আমার বুকের দুধের অসম্মান ও করবে না— আমি ঠিক জানতাম। আয় বেটা, মাফলারটা তোর গলায় পরিয়ে দিই। ওটা যে এখন তোর দরকার...'

শবনম 'কার্গিল দ্রাস' কবিতাটি মৃদু স্বরে আবৃত্তি করতে থাকে, তার পিছনে 'ফিউনারাল বিউগিল'-এর সুর। তারপর 'লাস্ট-স্যালুট-ফায়ারিং'। সেই গুলির শব্দের পরক্ষণেই এক-ঝাঁক পাখি উড়ে যাবে। ম্যাণ্ডোলিনে ভোরের সুর বাজতে থাকবে।

শ্যামল ঘোষ
(১৯৩৩)

কৃ ষ্ণ চূ ড়া

প্র স্তা ব না

কৃষ্ণচূড়া কাব্যনাট্য নয়। তবে কাব্যধর্মী শ্রুতিনাটক। আকাশ আর পাখি। যৌবনের দুই স্বপ্নদেখা বন্ধু। দুই প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকা জীবনের অদৃশ্য ঝড়ে দুই ভিন্নদ্বীপের বাসিন্দা। দীর্ঘ সাতাশবছর পেরিয়ে পথচলতি আজ আবার অলৌকিক দেখা হল দুজনের।
সময় এরই মধ্যে অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে তাদের শরীর থেকে। অথচ মন অটুট, অম্লান। সেই মন ততক্ষণে যেন যৌবনের কৃষ্ণচূড়া। সেখানে ফুটে উঠেছে হারানো সময়ের কিছু অবিনশ্বর ছবি। ছড়িয়ে পড়েছে দুর্লভ স্মৃতির মৃদুগন্ধ।
নদীর ঢেউ যেমন ওঠে আবার তলিয়ে যায়, অতীত-অভিসারী সেই চিত্তপটও স্থায়ী হল না। শুধু রয়ে গেল দুই বিদ্ধপ্রজাপতির কিছু স্বগত প্রলাপ আর রক্তাক্ত হাহাকার। পুরোনো স্বপ্নের অ্যালবাম বুকে নিয়ে তখন হৃদয়ের নিঃসঙ্গ প্রান্তরে ব্যর্থ যৌবনের প্রতীক হয়ে একলা দাঁড়িয়ে রইল স্মৃতিমেদুর স্বপ্নের কৃষ্ণচূড়া।

আকাশ. পাখি

• শিরোনামসংগীত শেষ হবার শোনা যাবে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চলাচলের শব্দ।

পাখি।। (একটু দূর থেকে ডাকে) এই আকাশ--

আকাশ।। কে?

পাখি।। আমি। চিনতে পারো?

আকাশ।। (চেনা-অচেনার দ্বিধা নিয়ে) পাখি?

পাখি।। যাক্, তবু চিনতে পেরেছ। নইলে যে কী লজ্জা পেতাম--

আকাশ।। তুমি কিন্তু অনেক বদলে গেছ পাখি। আচমকা দেখলে...

পাখি।। অনেক বুড়ি হয়ে গেছি তো?

আকাশ।। সেতো সবাই। আমিই বা কম কী? বয়েস তো আর কারো মুঠোয় ভরা থাকে না...

পাখি।। নাই বা রইলো। কিন্তু অ্যাপিয়ারেন্স? তুমি কিন্তু অনেক ব্রাইট হয়েছ আকাশ!

আকাশ।। ঠিক বললে না। বলো অনেক স্মার্ট হয়েছি! একটা বয়েসের পরে এসে মানুষের উজ্জ্বলতা আর তেমন থাকে না। তবে পালিশ করে রাখতে পারলে স্মার্টনেস বাড়ে।

পাখি।। (হেসে) এটা মন্দ বলনি...

আকাশ।। মন্দ বলিনা। ওটাই যে আমার কাজ ছিল।

পাখি।। তাই?

আকাশ।। তাইতো। কথা সাজানোর দাবাড়ু।

পাখি।। কী করছ আজকাল?

আকাশ।। করতাম। একটা মালটিন্যাশনাল কোম্পানির পাবলিসিটি অ্যাডভাইসার। মানে, কথার কারচুপিতে রাতকে দিন বানানোর মাদারিখেলোয়াড় আর কী...

পাখি।। এখন?

আকাশ।। ছুটি। অনাবিল-- অফুরন্ত।

পাখি।। কথা নিয়ে খেলতে পারতে?

আকাশ।। না পারলে চলতো?

পাখি।। না-- ভাবছি, আগে যা মুখচোরা ছিলে! লাজুক--! মুখ দিয়ে তো কথাই বেরোতো না...

আকাশ।। এখন বেরোলেও বলার খুব দরকার করে না পাখি। ওদের চাই প্রপার প্ল্যানিং অ্যাণ্ড স্মার্ট এগজিকিউশান। ও দুটোই শিখে নিয়েছিলাম।... চলো।

পাখি।। কোথায়?

আকাশ।। কোথাও? একটু বসি? রাস্তায় দাঁড়িয়ে এত কথা কী বলা যায়? কাজ নেই তো?

পাখি।। থাকলেও এতকাল পরে দেখা পাওয়া পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে একটুকাল তো

থাকতেই পারি।

আকাশ।। গুড। তাহলে ওঠো গাড়িতে।

পাখি।। কোথায় যাবে? ময়দানে?

আকাশ।। না। ময়দান আমার জীবন থেকে অনেককাল হারিয়ে গেছে পাখি। ওদিকে, ওই পার্ক স্ট্রিটের দিকে একটা ভালো রেস্তোরায়।... চলো না?

গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ।

দৃশ্যান্তর

দামি হোটেলে মৃদু বাজনা বাজছে।

আকাশ।। (বেয়ারাকে) দুটো চিকেন পকৌড়া, দুটো কাশ্মিরি ওমলেট আর দুটো কোক। আর কী খাবে বলো—

পাখি।। বাপরে! আর কিছু না।

আকাশ।। কেন?

পাখি।। পাগল নাকি? কথা বলতে এসেছি, না খেতে? কথা বলো।

আকাশ।। এতক্ষণ তো আমিই বকলাম। এবার শুনবো।

পাখি।। কী শুনবে?

আকাশ।। তোমার কথা! কী করছ, কোথায় থাকো... তোমার স্বামী, ছেলেমেয়ে, ঘরসংসার...

পখি।। সেসব জানা কী খুব জরুরি?

আকাশ।। মানে?

পাখি।। বলছি— এইতো বেশ। কতবচ্ছর বাদে দেখা হলো...

আকাশ।। কত বছর বলো তো?

পাখি।। তুমিই বলো না, কত বছর? মনে আছে?

আকাশ।। অনেকদিন তো হলো... বছর বাইশ-চব্বিশ হবে....

পাখি।। ছাব্বিশ বছর সাত মাস।

আকাশ।। (অবাক) বলো কী? মাসের হিসেবও মনে রেখেছ?

পাখি। মেয়েরা অমনিই। (হাসে) চাইলে দিনের হিসেবেও বলতে পারি।

আকাশ।। সাবাস! সত্যিই তোমার মেমারি....

পাখি।। শুধুই মেমারি?

আকাশ।। না, ইচ্ছেটাও ছিল— মনে রাখতে চেয়েছিলে?

পাখি।। ঠিক। আসলে, আমি যে পাখি। পাখির বাসা দেখেছ তো? কত ছোটো?

পলকা? তাতে কটা জিনিসই বা ধরে? সামান্য সঞ্চয়। খড়কুটোর মতো এমনি কিছু স্মৃতি, কিছু পুরোনো ছবি, হারানো সুর, এই তো সম্বল। খোয়া যেতে যেতেও তার টুকরোটাকরা কিছু তো থেকেই যায়... যদি না ঝড়ে পুরো বাসাটাই উড়ে গিয়ে থাকে।

আকাশ।। দ্যাখো, বাসা ছোটো হলেও পাখির জগতটা কিন্তু বিশাল। চাইলে গোটা আকাশটাই তার সাম্রাজ্য হতে পারে।

পাখি।। হয়তো পারে। কিন্তু আকাশে তো বসার ঠাঁই মেলে না। বিশ্রামের জন্যে তাইতো পাখিকে মাঝেমাঝে নীড়ে নেমে আসতে হয়। তার ছোট্টো বাসায়। হয়তো বা এমনিভাবে আকাশকে হারিয়ে ফেলাই তার ভবিতব্য।

আকাশ।। (বেয়ারাকে) এনেছ? ঠিক আছে, এখানে রাখো। (টেবিলে প্লেট-গ্লাস রাখার শব্দ) ও. কে. (পাখিকে) এবার খাও তো? খালি পেটে অনেক দার্শনিক কথা বলা গেছে। (কাঁটা-চামচের শব্দ। হোটেলের মৃদু বাজনা)... সত্যি পাখি, এমনিভাবে যে আর কোনোদিন দেখা হবে ভাবতেই পারিনি।

পাখি।। সত্যি আকাশ, আমিও কিন্তু এত বছরের মধ্যে তোমাকে আর দেখতে পাইনি।

আকাশ।। কী করে পাবে? বিদেশেই তো ছিলাম বহুকাল। তারপর দেশে ফিরে বম্বেতে। থুড়ি, মুম্বাইয়ে। এই তো মাত্র কদিন হল কলকাতায় এসেছি। তবে কদ্দিন থাকবো জানিনা—

পাখি।। কেন?

আকাশ।। কেন আবার? থাকার কোনো মানে নেই, তাই? তবে আজ তোমার সঙ্গে দেখা হলো, এটাই যা লাভ। ... আবার একটু লোভও বলতে পারো।

পাখি।। কিসের?

আকাশ।। কলকাতায় থাকার।

পাখি।। আমি দেখলাম, নিউ মার্কেটের সামনে তুমি গাড়িটা পার্ক করছ। ... এতকাল পরেও হঠাৎ ধক্ করে উঠলো বুকের ভিতরটা! দেখলাম, গাড়ি থেকে নামলে। ... অনেক বদল, তবু ঠিক চিনলাম। কী যে চমৎকার দেখতে লাগছিল? ভাবছি— ডাকবো কী ডাকবো না...

আকাশ।। কেন?

পাখি।। যদি না চিনতে পারো? যদি ভুলে গিয়ে থাকো? এতকাল পরে... চুলে পাক-ধরা এক বুড়ি...

আকাশ।। ভাগ্যিস ডেকেছিলে?

পাখি।। ভাগ্যিস চিনতে পেরেছ।

দুজনে হাসে। হোটেলের বাজনা।

আকাশ।। (একটু বিরতি) কোত্থেকে ফিরছিলে এখন?

পাখি।। অফিস থেকে। ফুড কর্পেরেশন। তবে মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

আকাশ।। তোমার স্বামী?

পাখি।। এই অফিসেই ছিলেন। ওঁর চাকরিটাই তো পেয়েছি।

আকাশ।। (উদ্বিগ্ন) কী বলছ? তার মানে...

পাখি।। হ্যাঁ, ছ বছর হয়ে গেল... ক্যানসার।

আকাশ।। ইস! (ঘড়ির টিকটিক শব্দ) ... ছেলেমেয়ে?

পাখি।। এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি। জামসেদপুর। আর ছেলে কলকাতায়। বিয়ে করে আলাদা। মাঝেমধ্যে খোঁজখবর নেয়।

আকাশ।। আশ্চর্য! আর তুমি?

পাখি।। (খিলখিল করে হাসে) মুক্তবিহঙ্গী? (হোটেলের বাজনা জোরে বাজে একটুকাল) ... তোমার ছেলেমেয়ে?

আকাশ।। নেই।

পাখি।। ও মা, কেন? চাওনি বুঝি? এই হয়েছে তোমাদের এক ফ্যাশান।

আকাশ।। চাইলেই কী আর সব পাওয়া যায় পাখি? এই তো তোমাকে চেয়েছিলাম। পেয়েছি কি?

পাখি।। আমার কথা বাদ দাও। আমার জীবনটা তো শরৎ চাটুয্যের গল্পের মতো। শুনলে এখন হাসবে সবাই। গরিবঘরের বাপ-মা মরা মেয়ে। মামা-মামির গলগ্রহ। দয়া করে কলেজে পড়তে দিয়েছিল... সেটুকুই ছিল বাইরের আকাশ দেখার জানালা। তুমি বন্ধু ছিলে— একমাত্র ভালোবাসার মানুষ। কিন্তু আপাদমস্তক বেকার....

আকাশ।। হ্যাঁ মনে আছে, বেকার তখন সাকার হবার চেষ্টায় সকাল-বিকেল ছাত্র ঠ্যাঙাচ্ছে, আর ইংরাজি বাংলা দৈনিক কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়ে যাচ্ছে অফিসে অফিসে।

পাখি।। এমনি সময়ে মামার বরাত-জোরে হঠাৎ জুটে গেল এক দোজবরে পাত্র। সরকারি চাকুরে। বিনা নোটিশে ম্যাজিকের মত কাঁধের বোঝা নামিয়ে ফেললেন মামা। আত্মরক্ষার সময়টুকুও মিললো না। পাখির জীবন থেকে হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল আকাশ... (হোটেলের বাজনা জোরালো হয়) তবে সে মানুষটা ভালোয়-মন্দয় খারাপ ছিল না। অন্তত সুখে রাখতে চেয়েছিল আমাকে....

আকাশ।। দেখলে তো, জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা?

পাখি।। থাক। এই অবেলায় আর সে-সব পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী লাভ? যেতে দাও... বৌদিকে করে দেখাচ্ছো বলো।

আকাশ।। (হাসে) পাবো কোথায়?

পাখি।। মানে?

আকাশ।। আরে দূর— সারাটা জীবন তো লেখাপড়া আর দাস্যবৃত্তিতেই কেটে গেল! সময় পেলাম কই? এখন এই পাকা চুলে টোপর পরে দাঁড়ালেই কি কেউ আর মালা দেবে, বলো?

হাসতে থাকে। হোটেলের বাজনা বেড়ে ওঠে আবার।

পাখি।। (একটুকাল পরে) আকাশ—

আকাশ।। উঁ?

পাখি।। ভালো লাগছে না। চলো বাইরে বেরোই।

আকাশ।। চলো... (একটু জোরে) ওয়েটার— বিল লে আনা, জলদি।

হোটেলের বাজনা জোরালো হয়ে ওঠে।

দৃশ্যান্তর

নদীর ছলাত-ছলাত শব্দ। দূরে বাস টার্মিনাসের মৃদু কোলাহল।

পাখি।। এই সেই আউটরাম ঘাট— কতদিন পরে এলাম। ... দ্যাখো আকাশ, জায়গাটা আর কিন্তু আগের মতো নেই। কেমন ঘিঞ্জি, নোংরা, তাই না?

আকাশ।। তা ঠিকই। তবু গঙ্গা কিন্তু তেমনিই আছে। তেমনি বয়ে যাচ্ছে তরতর করে— ছোটো ছোটো ঢেউ। তেমনি ছায়া পড়ে এখনও....।

পাখি।। বাইরেটা দেখে অবিশ্যি তাই মনে হয়— তবু গঙ্গাও বদলেছে আকাশ। তার গভীরতা কমেছে। পলি জমে জমে কত জায়গায় যে চর ফুটছে! ভাঁটার টান লাগলে এখন মাটি জেগে ওঠে এখানেওখানে। স্রোত হারিয়ে যায়। আসলে বুড়ি হয়ে গেছে গঙ্গা... কে আর তার কথা ভাবে বলো?

আকাশ।। যৌবন হারালেও এখনও গঙ্গার প্রাণ আছে পাখি। সেটুকুই কী কম? মানুষ তো যযাতির মতো যৌবন ভিক্ষা চাইতে পারে না? প্রাণের আনন্দ দিয়ে সে যেমন তার অভাবের ভাঁড়ারটা ভরিয়ে রাখে, তেমনি ভাবেই গঙ্গাও তো ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার ভালোবাসা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

জলের ছলছল শব্দ। দূরে স্টিমারের ভোঁ বাজে।

পাখি।। আকাশটা কী লাল দ্যাখো। সূয্যিঠাকুর পাটে বসেছেন।

আকাশ।। জলের আয়নায় এই চেনা ছবিটা কতদিন পরে দেখলাম পাখি? ভাগ্যিস, তোমার সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল...

পাখি।। চলো না, দুজনে ওই জল একটু ছুঁয়ে আসি?

আকাশ।। চলো।

জলের ছলাত-ছলাত শব্দ বাড়তে থাকে।

দৃশ্যান্তর

জনাকীর্ণ পথ। গাড়ি চলার শব্দ। যেন তার ভিতরে বসে আছে ওরা।

আকাশ।। এবারে?

পাখি।। এইখানে থামো। চলো, একটু হাঁটি। (গাড়ি থামে। দরজা খোলা-বন্ধর শব্দ) ... কতকাল পরে আবার ময়দানের এই জায়গাটার এলাম, তাই না আকাশ?

আকাশ।। হ্যাঁ, কয়েক যুগ পরে। কিন্তু এখানে আর কেন এলে পাখি?

পাখি।। এসো বলছি। ... দ্যাখো, এই সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা— যার নিচে আমরা এসে বসতাম কতদিন? দ্যাখো, এখনও ঠিক দাঁড়িয়ে আছে?

আকাশ।। গাছেরা হয়তো মানুষের মতো তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায় না...

পাখি।। আচ্ছা আকাশ, গাছটা কি আমাদের ভুলে গেছে?

আকাশ।। কী জানি?

পাখি।। না না, ভোলেনি। ভুলতে পারে না। গাছের স্মৃতি, অনুভূতি মানুষের চেয়ে অনেক জোরালো। ওই দ্যাখো— ওর পাতাগুলো তিরতির করে যেন সবুজ রুমাল উড়িয়ে আমাদের ডাকছে। ঠিক চিনেছে!

আকাশ।। (হেসে) তুমি ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছ পাখি।

পাখি।। এসোনা আকাশ— আমরা এই গাছটাকেও একটু ছুঁই? আমাদের সেই ভালোবাসার দিনগুলোর ওই তো একমাত্র সাক্ষী? ওর কাছে, চলো না একটু ক্ষমা চেয়ে নিই...

আকাশ।। ক্ষমা চাইবো? কেন?

পাখি।। আসলে ওকে যে খুব দুঃখ দিয়েছি...

আকাশ।। আমরা?

পাখি।। হ্যাঁ। গাছটা আসলে জানতো— আমাদের ভালোবাসা একটা ভূমি পাবে। একটা সুন্দর পরিণতি। আমরা সুখী হবো। আমাদের সুখে ওর সুখ— সেই আশাতেই তো আশ্রয় দিয়েছিল... সেই প্রত্যাশা তো পুরন করতে পারিনি আমরা? ওর দুঃখ কি কম? ক্ষমা চাইতে হবে না? এসো।

আকাশ।। চলো। ... তবে আমি কিন্তু অনেককাল বসেছিলাম এই কৃষ্ণচূড়ার তলায়। একা। এক্কেবারে একা।

পাখি।। জানি। জানি মানে— অনুমান করতে পারি। কল্পনাতে দেখতেও পাই সেই ছবিটা। ... দিগন্তজোড়া মাঠ... তাতে একটা গাছ আর একটি নিঃসঙ্গ যুবকের অন্তহীন প্রতীক্ষা... কিন্তু আমার সেদিনের জীবনটা? তাকি তুমি ভাবতে পেরেছিলে আকাশ?

আকাশ।। কিছুদিন পরে তোমার একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তাতেই জেনেছিলাম, তোমার গোত্রান্তর হয়েছে। আর কিছু না।

পাখি।। আর কী জানাবো বলো? চোখের জলে তখন সব কিছু ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। আর কিছু লিখতে পারিনি।

আকাশ।। কোনো ঠিকানা ছিল না চিঠিতে। তাই উত্তরও দিতে পারিনি।

পাখি।। ঠিকানা তো আমার আগেই হারিয়ে গিয়েছিল আকাশ। কত খুঁজেছি... আর পাইনি। কেমন করে জানাবো?

আকাশ।। তাই হবে। আসলে, মনে মনে আমরা যে একই ঠিকানার বাসিন্দা ছিলাম অনেককাল। তাই তোমার হারানো ঠিকানার সঙ্গে আমারটাও বেপাত্তা হয়েছিল সেদিন। তার সাক্ষী ওই কৃষ্ণচূড়া? ... জানো পাখি, সেই চিঠি পাবার পর থেকে আমিও আর আসিনি ওর কাছে।

পাখি।। ঠিক করোনি আকাশ। আমি পারিনি, কিন্তু তোমার অন্তত বিদায় নেওয়া উচিত ছিল। আর কিছু না হোক, অন্তত যদি একটা অভিযোগও দায়ের করে যেতে আমার নামে— তাহলে ওকে এতকাল এমন হতাশ-প্রতীক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো না। এত স্বার্থপর ভাবতে পারতো না আমাদের। ...

আকাশ।। আমার তো কোনো অভিযোগ ছিল না পাখি। একজন হেরে যাওয়া মানুষ কার নামে নালিশ জানাবে?

পাখি।। তুমি তো হারো নি আকাশ? হার হয়েছে আমার। অধিকারের বাইরে এসে স্বপ্ন দেখতে চাওয়া আমার উচিত হয়নি। সুখের আবেশে পায়ের তলার জমির কথা ভুলেছিলাম। তাই চোরাবালির হ্যাঁচকা টানে যখন তলিয়ে গেলাম, তখন আর জানিয়ে যাবার ফুসরত পাইনি। একটা ভুল মানুষ ভুল ঠিকানায় হারিয়ে গেল আচমকা...

আকাশ।। থাক না পাখি। আজ এই পড়ন্তবেলায় এসে হারজিতের হিসেব আর নাই

পাখি।। (হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে) ও কী করছ আকাশ? ওই গাছের কোটরে হাত ঢোকাচ্ছ কেন? কত পোকামাকড় থাকতে পারে ওখানে! হাত বের কর শিগগির।

বাজনায় গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায় একটুকাল।

আকাশ।। (যেন উদ্ভাসিত) পেয়েছি পাখি?

পাখি।। কী?

আকাশ।। গুপ্তধন। সব আছে। কিচ্ছু খোয়া যায়নি।

পাখি।। কিছু বুঝতে পারছি না আমি। কিসের কথা বলছ?

আকাশ।। যা লুকিয়ে রেখেছিলাম? এই দ্যাখো।

পাখি।। এতো দেখছি একটা পুরোনো ফাউন্টেনপেন। আর ওটা?

আকাশ।। একটা চিঠি। বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসা। দুটোই অ্যান্টিক।

পাখি।। কই দেখি? ইস্ এতো এক্কেবারে নষ্ট হয়ে গেছে— কিছু পড়া যাচ্ছে না।

আকাশ।। হতেই পারে। সাতাশবছর আগের লেখা একটা নষ্ট চিঠির হরফ তো মুছে যেতেই পারে! কিন্তু তার কথাগুলো তো হারায় নি? তার বিষয়, বক্তব্য অবিকল আছে।

পাখি।। তবে কী এটা—?

আকাশ।। ঠিক ধরেছ। এটা তোমার লেখা সেই চিঠি— আর ওটা আমার প্রিয় সেই ঝরণা কলম! এই বল পেনের যুগে এক্কেবারে অচল।

পাখি।। আশ্চর্য! তুমি কি ম্যাজিক জানো?

আকাশ।। (হেসে) হঠাৎ মনে পড়ে গেল— এই দুটোই কৃষ্ণচূড়ার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম সেদিন। তোমার চিঠি তো? তাই তোমাকে সাক্ষী রেখেই ফেরত নিলাম ওর কাছ থেকে। ধন্যবাদ কৃষ্ণচূড়া— অনেক অনেক ধন্যবাদ...

পত্রশাখায় হাওয়ার মর্মর।

দৃশ্যান্তর

ঘরে-ফেরা পাখিদের কলরব তীব্র হয়ে ওঠে।

পাখি।। এবার তাহলে যাই আকাশ?

আকাশ।। কোথায় যাবে?

পাখি।। কোথায় আবার? বাসায়? সন্ধে হল। ঘরে ফিরতে হবে না?

আকাশ।। (দীর্ঘশ্বাস) ও হ্যাঁ, তাইতো।

পাখি।। সন্ধে নামলে পাখির তো আকাশের কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা...

আকাশ।। হ্যাঁ, আকাশের আলোও কমে আসছে। দেখতে দেখতে বিকেল পেরিয়ে সন্ধে নামছে....। আচ্ছা পাখি, আমাদেরও তো এখন ফুরিয়ে আসা বিকেল? আমাদের চুলেও রঙ লেগেছে, শরীরে ক্লান্তির ঢল। তবু জানতে ইচ্ছে করে, উদাসীনতার ভান করে থাকলেও মন কি মাঝেমাঝে উচাটন হয় না? সত্যি করে বলো তো?

পাখি।। (হেসে) সেই কবিতাটা ভুলে গেছ— 'কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?'

আকাশ।। (বিষণ্ণ) তা ঠিক। ... চলো তোমাকে পৌঁছে দিই।

পাখি।। কোথায়?

আকাশ।। তোমার বাসায়?

পাখি।। না।

আকাশ।। কেন?

পাখি।। পাখির ছোট্টবাসায় কি আকাশ ধরে? তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি আমার ঘরে।

আকাশ।। আমাদের আর হয়তো দেখা হবে না, তাই না পাখি?

পাখি।। আমরা চাইলেই হবে। আজ আমাদের কে বাঁধবে বলো? আমাদের পাশে এক বন্ধু রয়েছে না? কৃষ্ণচূড়া?

আকাশ।। ঠিক। আমাদের ভালোবাসা-বিরহ-আনন্দ-দুঃখ সব কিছু জড় নিয়ে করে দাঁড়িয়ে আছে যে বন্ধু, এই গুপ্তধন তার কাছেই আবার রেখে যাচ্ছি। (হেসে) পাখি, আমরা যেন দুই বিদ্ধ-প্রজাপতি। ... আমাদের পুরোনো স্মৃতির অ্যালবামটা বুকে নিয়ে শেষ বিকেলের আবিরমাখা ওই কৃষ্ণচূড়া গাছ নষ্টপ্রেমের রক্তপ্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুক...

কোথায় যেন উদাসী সুর বাজে বাঁশিতে। নীরবতা।

পাখি।। আকাশ....

আকাশ।। বলো—

পাখি।। আজকের দিনটা মনে রেখে প্রতিবছর এখানে আসবো আমি। আমাদের কৃষ্ণচূড়ার নিচে। তুমি?

আকাশ।। আসবো। যেখানেই থাকি, যতদিন বাঁচি...

পাখি।। আঃ, কী আনন্দ। তাহলে আর হার হলো কই আকাশ?

আকাশ।। না তো? বন্ধু কৃষ্ণচূড়াই তো আমাদের জিতিয়ে দিলো?

পাখি।। তাহলে শুভরাত্রি আকাশ...

আকাশ।। শুভরাত্রি পাখি। গুড নাইট...

গাড়ি চলাচলের শব্দ। ব্যস্ত জনজীবনের মধ্যে মিশে গেল ওরা।

বীরেন্দ্র দত্ত
(১৯৩৫)

আ ত্ম ঘা তী

সালমা. অরিন্দম. অফিসার

শিরোনাম সংগীতের শেষে শোনা যাবে দূর থেকে হুইসল্ বাজিয়ে একটা ট্রেন চলে গেল। রাত গভীর। একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। কতগুলো বেওয়ারিশ কুকুরের চিৎকার। একটু পরে মনে হয় শুকনো পাতা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে সন্তর্পণে কেউ যেন হেঁটে আসছে।

সালমা।। (ভয় পাওয়া চাপা গলায়) কে? (শব্দটা থেমে যায়) কে ওখানে?

অরিন্দম।। (চাপা স্বরে) হিস্-স্-স্। গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বেরোলে... হাতে এটা কী, দেখতে পাচ্ছ?

সালমা।। (ভয়ে ভয়ে) বন্দুক?

অরিন্দম।। হ্যাঁ, রিভলবার। আঙুলে একটা ছোট্ট চাপ দেবো, সঙ্গে সঙ্গে মাথার খুলিটা... ব্যাস। বুঝেছ?

সালসা।। (ঢোক গেলে) জি।

অরিন্দম।। গেট আপ্।

সালমা।। এ্যাঁ?

অরিন্দম।। উঠে দাঁড়াও। ... কে তুমি?

সালমা।। আমি?

অরিন্দম।। হ্যাঁ হ্যাঁ— কী নাম?

সালমা।। সালমা।

অরিন্দম।। সালমা? ও। ... এখানে কী করছ? এত রাতে? এই কনকনে শীতের মধ্যে?

সালমা।। কিছু না তো? এই একটু ঘুমোচ্ছিলাম।
অরিন্দম।। (চাপা গলায়)। চালাকি করো না। এটা ঘুমোবার জায়গা? এই ফাঁকামাঠের মধ্যে? একটা ভূতুড়ে খড়ের গুমটি... এখানে তো সাপখোপ পোকামাকড় ছাড়া কুকুর-শেয়ালও থাকে না।
সালমা।। বাইরে বড়ো জাড় বাবু। এই খড়ের গাদিতে তবু একটু ওম্ আছে, তাই....
অরিন্দম।। তাই? আর কে আছে এখানে?
সালমা।। কে আর থাকবে? বদনসিব না হলে এমন জায়গায় কেউ রাত কাটায়?
অরিন্দম।। (যুক্তিগ্রাহ্য তবু সন্দেহ) হুম্। ... এখানে কে পাঠিয়েছে তোমাকে?
সালমা।। আপনার বন্দুকটা সরান না বাবু, বড়ো ডর লাগে।
অরিন্দম।। কথা ঘোরাবার চেষ্টা কোরো না সালমা। শয়তানীর মতলব করেছ কী... আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা পকেটে রাখছি। চুপচাপ বোসো।
সালমা।। (ভয়ে ভয়ে) কোথায়?
অরিন্দম।। কোথায় আবার? যে খড়ের গাদার মধ্যে এতক্ষণ ঘাপটি মেরে বসেছিলে, সেখানে।
সালমা।। ঠিক আছে, বসি।
অরিন্দম।। এবার বলো— কে পাঠিয়েছে তোমাকে? তুমি কি পুলিশের লোক?
সালমা।। (খিলখিল করে হাসে) পুলিশ?
অরিন্দম।। (ধমক দেয়) চুপ। হাসছ কেন?
সালমা।। (থতমত খায়) না, আসলে আমাকে পুলিশ ভাবলেন তো, তাই। পুলিশ কী এমন ছেঁড়াকানি পরে? ভিখিরির মতো খড়ের গদিতে রাত কাটায়?
অরিন্দম।। দরকার হলেই কাটায়। হুঃ! ছেঁড়াকানি! ওসব পুলিশি ছদ্মবেশ— সব আমার জানা।
সালমা।। কিন্তু পুলিশ এখানে আসবে কেন?
অরিন্দম।। সে ওদের মর্জি। ইচ্ছে হলে আসতেই পারে। সত্যি বলো, তুমি কী...
সালমা।। না বাবু, আমি পুলিশটুলিশ নই। আমি একজন দুঃখীমানুষ।
অরিন্দম।। (যেন বিশ্বাস হয়) কী করো তুমি?
সালমা।। সে মেলা কথা— বলতে গেলে রাতকাবার হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন পুলিশকে?
অরিন্দম।। (থতমত খায়) আমি? কই না তো? ভয় পাবো কেন?
সালমা।। পাচ্ছেন তো। পুলিশ কী আপনাকে খুঁজছে?
অরিন্দম।। তাতে তোমার কী?
সালমা।। না, হঠাৎ মনে হলো তাই জিগ্যেস করলাম। কসুর মাফ করে দেন বাবু।
অরিন্দম?। (একটুকাল নীরবতা) ... না, ঠিকই ধরেছ তুমি সালমা। পুলিশ আমাকে খুঁজছে। ওরা খবর পেয়েছে আমি এই গাঁয়ে ঢুকতে পারি। অবশ্য ঠিক

এইখানেই আসবে কিনা জানি না, তবে এসে পড়লে...

সালমা।। কী হবে?

অরিন্দম।। কী জানি? আমি তো একা... তবু শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো।

সালমা।। কী করেছেন আপনি?

অরিন্দম।। সে তুমি বুঝবে না।

সালমা।। তবু বলুন না!

অরিন্দম।। আমি... মানে আমরা... (হঠাৎ একদল কুকুর প্রচণ্ড ডাকতে-ডাকতে ছুটে চলে গেল).... ও কী?

সালমা।। ও কিছু না। বোধহয় শেয়ালটেয়াল তাড়িয়ে নিয়ে গেল কুকুরগুলো।

অরিন্দম।। (আশ্বস্ত) ও।

সালমা।। আপনি বলুন।

অরিন্দম।। আমি— জানো সালমা, জেল থেকে পালিয়েছি!... আমি মানে— আমরা চারজন। চারটে ছেলে। ... কে কোথায় ছিটকে গেছে কে জানে? আমিই একা ঘুরতে ঘুরতে এ দিকটায় চলে এসেছি.....

সালমা।। কেন? কী করেছিলেন আপনারা?

অরিন্দম।। (ধমক দেয়) আঃ! তা জেনে তোমার কী হবে? ... নাগালে পেলে পুলিশ হয়তো আমাকে গুলি করে মারবে....

সালমা।। কী সর্বনাশ!

অরিন্দম।। আজকের রাতটা, বুঝতে পারছি, এখানেই থাকতে হবে। ... ওই ট্রেনটাতেই পালাতে পারতাম, কিন্তু কেমন মনে হলো স্টেশনের আশেপাশে পুলিশ নজর রাখতে পারে। তাই শেষমেস পিছোতে পিছোতে...

সালমা।। ভালোই করেছেন।

অরিন্দম।। আচ্ছা সালমা, একটু দূরেই তো গাঁয়ের রাস্তা? পুলিশ এলে তো ওই পথেই আসবে?

সালমা।। তাই তো মালুম হয়।

অরিন্দম।। আমাদের খুব সাবধানে রাতটা কাটাতে হবে, বুঝলে?

সালমা।। জি।

অরিন্দম।। তুমি শুয়ে পড়ো। ঘুমোও।

সালমা।। আপনি?

অরিন্দম।। আমি ওদিকটায় আড়াল হয়ে বসছি। তোমার ভয় নেই। (নীরবতা। দূরে একটা মালগাড়ি ধীর লয়ে চলে যাচ্ছে) ধ্যাৎ! মাঠের মধ্যে চাঁদের আলোটা এমন ক্যাটক্যাট করছে। ... তবে বেশ কুয়াশাও নামছে, সেটুকুই যা ভরসা। ... একটা সিগারেট খাবো? যা কনকনে ঠাণ্ডা! তোমার অসুবিধে

হবে না তো সালমা?

সালমা।। (হাসে) না। তবে সাবধানে থাবেন। চারদিকে শুকনো খড়েরগাদি। দেখবেন — একটা ফুলকি উড়ে পড়লেই কিন্তু...

দেশলাই জ্বালানোর শব্দ। একটুকাল নীরবতা। শুধু ঝিঁ ঝিঁ

অরিন্দম।। সালমা?

সালমা।। উঁ?

অরিন্দম।। তুমি এখানে কেন?

সালমা।। (দ্বিধাগ্রস্ত) আমি... আমিও পালিয়ে এসেছি বাবু।

অরিন্দম।। সে কী! কোত্থেকে!

সালমা।। কলকাতা।

অরিন্দম।। বলো কী? তোমার বাড়ি কোথায়?

সালমা।। এখানেই। এই গেরামে।

অরিন্দম।। তোমার বাবা-মা নেই? ... থাকার জায়গা?

সালমা।। আছে।

অরিন্দম।। তাহলে?

সালমা।। (দীর্ঘশ্বাস) নসিব।

হঠাৎ মনে হয় দূরে যেন কচি শিশুর কান্না।

অরিন্দম।। (চমকে ওঠে) ও কী? একটা বাচ্চা কাঁদছে না?

সালমা।। (হাসে) না বাবু। শকুন ডাকে। ওই ধারে, ওই নদীর পাড়েই তো ভাগাড়? ওখানে শকুনের ডেরা। শকুনের ডাক অমনি কচিছেলের কান্নার মতো।

অরিন্দম।। ও।

সালমা।। আচ্ছা বাবু?

অরিন্দম।। বলো।

সালমা।। হায়দরাবাদ কোথায় জানেন?

অরিন্দম।। (অবাক) হায়দ্রাবাদ। এই দেশেই তো— এই ভারতবর্ষে? অন্ধ্রে। আশ্চর্য! হঠাৎ?

সালমা।। আপনি কখনও গেছেন সেখানে?

অরিন্দম।। (মৃদু হাসে) ওখানকার জেলখানা থেকেই তো পালিয়েছি আমরা! কেন বলো তো?

সালমা।। ওখানে নাকি 'বারখাস' নামে একটা বিবিবাজার আছে?

অরিন্দম।। কী আছে?

সালমা।। বিবিবাজার। আরবদেশ না কোত্থেকে নাকি আমিররা আসে সেখানে... মোটা-মোটা টাকা দিয়ে বিবি কিনে নিয়ে যায় দেশে?

অরিন্দম।। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় যেন শুনেছিলাম এমনি কিছু উড়োখবর...। কিন্তু তাতে কী?

সালমা।। ওদের দেশে যার যত বিবি তার নাকি তত ইজ্জত! (হাসে) শুনেছিলাম আমার জন্যেও অমনি এক খসম ঠিক হয়েছিল। ষাট বছরের মরদ...

অরিন্দম।। সে কী? কে ঠিক করেছিল?

সালমা।। জমিল শেখ।

অরিন্দম।। জমিল শেখ? সে কে?

সালমা।। মস্ত কারবারি মানুষ। কলকাতায় থাকে। আড়কাঠি।

অরিন্দম।। আশ্চর্য! কোথায় পেল তোমাকে?

সালমা।। কেন এইখানে? আমার আব্বাজানের সঙ্গে জানপয়ছান ছিল ওর। পাইকারি মাল কেনাবেচার জন্যে মাঝে মাঝে আসতো এই তল্লাটে। তখন আব্বাজানই ছিল ওর খিদমতগার। যে কদিন থাকতো দুহাতে খরচ করতো জমিল শেখ। আব্বাজানকে বলতো, তোমার মতো সাচ্চাআদমি আমি খুব কম দেখেছি হে রহমান, আল্লাতালা একদিন তোমাকে খায়েশ করবেন জরুর।

অরিন্দম।। রহমান? তোমার আব্বাজানের নাম?

সালমা।। জি। আবদুর রহমান।

অরিন্দম।। দাঁড়াও দাঁড়াও। ... আচ্ছা, তোমার আব্বাজান কি বেশ কালোকোলো লম্বা চওড়া দেখতে?

সালমা।। জি। (সাগ্রহে) আপনি চেনেন?

অরিন্দম।। মনে হচ্ছে যেন চিনি। বোধহয় আমাদের রহমানচাচা! আমি তো পাশের গ্রামেরই ছেলে! যদি ভুল না করি, তোমার বাবা মাঝেমাঝে আমাদের বাড়িতে জনমজুর খাটতে আসতেন একসময়ে। তখন কত গল্প করতেন তোমাদের বাড়ির। খুব শাদামাটা মানুষ, খুব হাসিখুশি...

সালমা।। তাহলে তো আপনি আমাকেও চেনেন! আমার সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়তেন না আপনি? তারপর একদিন হাইস্কুলে পড়তে শহরেও চলে গেলেন....। আমার অবিশ্যি ওই পর্যন্তই। আর পড়া হয়নি...

অরিন্দম।। আরে তাইতো! হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমিই তাহলে সেই সালমা? নামটা শুনে প্রথমেই কেমন তাই চেনা লাগছিল। মুনিশ খাটার সময়ে তুমি মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে মুড়িটুড়ি নিয়ে আসতে না তোমার আব্বাজানের জন্যে?

সালমা।। জি। আমরা খুব গরিব ছিলাম তো! আপনাদের মুখের দিকে তাকাতাম না, ডর লাগতো।

অরিন্দম।। অথচ কী মজা দ্যাখো সালমা, সেদিনের সেই গরিব আর বড়োলোক দুটো

ছেলেমেয়ে আজ অন্ধকারে একই খড়ের গাদায় মুখোমুখি বসে আছি। দুজনেই পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আশ্চর্য! ... না সালমা, আর বাবু নয়, আপনি নয়। আজ থেকে আমাকে তুমি বোলো। আমি অরিন্দম।

আবার সেই মালগাড়িটার চলে যাবার শব্দ স্পষ্ট হয়।

সালমা।। আজ হাওয়াটা বড়ো তেজি।

অরিন্দম।। তোমার খুব শীত করছে, না?

সালমা।। আমাদের অভ্যেস আছে। আপনারা কি এত পারেন?

অরিন্দম।। আবার আপনি? আমরা বন্ধু না?

সালমা।। সরম লাগে—

অরিন্দম।। এক পাঠশালায় পড়েছি দুজনে। বন্ধুকে কেউ লজ্জা পায়? ... যাক্, কেন পালিয়ে এসেছ বললে না তো? ... এ কী, কাঁদছ নাকি?

সালমা।। (রুদ্ধ গলায়) আমি নষ্ট হয়ে গেছি অরিন্দমদা!

অরিন্দম।। মানে?

সালমা।। আমার শরীরটা বরবাদ করে দিয়েছে ওরা। বিশ্বাস করো, এখন আমি একটা নষ্ট বাজারি মেয়েমানুষ...

কান্নায় ভেঙে পড়ে।

অরিন্দম।। (গলায় চাপা রাগ) কে সে? কেমন করে ঘটল এসব?

সালমা।। (একটুকাল নীরবতা) জমিল শেখ। ... একদিন এলো আমাদের বাড়ি। আব্বাজানকে বললো, সালমার যদি সাদি দিতে চাও, আমার হাতে একটা জব্বর ছোকরা আছে। তবে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে বেটিকে। আল্লার মর্জিতে যদি মনে ধরে যায়, দেনাপাওনায় আটকাবে না, আমি যখন আছি।

অরিন্দম।। তুমি রাজি হলে?

সালমা।। আমাকে তো কেউ জিগ্যেসই করেনি কিছু!

অরিন্দম।। কিন্তু তোমাদের সমাজে তো শুনেছি মেয়ের মত না পেলে বিয়ে হয় না?

সালমা।। তা ঠিক। কিন্তু গরিবের ঘরে কে আর মানে সে সব? ... পাঁচ বোন এক ভাই আমরা। বাপ জনমজুর খাটে, মা বাড়ি বাড়ি ঠিকে। দুবেলা খোরাকই জোটে না ভালো করে, তো শরিয়ত মেনে সাদি! কে দেবে?

অরিন্দম।। আশ্চর্য!

সালমা।। জমিলচাচা মাল কিনতে এলেই একটু টাকার মুখ দেখতাম আমরা। তখন

যা হোক একটু ভালো খানাপিনা, মাঝে-মধ্যে পোশাকআশাক... যেন ফেরিস্তা নেমে এসেছে ভাঙা ঘরে— এমনিই ভাবতো আব্বাজান।

অরিন্দম।। এমনিই হয়। সরলতার খেসারত!

সালমা।। জমিলচাচার কথায় হয়তো পয়লা-বেটির নয়াজিন্দেগির খোয়াব দেখেছিল আব্বাজান। আম্মির তেমন ইচ্ছে ছিল না, তবু যদি ফেরিস্তার দোয়ায় একটা মেয়েও পার হয়, এমনি আশাতেই দুলহান বানাতে সাততাড়াতাড়ি ওর সঙ্গে রেলগাড়িতে তুলে দিলো একদিন।

অরিন্দম।। তারপর?

সালমা।। সোজা কলকাতা। জমিল আমাকে প্রথমে নিয়ে তুললো মেটেবুরুজের একটা বাড়িতে। কী বিচ্ছিরি বাড়ি! কেউ থাকে না সেখানে। ভয়ে সারাটা রাত কাঁটা। সকালে দুটো লোক এলো ষণ্ডা মতো দেখতে। জমিল বললো, ওঁরা ছেলের বাড়ি থেকে এসেছে। কোথায় নিয়ে গিয়ে নাকি দেখাশোনার ব্যবস্থা হবে। ওদের সঙ্গে একটা গাড়িতে তুলে দিয়ে বললে, তুই যা— আমি এক্ষুনি আসছি কটা জিনিস কিনে নিয়ে। কোনো ভয় নেই।

অরিন্দম।। তুমি গেলে?

সালমা।। উপায় কী? সবাই ওদের চেনাজানা, আমার কথা কে শুনবে? প্রথমে বুঝতেই পারিনি, পরে শুনেছিলাম ওরা নাকি দু-হাজার টাকায় কিনেছে আমাকে জমিলের কাছ থেকে। আরো চড়া দামে বেচবে হায়দরাবাদে। এটাই ওদের কারবার।

অরিন্দম।। কিন্তু এত কথা তুমি জানলে কী করে?

সালমা।। জেনেছি। নসিবে আগুন লাগলে যেমন করে জানতে পারে লোকে। অন্ধকারে কামড়ালে কি সাপের বিষ টের পাওয়া যায় না?

অরিন্দম।। তারপর?

সালমা।। কলকাতায় দর্জিপাড়ার কাছে একটা বড়ো বাড়িতে এনে তুললো ওরা। কী নোংরা! কত মেয়ে যে গিজগিজ করছে সেখানে! সন্ধের পর থেকে কত লোকের আনাগোনা, কত ম্যয়ফিল...। ওদের মতলবটা আন্দাজ করে দু-রাত্তির ঘরে খিল এঁটেও বসেছিলাম, জানো? শেষে আর পারলাম না। একসময়ে খিল ভেঙে জোর করে ঘরে লোক ঢুকিয়ে দিল ওরা...

কান্নায় ভেঙে পড়ে সালমা। কোথায় যেন দুটো কুকুর কামড়া-কামড়ি করছে।

অরিন্দম।। (চাপা রাগে) শয়তানগুলোকে একবার হাতেরমুঠোয় পেলে....

সালমা।। তারপর থেকে.... উঃ! কী অসহ্য কটা রাত। কত জানোয়ার যে ছিঁড়ে-

ছিঁড়ে খেলো আমাকে সারারাত্তির...। একদিন ভোরের দিকে গোটা মহল্লা যখন ঘুমে বেহঁস— ফাঁক পেয়ে পালিয়ে সোজা শেয়ালদা ইস্টিশান...

অরিন্দম।। এখানে এলে, তবু বাবা-মার কাছে গেলে না কেন?

সালমা।। কী করে যাবো? জানি তো জমিল শেখ ঠিক চলে আসবে আমাকে খুঁজতে। শিকার ফস্‌কেছে, ও কী সহজে ছাড়বে? দু-একদিন কাটিয়ে... ও চলে গেলে...

অরিন্দম।। কিছু খেয়েছো?

সালমা।। (হাসে) কাল রাত থেকে ওসব নিয়ে আর ভাবার সময় পেলাম কই। ... তুমি?

অরিন্দম।। (হাসে) ধুস। আগে প্রাণে তো বাঁচি— তার পরে খাওয়া।

সালমা।। আমার কাছে একটু মুড়ি আছে, খাবে?

অরিন্দম।। মুড়ি? কোথায় পেলে?

সালমা।। পথে কিনেছিলাম। ... আমার হাতে খেতে আপত্তি নেই তো?

অরিন্দম। ছি সালমা, তুমি না আমার বন্ধু? বের করো মুড়ি। কিন্তু বড্ডো তেষ্টা পেয়েছে যে?

সালমা।। তুমি মুড়ি খাও। আমার কাছে একটা কলাইয়ের ঘটি আছে। ওপাশে তালাওয়ের পানি খুব সাফা। আমি নিয়ে আসি।

অরিন্দম।। না-না, পুলিশ ঘুরছে এদিকওদিক....

সালমা।। (হাসে) আমি পুলিশ চিনি। ধরলেও তোমার খবর দেবো না। তুমি খাও তো। ... চারদিকটায় এত নোংরা....। ঠিক আছে, আমার আঁচল থেকেই খাও।

অরিন্দম।। তুমিও খাও—

দূরে কোথায় যেন 'বউ কথা কও' পাখি ডাকে।

সালমা।। ...এবার তুমি বলো। তোমাকে জেলে ধরে রেখেছিল কেন?

অরিন্দম।। সে সব বুঝবে না তুমি।

সালমা।। কেন বুঝবো না। নিশ্চয়ই খুন-টুন করেছিলে, তাই না?

অরিন্দম।। মানে?

সালমা।। আমি জানি— তোমাদের মতো লেখাপড়া জানা ছেলেরাই এইসব করে বেড়ায়। সমাজটমাজ মানে না, পুলিশটুলিশ তোয়াক্কা করে না, যেন মরার জন্যেই পা বাড়িয়ে রয়েছে। ... আচ্ছা অরিন্দমদা— জমিল শেখের মতো মানুষদের তোমরা খুন করতে পারো না?

অরিন্দম।। সেই লড়াইটাই তো করতে চেয়েছি সালমা। মাটি থেকে এই বিষ-

গাছগুলো শিকড়বাকড় সুদ্ধ উপড়ে জঙ্গল সাফ করতে চাই...

সালমা।। আবার যদি পুলিশ ধরতে পারে তোমাদের? জেলে ঢোকাবে?

অরিন্দম।। (হাসে) আর বোধহয় সে ভুল করবে না ওরা। এবারে ধরতে পারলে একেবারে লাশ! কিন্তু এখন এত কাজ বাকি... ধরা পড়লে যে...

সালমা।। তুমি পালাতে পারবে না আজ রাতে?

অরিন্দম।। পারতেই হবে। শেষরাতের দিকে একটা ট্রেন আছে না?

সালমা।। হ্যাঁ। তুমি বোসো। আমি পানি নিয়ে আসি।

দূর থেকে একটা জিপগাড়ির শব্দ এগিয়ে আসছে। কিছুটা ঘোরাঘুরির পর শব্দটা থেকে গেল।

অরিন্দম।। ...পুলিশের গাড়ি...

সালমা।। তুমি পালাও। এই ঘরটার পেছন দিকে একটা ধানের খেত আছে। তার ভিতর দিয়ে আলপথ ধরে ধরে... ওধারে কিছুটা এগোলেই ইস্টিশান...

অরিন্দম।। না। এখন পালাতে গেলে ওরা ধরে ফেলবে। দেখছো না— গাড়িটা কেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে? ওরা কিছু একটা সন্দেহ করেছে। ভাবছে গাড়ির শব্দ পেয়ে আমি পালাবার চেষ্টা করবো। আমাকে সুযোগ দিতে চাইছে পালাবার। বেরোলেই চারদিক থেকে ফিরে ফেলবে...

সালমা।। তাহলে?

অরিন্দম।। কোনো শব্দ কোরো না। খানিকটা সময় থিতিয়ে যাক। আগে বুঝতে দাও ওরা কী করে!

অফিসার।। (দূর থেকে চেঁচিয়ে) এই— তোমরা এখন গাড়িতেই বোসো। আমি মাঠের ভেতরের ওই পোড়োবাড়িটা একবার দেখে আসছি চট করে। চারদিকে নজর রেখো। নামতে হবে না কাউকে—

সালমা।। এবার তুমি পালাও অরিন্দমদা। ও এইদিকেই আসছে। যেদিকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তার উল্টো দিকেই ধানখেত। কুয়াশা নেমেছে। তোমাকে দেখতে পাবে না।

অরিন্দম।। বুঝলাম। কিন্তু তুমি যে একা!

সালমা।। আমার জন্যে ভেবোনা। এটা আমার চেনা জায়গা। আমি ঠিক সামলে নেবো।

অরিন্দম।। সে হয়না। এখন আর তোমাকে একলা ফেলে যেতে পারিনা সালমা। ওরা তোমার ক্ষতি করতে পারে।

সালমা।। (হাসে) আমার আর কী ক্ষতি করবে অরিন্দমদা। এখন আমি একটা নষ্ট মেয়েমানুষ। তোমার অনেক কাজ। তোমার ধরা পড়লে চলবে না। ওকে

আমি কিছুক্ষণ ঠিক আটকে রাখতে পারবো। আর চেনা অফিসার হলে তো কথাই নেই। তুমি যাও।

অরিন্দম।। দুঃখ কোরো না সালমা। মানুষ নষ্ট হয় না। শুধু রক্ত-মাংস-চামড়াটাই তো মানুষ নয়। মানুষ আরো অনেক বড়ো। তোমাকে ফেলে এই মুহূর্তে আমার যাওয়া অসম্ভব।

সালমা।। তাহলে যেখানে বসে আছি এর পেছন দিকে একটা ছোট্টো কুঠুরি পাবে। খড়বোঝাই। দরজাজানলা যদিও ভাঙা, তবু ওখানে লুকোনোর সুবিধে আছে। কেউ টের পাবে না। তাড়াতাড়ি যাও। ও এক্ষুণি এসে পড়বে।

অরিন্দম।। কোন দেশের জন্যে আমরা লড়াইয়ে নেমেছি সালমা? তুমিই তো আমার সেই দেশ। কেউ জানবে না— তোমার কাছে আমাদের কত দেনা রয়ে গেল। যদি কোনোদিন সুযোগ পাই...

সালমা।। তুমি যাও তো—

ঝিঁ ঝিঁ-র ডাক তীব্র হয়। একটুকাল নীরবতা। তারপর শুকনো পাতা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে কার এগিয়ে আসার শব্দ।

অফিসার।। এই— কে রে তুই?

সালমা।। (ভয়ে ভয়ে) আমি।

অফিসার।। আরে— আমি তো আমিও, তুই কে? মাঝরাত্তিরে খড়েরগাদায় মেয়েছেলে! কী কপাল! কে বাবা তুই?

সালমা।। আমি সালমা হুজুর।

অফিসার।। সালমা? তুই কি রহমানের বেটি সালমা? আই সি! তুই এই গলতায় ঘাপটি মেরে রয়েছিস? আর ওদিকে তোর জমিলচাচা যে তোকে গরু-খোঁজা খুঁজছে! তুই নাকি সাদি না করে পালিয়ে এসেছিস?

সালমা।। আপনি জমিলচাচাকে চেনেন?

অফিসার।। (হাসে) আমাদের চিনতে হয় না রে। ওসব দুনম্বরি মালেরা নিজেদের জান বাঁচাতে আমাদেরই চিনে রাখে। ব্যাটা বজ্জাতের হাতবাকসো। তা ওর ভয়েই বুঝি বাপের ঘরে যাস নি?

সালমা।। জি। আপনি দয়া করে ওকে খবরটা দেবেন না হুজুর। ও কলকাতায় ফিরে গেলেই আমি বাড়ি ফিরবো।

অফিসার।। (হা হা করে হাসে) জমিলকে খুব ভয় পাস দেখছি!

সালমা।। আমাকে ধরতে পারলে খুন করবে হুজুর। আপনি মেহেরবানি করেন। আমাকে বাঁচান।

অফিসার।। ইস্, খুন করলেই হলো? এটা কি মগের মুলুক নাকি?

সালমা।। ওরা আইনকানুন কিচ্ছু মানে না হুজুর। বড়ো খতরনাক ওই জমিল শেখের সাগরেদরা। ওদের চেনেন না আপনি।

অফিসার।। (হাসে) তা জমিলের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে আমাকে কী দিবি বল?

সালমা।। দেবার মতো আমার কী আছে হুজুর? অনপড় গরিব ঔরত।

অফিসার।। (হাসে) দানের কী শেষ আছে রে সালমা? যাক, এবার বাড়ি ফিরতে পারিস– আর ভয় নেই। তোকে না পেয়ে আজ রাতের ট্রেনেই জমিল ফিরে গেল কলকাতায়।

সালমা।। আপনার টর্চবাতিটা নেভান না হুজুর, সরম লাগে।

অফিসার।। (রহস্যজনক হাসে) হ্যা হ্যা হ্যা... সরম লাগে! ... অলরাইট। তুই এখানে বোস, আমি আসছি, অনেক জরুরি কথা আছে। খবরদার, পালাবার চেষ্টা করলে মরবি, বুঝেছিস?

সালমা।। জি।

পায়ের শব্দ দূরে চলে যায়। শকুন ডাকে।

অফিসার।। (দূরে চেঁচিয়ে) এই ড্রাইভার– গাড়ি নিয়ে তোমরা শিবতলার মোড়ে ওয়েট করো। আমি এদিকটা ভালো করে দেখে আসছি। ...

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দূরে চলে যায়।

সালমা।। (চাপা গলায়) অরিন্দমদা, পালিয়ে যাও। আমার কথা ভেবো না। আমার নসিবে অনেক শেয়াল-কুকুর ঘুরছে। আরো কত সালমা আছে আমার মতো, কত জমিল শেখ.... তাদের কথা ভাববে না? তোমার এখন বাঁচা দরকার। ... আমি যতক্ষণ পারি, আটকে রাখবো। তুমি পালাও দাদা আমার...

শুকনো পাতা ভেঙে ভেঙে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

অফিসার।। কীরে সালমা, আছিস, না পালিয়েছিস?

সালমা।। এত রাতে আর কোথায় পালাবো হুজুর? আপনার নজরের বাইরে কোথায় যাবো?

অফিসার।। যাক, বুঝেছিস তাহলে। ভালো ভালো।

সালমা।। কিন্তু আপনি এত রাতে এখানে কেন হুজুর?

অফিসার।। রাতে টহল দেওয়াই তো আমাদের কাজ রে সালমা। জানিস না, আমরা

যে নিশাচর? (হাসে, একটু পরে) সালমা!

সালমা।। হুজুর?

অফিসার।। এখানে কে এসেছিল রে?

সালমা।। এখানে? কই, কেউ না তো!

অফিসার।। কেউ না? তাহলে এই সিগারেটের টুকরোটা এখানে এলো কোত্থেকে?

সালমা।। আমি তো কাউকে দেখিনি হুজুর? আমি তো বলতে গেলে সাঁঝবেলা থেকেই রয়েছি এখানে...!

অফিসার।। (চিন্তিত) সত্যিই দেখিস নি? এই বাইশ-চব্বিশ বছরের ফর্সামতো এক ছোকরা? খোঁচাখোঁচা দাড়ি... পরণে প্যান্টশার্ট... দেখিস নি? সত্যি বলছিস?

সালমা।। জি। আল্লা কসম— আমি এখানে আসার পর কাউকে দেখিনি।

অফিসার।। হুম্। জেল পালিয়ে তাহলে এ গাঁয়েই ঢুকেছে! রিপোর্টটা তাহলে মিথ্যে নয়? ... আজ রাতের মধ্যে পাকড়াতে না পারলে...

সালমা।। ছেলেটা কি ডাকাত হুজুর?

অফিসার।। অ্যাঁ? হ্যাঁ, তা একরকম ডাকাত বইকি। ... ডাকাতই বলা যায়— তবে অন্য ধরনের। জমিল শেখদের চিনতে পারি। কিন্তু এ গুলোকে ঠিক...। যাক ওসব কথা— তুই কাউকে দেখিসনি তো বুঝলাম, কিন্তু গেল কোথায়? সিগারেটের টুকরোটা পর্যন্ত পড়ে আছে, হঠাৎ কর্পূর হয়ে গেল? ... ধুস্। অবিশ্যি বাইরে পাহারা আছে...। যাক, এখন তোর কথা বল সালমা।

সালমা।। আমার আবার কী কথা হুজুর? আমি আবার একটা মানুষ!

অফিসার।। (হাসে) আরে মেয়েমানুষ তো বটেই। ... তা, ছিলি কোথায়— কলকাতায়? সাদির জন্যে গেলি, তা বসলি না কেন? (আবার হাসে) ঘর বর পছন্দ হলো না?

সালমা।। (দীর্ঘশ্বাস) যা বলেন। ঘরই যার হারিয়ে গেছে— বর পছন্দ করে তার কী হবে হুজুর?

অফিসার।। তা বটে। ... তোকে তো কতদিন বললাম, একদিন আয়— তা কানেই নিলি না তখন। তাহলে আর দুর্ভোগ ভুগতে কলকাতায় যেতে হয় না। যাক, এখন তো আর সে ভয় নেই?

সালমা।। কোন্ ভয়?

অফিসার।। (খ্যাক-খ্যাক করে হাসে) গ্রামছাড়ার আগে তোর জমিলচাচা সব রিপোর্ট দিয়ে গেছে আমারে। ওরে বাবা, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে বিপদ আছে না? ওরা তো চেনে আমাকে।

সালমা।। (অস্ফুট) শকুন তো ভাগাড় চিনবেই।

অফিসার।। কিছু বললি নাকি?

সালমা।। না হুজুর।

অফিসার।। হ্যাঁ, যা বলছিলাম.... তা জমিল বললো, দু-তিনটে রাত নাকি তোর একটু কষ্ট হয়েছে— তাতেই.... (হাসে) পাগলি! আরে ওটুকু কষ্ট তো মেয়েমানুষদের প্রথম হয়েই থাকে। তারপর দেখবি... আয়, কাছে আয়....

সালমা।। আঃ: হাতটা ছাড়েন। লাগে।

অফিসার।। ও কিছু না। পরে দেখবি ভালো লাগছে। আয়... (হঠাৎ খড়মড় করে একটা শব্দ হতেই অফিসার চমকে ওঠে) ... কে? কে ওখানে?

সালমা।। (তাড়াতাড়ি) কোথায় হুজুর?

অফিসার।। ওই পিছনের দিকটায় কেমন একটা খড়মড় শব্দ হলো না?

সালমা।। ওই দিকে তো? ওটা সেই কুকুরটা বোধ করি।

অফিসার।। কোন কুকুর?

সালমা।। এখানে শুয়েছিল হুজুর। লোম ওঠা একটা ঘেয়ো কুকুর। গায়ে কী গন্ধ! মাছি উড়ছিল ভনভন করে। ঢিল মেরে মেরে তবে তাড়িয়েছি।

অফিসার।। তাই বল। ওসব ঘেয়ো কুকুর সহজে নড়তে চায় না।... এমন চমকে দিলো ব্যাটা! মেজাজটা সবে... আয়, কাছে আয়...

সালমা।। আঃ! শাড়িটা ছাড়েন না, ছিঁড়েও যাবে যে!

অফিসার।। ঢঙ করিস নে বাপু, ভালো লাগে না। এখন বলে আমার শিয়রে সংক্রান্তি.. মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, এখন তোর সঙ্গে বসে দেয়ালা করলে চলবে? চটপট কাজ মিটিয়ে...

সালমা।। (মিনতি করে) আমাকে ছেড়ে দেন হুজুর...

অফিসার।। (হাসে) ছাড়বো ছাড়বো। আমার কাজ মিটে গেলেই তো তোর ছুটি— আয়...

একটা রেলগাড়ি দূর থেকে নিকটবর্তী হচ্ছে।

সালমা।। (চাপা আর্তনাদ) আঃ!

প্রচণ্ড শব্দ তুলে ট্রেনটা দূরে চলে যাচ্ছে। কোথায় যেন বাঁশীতে একটা চেনা সুর বাজে 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা'।

শিবতোষ ঘোষ
(১৯৪৯)

আ লো র রা স্তা

শান্তিবাবু. রাজেন. অভয়. দত্ত. রায়. বাসু. ভঞ্জা. বুড়ো. ভঞ্জার বাবা. জনতা

পাখির কলকাকলি। সমবেত পুরুষকণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত— 'ওরে শালপিয়ালের বন, দাও রাঙিয়ে মন'— গানের মধ্যেই জিপের শব্দ দূর থেকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ ব্রেক কষার শব্দে জিপ ও গান একসঙ্গে থেমে যায়।

অভয়।। কী হলো শান্তিদা?

শান্তি।। দেখছি।

বনেট খোলার শব্দ।

অভয়।। বিগড়োলে নাকি?

শান্তি।। হুম্— বাট নট ভেরি সিরিয়াস। একসিলেটারের তারটা ছিঁড়ে গেছে। তাছাড়া তেলেও ময়লা আসছিল...। এনিওয়ে, অভয়— তোমরা একটু রিল্যাক্স করে নাও। সারানো হয়ে গেলেই ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে দেবে।

রাজেন।। তারের আর দোষ কী কন? জিপ তো জিপ। আমার তো মনে হয় এই জঙ্গলের রাস্তায় পড়লি প্যাটন ট্যাঙ্কও ফুটো হয়ে যাতো। (সকলে হাসে) এই যে— শুনতি পাচ্ছ তোমরা? সকলে একটু হাত-পা ছাড়ায়ে ন্যাও। সব কটা গাড়ির লোকজনদেরই কিন্তু কথিছি—। কাছাকাছি

থাকবা সব। হর্ন বাজলিই সোজা গাড়িতি চড়বা বুঝিছ? বড়োবাবুর অর্ডার—

বলতে বলতে দূরে চলে যান রাজেনবাবু। আবহে পাখির ডাক। গাছের পাতায় হাওয়া।

রায়।। বিউটিফুল একসপিডিশান, বলুন? গাড়িতে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল পথটা যেন অন্তহীন কার্পেটের মতো খুলে যাচ্ছে—

দত্ত।। অন্তহীন কার্পেট? ধন্যি রায়বাবু, সেই কোন কাকভোরে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত দারা সিংয়ের মতো ডন-বৈঠক মারছে— এর মধ্যে কীকরে যে আপনাদের মাথায় কার্পেট-মার্পেট করে এত কবিত্ব আসে বুঝতে পারি না।

অভয়।। ওটা আপনি ঠিক বুঝবেন না দত্তদা। হঠযোগী দেখেছেন?

দত্ত।। হঠযোগী?

অভয়।। ইয়েস? মাটির গর্তে মুণ্ডু ঢুকিয়ে কেমন শীর্ষাসন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা?

দত্ত।। তাতে কী?

অভয়।। ওসবের জন্যে একটা স্পেশাল পাওয়ার অর্জন করতে হয়। কী রায়দা?

রায়।। বটেই তো। কবিতা কি কচিছেলে নাকি যে পেটে টান পড়লেই ট্যাঁ-ট্যাঁ করবে, আর পেট ভরা থাকলেই খলবল করে খেলবে?

শান্তি।। (হাসতে হাসতে এগিয়ে আসেন) বুঝতে পারছি, পেটে টান ধরেছে সকলের। ভেবেছিলাম স্পটে পৌঁছেই ব্রেক দেবো— তা এত দেরি হয়ে গেল—

দত্ত।। হ্যাঁ, এক কাপ চা পেলে অন্তত—

শান্তি।। ঠিক আছে, রাজেনবাবুকে বলো, স্টোভ জ্বেলে কয়েক কাপ চা করে নিতে। সঙ্গে না হয় কেকটেক দিয়ে দিক একটা করে। টেনপোরারিলি রিলিফ— কী বলো?

দত্ত।। ও. কে. স্যার।

শান্তি।। আর শোনো দত্ত, বলে দিও, সময় কিন্তু দশ মিনিট। কনস্টেবলদের বলবে বন্দুক হাতে পাহারা দিতে। জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয়।

দৃশ্যান্তর

শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলার শব্দ। পাখির ডাক।

শান্তি।। এসো, এখানে একটু বসা যাক।

রায়।। এখানে কি বুনো জন্তুজানোয়ার আছে নাকি শান্তিদা? পাহারার কথা বলছিলেন?

শান্তি।। থাকতেও তো পারে। তবে জানোয়ার না থাকলেও কিছু বুনো মানুষ আছে, যারা শুনেছি ওই রকমই ফেরোশাস। তবে মাঝেমাঝে।

রায়।। কী সর্বনাশ!

শান্তি।। কী করবে বলো রায়? পেটের জ্বালা! যখন কোনো উপায় থাকে না, তখনই বাইরে বেরিয়ে পড়ে ডাকাতি-ছেনতাই করতে। নইলে এমনিতে খুবই নিরীহ মানুষগুলো।.

অভয়।। এ যা জঙ্গল শান্তিদা, দিনের বেলাতেও যদি কেউ গুম খুন করে রেখে যায় তো টের পাবার জো নেই। অবিশ্যি পুলিশ আছে, সেই যা ভরসা।

শান্তি।। না হে অভয়, এ সব জঙ্গলে পুলিশটুলিশের কোনো বাহাদুরিই চলে না। ডিমৌলির এই জঙ্গল তো আজকের নয়— সেই সাহেবদের আমলে তৈরি। তারাই বলে শায়েস্তা করতে পারলো না—

রায়।। বলেন কী?

শান্তি।। দশহাত দূরে বন্দুকধারীরা দাঁড়িয়ে থাকুক না, ওরা চাইলে পাঁচ মিনিটে পাকাকলার মত চট্‌কে দিয়ে যাবে তাদের, বুঝেছ?

রায়।। কিন্তু মানুষ কোথায়? একটা প্রজাপতির ছেঁড়া পাখনাও তো নজরে পড়ছে না?

শান্তি।। পড়বে পড়বে। বাই-দি-বাই, প্রজাপতিটতি নজরে পড়লে আমাকে একটু নোটিশ কোরো তো। ... আরে বাঃ! রাজেনবাবুর চা-ও তো রেডি হয়ে গেছে দেখছি? চমৎকার!

রাজেন।। ধরেন ছ্যার। আরে ও দত্তবাবু, কেকের প্যাকেটটা নিয়ে আসেন দিনি জলদি? কই হে, তোমরাও সব আসো— চা নিয়ে যাও—

দৃশ্যান্তর

সমবেত চা-পানের শব্দ। আবহে পাখির কাকলি।

• শান্তি।। তোমার এই 'অন্তহীন কার্পেট' করে তৈরি জানো রায়?

রায়।। আজ্ঞে না স্যার। কবে?

শান্তি।। যদ্দুর মনে পড়ছে ১৮৯০ কী ৯৫ সালে। ডিমৌলির 'জাঙ্গল রিপোর্টে' পড়েছিলাম।

অভয়।। ওরে বাবা, সে তো শতখানেক বছর আগে!

শান্তি।। রাইট। ভিতরের দিকে কোথায় যেন একটা ঝর্নাও আছে।

রায়।। (খুশি) ঝর্না!

শান্তি।। খুবই ছোটো। বাইরের রাস্তা থেকে ছ-আট মাইল দূরে। মানে, তত দূর পর্যন্ত বানানো হয়েছিল রাস্তাটা।

রায়।। ঝর্না! আহা, ঝর্না নিয়ে সত্যেন দত্তর সেই কবিতাটা—

অভয়।। কবিতায় পরে আসছি রায়দা। আগে ইতিহাসটা বুঝে নি?

রায়।। স্যরি স্যার, বলুন।

শান্তি।। কেন বানানো হয়েছিল রাস্তাটা কে জানে? আর ঝর্না পর্যন্ত গিয়ে থামলোই বা কেন, সেটাও বলা মুশকিল। হয়তো এই আদিবাসীদের শায়েস্তা করার জন্যে। তবে সাহেবরাও যত এগিয়েছে, ওরাও তত ঢুকে গেছে ভেতরে। ফলে মনে হয়, এই ঝর্না পর্যন্ত ধাওয়া করে শেষমেস ব্যাক টু দ্যা প্যাভেলিয়ান!

সকলে হাসে। দূরে একটা পাখির কুক-কুক ডাক।

রায়।। একটু শুনুন স্যার, কুক-কুক করে একটা পাখি ডাকছে না? বোধহয় কোকিল।

অভয়।। দূর মশাই। কোকিল কখনো কুক-কুক করে ডাকে? সে তো কুহু-কুহু করে। কী করে যে ছাই পদ্য লেখেন বুঝতে পারি না।

এমন সময়ে গাড়িতে লম্বা হর্ন বাজে।

শান্তি।। ওই তো গাড়ি সারানো হয়ে গেছে। গেট রেডি এভরিবডি। এখনো অনেক পথ। চলো।

দৃশ্যান্তর

একটানা গাড়ি চলার শব্দ।

দত্ত।। কী দেখছেন স্যার অত মন দিয়ে?

শান্তি।। প্রজাপতি। অনেকগুলো। এই বায়নাকুলারটা দিয়ে দ্যাখো—

দত্ত।। আঃ! বিউটিফুল!

রাজেন।। রায় সাহেবের পাল্লায় পড়ো আপনারাও দেখি সব কবি হয়ে গেলেন দত্তবাবু?

অভয়।। কেন?

রাজেন।। না, তাই বলতিছি। জঙ্গলে তো ফুল থাকবে আবার বিউটিও থাকবে— তাতে বিউটিফুল বল্যে চ্যাঁচাবার কী আছে?

সকলে হাসে।

শান্তি।। এতক্ষণ যে গাড়ি চড়ে এলেন রাজেনবাবু, কোনো জন্তু-জানোয়ার চোখে পড়লো?

রাজেন।। আজ্ঞে না ছ্যার।

শান্তি।। তা এতক্ষণ পরে ওগুলো কেন দেখা গেল বলুন তো? কারণ, জলের কিনার ঘেঁসেই জীবনের বাস। কাছাকাছি জল না থাকলে প্রজাপতি জন্মায় না। ওই সামনের দিকটায় তাকিয়ে দেখুন— ঝর্না! আজকের মতো আমাদের জার্নি ওখানেই শেষ। ঝর্নার ধারেই টেন্ট খাটাতে বলুন।

দৃশ্যান্তর

অদূরে ঝর্নার ঝরঝর শব্দ।

শান্তি।। সকলের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে রাজেনবাবু?

রাজেন।। এবেলার মতো কমপ্লিট ছ্যার।

শান্তি।। বেশ, তাহলে বসুন সকলে। দুচারটে কথা বলবো, মন দিয়ে শুনুন।

রাজেন।। এই বসো, বসো তোমরা। — বলেন ছ্যার।

শান্তি।। এই যে আমরা আজ ডিমৌলির জঙ্গলে এসে হাজির হয়েছি— কেন? হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নির্দেশ আর অনুরোধে ঠিকই, তবু মনে রাখবেন, এর সঙ্গে একটা মিশন নিয়ে এসেছি আমরা। এই জঙ্গলের যারা বাসিন্দা, যদিও তাদের সঙ্গে এখনো আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, তবু অনুমান করতে পারি, যেখানে তাঁবু ফেলেছি তার আশপাশেই রয়েছে তারা। কেননা, জলছাড়া তো আর মানুষ বাঁচতে পারেনা? আর আট-দশ মাইলের মধ্যে কোথাও জলের ব্যবস্থা নেই।

রাজেন।। এই ঝরনাটা যদি ছ্যার বন্ধ কর‍্যে দেয়া যায়, তালি তো প্রাণের দায়ে

সব সুড়সুড় কর্‌্যে ধরা দেবেনে আমাগের কাছে?

শান্তি।। (হাসে) ধরে কী হবে?

রাজেন।। সোজা সদরে চালান?

শান্তি।। জলের মাছ ডাঙায় তুললে কি বাঁচে রাজেনবাবু? ওরা জঙ্গলের মানুষ। ওদের সদরে চালান দিতে আমরা আসিনি? বরং ওদের যারা তিলতিল করে শেষ করে দিতে চাইছে, তাদের হাত থেকে যাতে এই আদিম মানুষগুলোকে বাঁচাতে পারি, ওদের ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারি সেটাই চেষ্টা করবো।

অভয়।। এটাই তাহলে আমাদের মিশন?

শান্তি।। ঠিক ধরেছ। দত্ত, ওষুধপত্তর কিছু এনেছ তো বেশি করে?

দত্ত।। মোটামুটি সব সময়ে কাজে লাগার মতো কিছু আছে। ইঞ্জেকশান-টিঞ্জেকশান রয়েছে কিছু। তবে কোনো ডেলিকেট কেস হলে—

শান্তি।। কিছু ভেবো না। তুমি ডাক্তার, যেমন যেমন বুঝবে, লিখে দিও। আমি তো সদরে যাবো— আসার সময়ে নিয়ে আসবো। ঠিক আছে?

দৃশ্যান্তর

ঘরে ফেরা পাখিদের কলরব।

•

রায়।। বেশ জায়গাটা, না শান্তিদা? রদ্দুরে কেমন বিকেলের রঙ লেগেছে? ঝর্নার জলে সেই রোদ পড়ে— আহা-হা— ভাবা যায় না!

শান্তি।। খুবই সুন্দর। তবে রাতে যদি বাঘ বেরোয়, তখন এতটা ভালো লাগবে কিনা বলা মুশকিল রায়।

রাজেন।। এ জঙ্গলে বাঘ আছে নাকি ছ্যার?

শান্তি।। থাকাটাই স্বাভাবিক। ... যাই, একটু ঘুরে আসি।

অভয়।। কোন দিকে যাবেন?

শান্তি।। দেখি মুরগিটুরগি যদি পাওয়া যায় দু-চারটে।

অভয়।। আমি যাবো?

শান্তি।। আসতে পারো, তবে বন্দুকটন্দুক রেখে। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে।

অভয়।। ঠিক আছে— আসছি।

দত্ত।। তাহলে আমিও যাবো স্যার।

রায়।। আমিও।

শান্তি।। হ্যাঁ, ভালো কথা— একটা থলের মধ্যে কতকগুলো খাবারের প্যাকেট ছিল, ওগুলো নিয়ে নাও তো সঙ্গে—

অভয়।। ঠিক আছে। রায়দা আর দত্তদাকে নিয়ে আপনি এগোন, আমি নিয়ে আসছি।

দৃশ্যান্তর

পাখির ডাক। হাওয়ার শব্দ।

রায়।। আরে, ওই দেখুন দুটো ন্যাংটো বাচ্চা— ওই গাছটার পিছন থেকে লুকিয়ে আমাদের দেখছে!

দত্ত।। দাঁড়ান, চট করে একটা ছবি তুলে নি। ... যাঃ, পালিয়ে গেল।

শান্তি।। যাবেই তো? আসলে যারা এই জঙ্গলের মধ্যে জন্মেছে, বড়ো হয়েছে, তারা জঙ্গলের বাইরের কোনো মানুষকে সহজে মেনে নিতে পারে না। বিশ্বাসই করতে পারে না। নিরাপত্তার অভাব, বুঝলে না? সেই অভাববোধ থেকেই ওরা দুম করে মারাত্মক কিছু করে বসতেও পারে।

অভয়।। রাইফেল আনিনি বটে— তবে রিভলবারটা আমি কিন্তু সঙ্গে নিয়েছি শান্তিদা। আপনার সিকিউরিটির কথাটাও তো ভাবতে হবে?

শান্তি।। (হাসেন) জানি। তাহলেই দেখতে পাচ্ছো অভয়, ওই নিরীহ গরিব মানুষগুলোকে তোমরাই যখন বিশ্বাস করতে পারছো না, তাহলে ওরাই বা কোন ভরসায় তোমাদের বিশ্বাস করবে?

দত্ত।। কিন্তু আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি স্যার? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না?

রায়।। চারদিকটা কেমন যেন রহস্য-রোমাঞ্চকর!

শান্তি।। তুমি ছেলেবেলায় অনেক হেমেন রায়, নীহার গুপ্ত পড়েছ, তাই না রায়?

দত্ত।। স্-স্। কে যেন কাশলো? খুব চাপা গলায়?

শান্তি।। শুনেছি।

অভয়।। কই, কেউ তো কোথাও নেই?

দূর থেকে কাশির শব্দ শোনা গেল।

দত্ত।। ওই আবার! কিন্তু চারদিক তো ধু-ধু—

অভয়।। দেখুন তো শান্তিদা, ওটা কী?

শান্তি।। কই চলো তো?

দৃশ্যান্তর

যন্ত্রসংগীতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায় একটুকাল।

অভয়।। মানুষ।
দত্ত।। বেঁচে আছে তো?
রায়।। বলা মুশকিল। নড়াচড়া নেই, যেন মিশরের মমি।
দত্ত।। না না, ওই তো নিঃশ্বাস পড়ছে। খুব আস্তে আস্তে।
অভয়।। এ কী মানুষ শান্তিদা-- না কঙ্কাল?
শান্তি।। এদের ভয়েই তো তোমরা রিভলবার নিয়ে বেরিয়েছ!
অভয়।। (একটু জোরে) আপনার নাম?
রায়।। নো রেসপন্স।
অভয়।। শুনতে পাচ্ছেন?
রায়।। চোখ খুলেছে। বয়েস কত কে জানে? দুশো-তিনশোও হতে পারে!
দত্ত।। আপকা নাম ক্যা জী?
রায়।। কী ভাষায় এরা কথা বলে, কে জানে?
শান্তি।। যে ভাষাতেই বলুক, এরা সকলেই বাংলা জানে। অভয়, একটা প্যাকেট বের করো তো?
অভয়।। এই নিন।
শান্তি।। কত্তা-- দেখুন, এর মধ্যে ভালো ভালো খাবার আছে। খান। বাড়ির ছেলেপুলেদের দেবেন। খুব ভালো খেতে। এই নিন-- ধরুন। কেক আছে, লাড্ডু আছে... কী খেতে ভালো না?
অভয়।। খাচ্ছে।
রায়।। খাচ্ছে, বাট সেম এ্যাজ বিফোর। নো রি-অ্যাকশান।
শান্তি।। এবারে এই কেকটা খান? ওটা লাড্ডুর চেয়েও ভালো। খান।
অভয়।। আপনাদের জায়গাটা কী সুন্দর!
শান্তি।। কত্তার বাড়ি কোথায়?
রায়।। এবার অ্যাকশান, উইদাউট ডায়লোগ।
শান্তি।। ও-- ওই বাঁদিকে? আচ্ছা। ... ওই দূরে কিছু কুঁড়েঘর রয়েছে, না? আচ্ছা! জঙ্গলের রঙে এমন মিশে গেছে-- বাইরে থেকে ঠিক--
অভয়।। ওগুলো বাড়ি? আমি ভেবেছিলাম-- ঝোপ!
রায়।। একেই বলে নীড়। পঞ্চবটি বনে যেন যেমন রাম-সীতা-লক্ষ্মণ--
দত্ত।। ধন্যিমশাই! এর মধ্যেও আপনার কাব্যি আসে? সরুন তো-- দুটো ছবি তুলি?

পর পর ২/৩ বার ক্যামেরা সাটারের শব্দ।

শান্তি।। কত্তার বাড়িতে কে কে আছে?

রায়।। থার্ড আইটেম, বিস্কুটে কামড় পড়েছে, বাট নো ডায়লোগ।

শান্তি।। কিছু বলুন? আপনাদের সঙ্গে যে আলাপ করতে এলাম?

বুড়ো।। কী বুলবো হে? হামরা জংলি বটে। তুমরা বাবু। তুমাদিগের সাথে কী কুথা থাইকবেক?

শান্তি।। কেন, আমরা কী দোষ করলাম?

বুড়ো।। কুন দুস নাই। তুমাদিগের কুথা হামরা বুঝিনা হে! (চেঁচিয়ে) ভঞ্জা!— হেই ভঞ্জা—

খোলা মাঠে ডাকের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে।

অভয়।। শুনতে পেয়েছে। ওই যে আসছে—

দত্ত।। এ তো বাচ্চা ছেলে? বছর ১২/১৩ হবে?

রায়।। চুড়ো করে চুল বাঁধা, হাতে তীরধনুক, যেন লব-কুশ, বলুন?

দত্ত।। আঃ, রায়বাবু!

রায়।। স্যরি। ছবি তুলুন।

আবার ক্যামেরা সাটারের শব্দ।

শান্তি।। এসো ভঞ্জা, এসো। আর একটা প্যাকেট দেখি। এই নাও ভঞ্জা। সকলে মিলে খেও। কই ধরো?

বুড়ো।। ইয়ারা আনন্দ কইরে দিছে যখন, লিয়ে লে—

ভঞ্জা।। না, বাপ মানা কুর‍্যেচে।

শান্তি।। কেন বাবা? আমরা তো তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসেছি। না নিলে দুঃখ পাবো। ধরো।

দূর থেকে বাজখাঁই গলায় চিৎকার— "ভঞ্জা--"

অভয়।। এই মরেছে! ওটি আবার কে?

ভঞ্জা।। হামার বাপ বটে।

দত্ত।। ঘটোৎকচ। কাঁধে টাঙ্গি। এদিকেই যে আসছে স্যার?

শান্তি।। তাহলে আজ আসি কত্তা?

লোকটি।। (আদেশের সুরে) খাড়ও। — তুমরা তো পুইলশের লোক বটে?
শান্তি।। না। তবে পুলিশ আছে আমাদের সঙ্গে।
লোকটি।। তোমার কাছে বন্দুক আছে?
শান্তি।। আছে। তোমার কাঁধেও তো টাঙ্গি।
লোকটি।। হেই লাও-- ফেইলে দিলাম।
শান্তি।। অভয়, আমার রিভলবারটাও রাখো।
লোকটি।। তুমরা কেনে এখানে আইসছ, হামরা জানি।
শান্তি।। কেন?
লোকটি।। হামাদিগে ধরি লিয়ে যাবার লেগ্যে।
শান্তি।। ধরতে চাইলে তোমরা কি পালাতে পারবে? পালাতে পালাতে তো এখানে পৌঁছেছো! আরো পালাবে?

আবহসৃজনে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

রায়।। এইরে, শান্তিদা যে খালি হাতে ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন?
অভয়।। দেখাই যাক না, আমরা তো আছিই।
শান্তি।। আমাদের ভয় পেয়ো না ভাই। আমরা তোমাদের বন্ধু হতে চাই। আজ চলি? কাল আবার আসবো। কত্তা, গাঁয়ের লোকজনদের কাল এমনি সময়ে এখানে হাজির থাকতে বলবেন। অনেক দরকারি কথা আছে।
দত্ত।। আপনাদের এদিকে মুরগিটুরগি পাওয়া যাবে স্যার?
বুড়ো।। রাখেছিলম দুটা। কিন্তুক বিয়ানবেলাতে এমুন কঁকর-কঁ কইরে ডাইকতে লাইগলো, যে মোর ব্যাটার ঘুম ভাঙি যাতে, রাগে ও দুটাকে ধরি খায়ে লিলো।
অভয়।। কাঁচা?
বুড়ো।। হুঁ বটে।
দত্ত।। কে?
বুড়ো।। হামার ব্যাটা, হুই যে ভঞ্জটার বাপ।
রায়।। মনস্টার।
বুড়ো।। কিছু বুললেন বটে?
রায়।। না, বলছি খুব তেষ্টা পেয়েছে তো? বাড়ি যাবো।
শান্তি।। চলি, কত্তা। চলি ভাই? আসি ভঞ্জা।

দৃশ্যান্তর

মৃদু যন্ত্রসংগীত। বুনোপাখির ডাক। সন্ধ্যা।

রায়।। আপনি যখন লোকটার কাঁধে হাত রাখলেন, আমি কিন্তু সত্যি সত্যি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম শান্তিদা। এই জঙ্গলের পরিবেশে ও ব্যাটাকে তো সাক্ষাৎ কালকেতু মনে হচ্ছিল!

অভয়।। এটা খুব খারাপ ভাবেননি দেখছি।

দত্ত।। অনেক ছবি তুলেছি, জানেন স্যার— তার মধ্যে ওটাও আছে।

শান্তি।। আমিও কিন্তু খুব পিছিয়ে নেই। পকেটে রাখা অটোমেটিক টেপ রেকর্ডারটা চালু করে দিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে, এবার একটা অডিও-ভিস্যুয়াল রিপোর্ট কর্তাদের সামনে হাজির করতে খুব অসুবিধে হবে না আমাদের।

ভঞ্জা।। (দূর থেকে ডাকে) বাবু-- হেই বাবু--

অভয়।। ভঞ্জা না? কী হয়েছে ভঞ্জা?

ভঞ্জা।। (কাছে এসেছে হাঁপাচ্ছে) কুন দিকে যাইছেন বটে?

শান্তি।। তাঁবুতে। কেন?

ভঞ্জা।। এই পথ ধরে হাঁইটলে সারা রাত্তির জঙ্গলে ঘুরপাক খাব্যেন বটে!

শান্তি।। সে কী?

ভঞ্জা।। হঁ তো। ঝরনাটো হুই ধারে বটে।

রায়।। এই মরেছে।

শান্তি।। ভাগ্যিস তুমি বলে দিলে?... আজ থেকে তো তাহলে তুমি আমাদের বন্ধু হলে ভঞ্জা? তা বন্ধুকে তো কিছু দিতে হয়? আমার এই চাদরটা তোমাকে দিলাম। দেখি, একটু জড়িয়ে দিই? ... ব্যাস।

ভঞ্জা।। ইটো হামাকে দিয়্যে দিলেন? এক্কেবারে?

শান্তি।। হ্যাঁ। এক্কেবারে।

ভঞ্জা।। (আনন্দে) হুই—

কণ্ঠে অদ্ভুত উল্লাস নিয়ে ভঞ্জা দূরে চলে যাচ্ছে।

শান্তি।। কত খুশি দ্যাখো, কত সরল? ওই রঙিন চাদরটা গায় দিয়ে ভঞ্জা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে— যেন একটা— কী বলবো....

রায়।। হরিণ শিশু।

শান্তি।। কারেক্ট।

সমবেত হাসি।

দৃশ্যান্তর

ঝর্নার শব্দ স্পষ্ট হয়। রাত। ঝিঁঝির ডাক। দূরে শেয়ালের কোরাস।

রাজেন।। ঘড়িতি কটা বাজে দ্যাখো দিনি বাসু। চশমাটা আবার তাঁবুতে ফেল্যো আলাম।

বাসু।। দুটো পাঁচ।

রাজেন।। মোটে? তালি তো এখনো ৩/৪ ঘণ্টা?

বিভূতি।। তাতো হবেই। একটা থেকেই তো ডিউটিবদল হলো।

গণেশ।। জায়গাটা কী নির্জন! গা ছমছম করে।

বিভূতি।। ওরে রামু, পেট্রোম্যাক্সোর আলো কমে আসছে, দুটো পাম্প মেরে দে ভাই।

রাজেন।। আমার বন্দুকটা একটু ধরো দিনি ভাইডি, এট্টু হালকা হয়ে আসি।

গণেশ।। রাত যত বাড়ছে, ঠাণ্ডাটাও যেন চেপে আসছে!

বাসু।। হবে না? অঘ্রাণ তো শেষ হতে চললো। ধুনিতে আর দুখানা কাঠ চাপিয়ে দে তো?

দূর থেকে বাঘের গর্জনের মতো শব্দ শোনা গেল।

রাজেন।। (দূর থেকে ছুটে আসে) ওরে বাবারে— খায়্যে ফেললে রে—

গণেশ।। কী হলো রাজেনদা?

রাজেন।। বাঘ, বাঘ বারায়েছে জঙ্গলে। বন্দুক বাগায়ে ধরো সব্বাই। ছ্যার--

শান্তি।। (বলতে বলতে আসে) কী হলো? এ্যাঁ? মাঝরাতে এত চেঁচামিচি কিসের রাজেনবাবু?

রাজেন।। বাঘ বারায়েছে ছ্যার।

শান্তি।। কোথায়?

রাজেন।। জঙ্গলে।

শান্তি।। হা হা হা— একটা ফড়িং যেখানে দেখা যায়না, সেই ডিমৌলিতে বাঘ দেখেছেন?

রাজেন।। দেখিনি ছ্যার, শুনিচি। আপনিও শোনেন কান পাত্যে।

দূর থেকে আবার যেন বাঘের গর্জন। তবে থেমে থেমে।

শান্তি।। শুনলাম। ওটা বাঘ নয় মানুষ। যে যার কাজে যান।

রাজেন।। বাঘ না? বলেন কী ছ্যার?

শান্তি।। ঠিকই বলছি। ওটা গাছকাটার শব্দ।

রাজেন।। ওই রকম বাঘের ডাকের মতো?

শান্তি।। হ্যাঁ। একটা রিপোর্টে পড়েছিলাম জঙ্গলে চুরি করে গাছকাটার সময়ে ওখানে কতকগুলো মাটির খালি কলসি বা জালা রেখে দেয়। গাছ কাটার শব্দ বা ভাইব্রেশান ওর ভিতরে ঢুকে এমন আওয়াজ করে, যা দূর থেকে শুনলে অনেকেই বাঘ বলে ভয় পাবে। আগে পড়েছিলাম, আজ কানে শুনলাম। ঠিক আছে, কাল সকালে জঙ্গলে ঢুকে চেক-আপ করা যাবে— ও. কে.?

দৃশ্যান্তর

মোরগ ডাকে। হঠাৎ জিপের হর্ন।

রাজেন।। এই কেডা রে, সাহেবের গাড়িতি হাত দেচ্ছে? সাহস তো কম না?

শান্তি।। কী হলো রাজেনবাবু? একি ভঞ্জা না? ওরা কারা তোমার সঙ্গে? বন্ধু? এসো এসো।

বাসু।। স্যার টেণ্টে আপনার চা দিয়েছি।

শান্তি।। থ্যাঙ্ক য়্যু। শোনো বাসু, আমাদের এই সব ছোট্ট বন্ধুদের জন্যে বেশ জমপেশ করে কিছু টিফিন বানাবার ব্যবস্থা করো তো? এসো ভঞ্জা, বন্ধুদের নিয়ে চলো বরং আমরা তাঁবুতেই যাই। এসো।

দৃশ্যান্তর

ঝর্নার শব্দ। পাখপাখালির ডাক।

শান্তি।। আচ্ছা ভঞ্জা, কাল রাতে যে আবার গাছ কাটা হলো, তারপর মাটির কলসিগুলো কী করলে?

ভঞ্জা।। ঘরে লিয়ে গেলম। কামে যাবার কালে ফের সাথে করি লিয়ে যাবে সক্কলা।

শান্তি।। ওগুলো কে দেয় তোমাদের? যারা গাছ কাটায় তারা?

ভঞ্জা।। হঁ বটে।

শান্তির।। হুম্। ... আরে খাও— খাও তোমরা, খেতে খেতে গল্প করো। ... রাত

জেগে এসে গাঁয়ের সব্বাই নিশ্চয়ই এখন ঘুমোচ্ছে? তা রান্নাবান্না হবে কখন তোমাদের?

ভঞ্জা।। (খেতে খেতে) হবেক লাই।

শান্তি।। সে কী? তাহলে তোমরা খাবে কী?

ভঞ্জা।। রাইত শ্যাষে কামের পর সকলা ঘরে ফিরেয় ভিজা ভাত খায়্যে লিছে দমভর। রাইতে ফের রসুই চড়াইবে বটে।

শান্তি।। সারাদিনে একবার? তোমাদের খিদে পায় না?

এই অবিশ্বাস্য কথা শুনে বালকের দল খিল্‌খিল্‌ করে হাসে।

দৃশ্যান্তর

দূরে জমায়েতেব কোলাহল।

অভয়।। লোকজন যা দেখছি, এই রুটি-তরকারিতে কুলোবে বলে মনে হয় না।

রায়।। একটু কম-বেশি করে ম্যানেজ করতে হবে। এসেছে যখন— ফেরানো তো যাবে না?

অভয়।। তা ঠিক। ও দত্তদা, ছবি তুললেন?

দত্ত।। কী তুলবো অভয়? এ কী চেহারা! ৫০-এর মন্বন্তরেও বোধহয় এর চেয়ে ভালো অবস্থা ছিল।

জনতার গোলমাল কিছুটা বাড়ে।

রাজেন।। আরে তোমাগের জন্যি তো সতরঞ্চি পাত্যে দেয়া হইছে। তাতে আস্যে বসো সকলে। ছ্যার কথা বলবেন তোমাগের সঙ্গে।

অভয়।। ওরা ভয় পাচ্ছে রাজেনদা।

বুড়ো।। যা বুলব্যে ঝপাঝপ বুলো হে। সারারাত জাগা আছি বটে, এখন ঘুম লাইগছে।

শান্তি।। জানি, কাল সারারাত তোমরা গাছ কেটেছো। বছরের পর বছর ধরেই কাটো।

ভঞ্জার বাবা।। (চটে যায়) হঁ হঁ কাটি। হামরা গাছ কাটি, মানুষ কাটি, না কাইটলে খাব কী? কে খেতে দিব্যে হামাদিগে?

শান্তি।। সারারাত তো কাটলে, পেটভরে খেতে পেয়েছো কিছু?

জনৈক।। (দূর থেকে) দিনেরবেলা মোদের অত ক্ষুধা লাগে না।

শান্তি।। তোমাদের না লাগতে পারে, কিন্তু এই যে শিশুটা, যে এখনো ভালো করে দাঁড়াতে শেখেনি, তারও কী কোনো খিদে নেই? (গুঞ্জন কমে যায়) চুপ করে গেলে কেন? উত্তর দাও! ... এই সব অসুস্থ হাড্ডিসার বাচ্চাদের মুখে কখনও তোমরা দুফোঁটা ওষুধ দিয়েছ? একটা জামা নেই কেন ওঁদের গায়ে? কেন তোমাদের পরবার কাপড় নেই? কেন পেটপুরে দুমুঠো খাবার সঙ্গতি নেই তোমাদের?

ভঞ্জার বাপ।। উ সব হামরা জানি হে। হামাদের দুঃখুকষ্ট হামরা ছাড়া কে আর জাইনবেক বটে?

জনতা।। হঁ হঁ, ই ছাড়া হামাদিগের কী উপায় আছে বটে?

জনতার কোলাহল তীব্র হয়।

শান্তি।। আছে বইকি। ইচ্ছে থাকলেই উপায় থাকে। এখন থেকে তোমাদের অন্য কিছু করতে হবে। না, আর গাছ কাটা নয়। কেটে কেটে সব তো প্রায় শেষ করে এনেছ। আর দশ বিশ বছরে এ জঙ্গলে কী আর একটাও গাছ থাকবে? তখন? তোমাদের ছেলেপুলেরা কী কাটবে তখন? কী খাবে?

আবার জনতার কোলাহল।

জনতা।। তুমরা হামাদিগের খোরাক বন্ধ কুর‍্যে দিতে আইসছ?

জনতা।। মের‍্যে ফেইলতে চাইছ হামাদিগ্যে?

শান্তি।। না। আমরা চাই তোমরা বেঁচে থাকো। তবে জন্তু-জানোয়ারের মতন নয়, মানুষের মতো। এইভাবে গাছ কেটে তোমাদের আমাদের কারুরই ভালো হচ্ছে না। লাভ হচ্ছে একমাত্র ওই মহাজনদের। যারা তোমাদের পাতে একবেলা কুকুরের মতো একমুঠো ভাত ছুঁড়ে দেয়, আর লরি বোঝাই করে নিয়ে যায় কোটি কোটি টাকার গাছ। তোমরা অন্ধকারে থাকো আর ওদের ঘরে তখন কাটাগাছের টাকায় আলোর বন্যা বয়ে যায়।

বুড়ো।। তো হামরা কী কইরব সি কুথাটো তো বুলল্যে না হে?

শান্তি।। বলবো বলেই তো তোমাদের ডেকেছি। এই জঙ্গলে বসে বুঝতে পারছ না দেশ কত এগিয়ে গেছে। সরকারিআইন এখন তোমাদের দিকে।

কথার ফাঁকে আদিবাসী সুরে বাঁশীর মৃদু সুর বাজে।

শান্তি।। তোমরা চাইলে ওই ঝোপড়ি নয়, দেয়ালঘেরা বাড়ি হবে তোমাদের। পুকুর হবে, হাসপাতাল হবে, স্কুল, পোস্ট-অফিস সব হবে। তোমরা যদি চাও— তোমাদের জন্যে নতুন করে গ্রাম গড়ে তোলা হবে। ঘরে-ঘরে গরু ছাগল থাকবে। পুকুরে হাঁস, উঠোনে মুরগি চরবে। মাঠভরে ফসল ফলাবে তোমরা। ফসল কাটবে, গোলায় পুরবে। কোনো অভাব থাকবে না তোমাদের সংসারে।

বাঁশীর সুরের সঙ্গে মাদল-সঙ্গত হয়।

শান্তি।। পরব এলে নতুন জামাকাপড় পড়বে। মাদল-বাঁশী বাজিয়ে নাচবে, গাইবে। তোমাদের ছেলেময়েরা স্কুলে পড়তে যাবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, তোমাদের দুঃখ ঘোচাবে। এমন একটা জীবন ভালো লাগে না তোমাদের? চোরের মতো অন্ধকারে লুকিয়ে না থেকে দিনের আলোয় মানুষের মতো বাঁচতে ইচ্ছে করে না?

জনতা।। হঁ হঁ, করো্যে, ইচ্ছা করো্যে।

ভঞ্জার বাবা।। হেই চুপ যা। বাবুদিগের কথা শুনে চেঁচাইছিস কেনে? কে দিবে তুদের ভাত-কাপড়?

মাদল আর বাঁশীর সুর মিলিয়ে যেতে থাকে।

ভঞ্জার বাপ।। কে দিব্যে ওষুধ? এই বাবুরা দিব্যে? বলুক দিব্যে, আমরা গাছ কাইটবুনি। কিন্তুক দিব্যেক নাই। শহুরেবাবু ইয়ারা। বড়ো বড়ো কুথা বুইলবেক, পুলুস দিয়্যা হামাদিগের গাছ কাটা বন্দ করাইব্যেক, কিন্তুক ভাত-কাপড় দিব্যেক নাই। যে দিব্যে, সে মহাজন।

বুড়ো।। গাছ না কাইটলে হামরা খাবু কী, বাবু?

শান্তি।। অন্য কাজ করবে। দিনেরবেলার কাজ। আর সেই কাজের বদলে খাবার পাবে। পেটভরা খাবার।

ভঞ্জার বাপ।। আরে বাবা, কী কাম বুলবে ত?

শান্তি।। গাছ লাগানোর কাজ। হ্যাঁ, যে সব জায়গায় গাছ কেটেছ এতদিন, সেইসব জায়গায় নতুন করে গাছ লাগাতে হবে তোমাদের।

জনতার গুঞ্জন আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জনতা।। গাছ লাগাইতে হব্যেক! গাছ লাগাইলে ভাত মিলব্যেক....?

শান্তি।। হ্যাঁ। কিন্তু এখন তোমাদের শুধু গর্তখোঁড়ার কাজ। অনেক গর্ত খুঁড়তে হবে। বর্ষা নামলে সরকারই চারা পাঠাবে, সেই সব চারা লাগিয়ে দেবে সেখানে। যে জঙ্গল এতকাল ধরে কেটেছ, তা আবার তোমরা নিজেরাই ভরে দেবে গাছে গাছে। কী? রাজি আছ সবাই?

ভঞ্জার দল।। হুঁ-হুঁ রাজি।

শান্তি।। বেশ, তাহলে এই পর্যন্ত। রাজেনবাবু, ওদের খাবার দিয়ে দিন। এসো, খাবার নিয়ে যাও।

জনতার গুঞ্জন কোলাহল হয়ে ওঠে। আবার মাদল বাঁশী বাজে।

ভঞ্জা।। আরে, অত চেঁচাইছ কেনে? সার বেঁধে এক-একজনা কর‍্যে এস্যো খাবার লিয়ে লাও।

শান্তি।। দেখছো তোমরা? ভঞ্জারাই যেন আজ দলের নেতা! সাব্বাস বেটা! সাব্বাস!

দৃশ্যান্তর

জিপগাড়ি ওয়ার্ম আপ করার শব্দ।

রাজেন।। আপনি কি এখনই চলে যাতিছেন ছ্যার?

শান্তি।। হ্যাঁ, ডি. এম. সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে—

রাজেন।। রায়সাহেবও চললেন নাকি সঙ্গে?

শান্তি।। হ্যাঁ, দুখানা জিপ নিয়ে যাচ্ছি তো? অনেক জিনিসপত্তর আনতে হবে। একটা গাড়ি রইলো, যদি আপনাদের কোনো দরকার হয়—

রাজেন।। কবে নাগাদ ফেরবেন ছ্যার?

শান্তি।। চেষ্টা করবো ২/৩ দিনের মধ্যে ফেরবার। তবে যে কটা দিন না ফিরি, আপনি অভিজ্ঞ মানুষ, কড়া নজর রাখবেন চারদিকে। আমাদের এখানে আসাটা, বুঝতেই পারছেন, একদল লোকের সেটা পছন্দ নাও হতে পারে। দত্ত রইলো, অভয় রইলো, ওদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবেন। ভঞ্জারা কোথায় গেল?

অভয়।। ওই তো ওখানে।

শান্তি।। ওদের তুলে দাও আমার গাড়িতে।

রাজেন।। ওগুলোনরে আবার কনে নিয়ে যাবেন ছ্যার?

শান্তি।। কোথাও না। ওরা বলেছে, আমাকে একটা নতুন রাস্তা দেখিয়ে দেবে। ওঠো ওঠো— বন্ধুদের নিয়ে চটপট গাড়িতে উঠে পড়ো ভঞ্জা। গুড। স্টার্ট।

জিপটা স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে যায়।

দৃশ্যান্তর

দূর থেকে গাড়িটা এসে থামে।

শান্তি।। সত্যিই তো! বেশ তাড়াতাড়ি এসে গেলাম তো বড়ো রাস্তায়?
ভঞ্জা।। ই পথটো উরা বানাইছে বটে।
রায়।। কারা?
ভঞ্জা।। যারা কাঠ লিতে আসে ইখানে?
শান্তি।। হুম্। শোনো, আমরা এখান থেকে শহরে চলে যাবো ভঞ্জা। তোমাদের জন্যে কী আনবো বলো। (যন্ত্রসংগীতের মধ্যে শান্তিবাবুর পুরোনো বক্তৃতার অংশবিশেষ শোনা যাবে) "পরব এলে নতুন জামাকাপড় পরবে। মাদল-বাঁশী বাজিয়ে নাচগান করবে। তোমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, তোমাদের দুঃখ ঘোচাবে।"
ভঞ্জা।। হামি লেখাপড়া শিখবো।
শান্তি।। কী? কী বললে?
ভঞ্জা।। পড়ালিখা শিখবো হামি। তুমার মতন হবো বটে!

একঝাঁক পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে।

শান্তি।। (উত্তেজিত) শুনতে পাচ্ছ রায়, কী বলছে?
রায়।। রিয়েলি স্পেনডিড!
শান্তি।। আরে, অমৃতফলের বীজ যখন একবার হাতের মুঠোয় পেয়েছি, তখন তুমি দেখে নিও রায়, বিষবৃক্ষ আমি উপড়ে ফেলবোই। ঠিক আছে। এবার তোমরা যাও।

আবার জিপে স্টার্ট দেবার শব্দ।

দৃশ্যান্তর

অভয়।। এবার কিন্তু রিয়েলি আপনাকে ডাক্তার-ডাক্তার দেখাচ্ছে দত্তদা, গলায় স্টেথোস্কোপ, হাতে ডাক্তারি ব্যাগ!

দত্ত।। হা হা হা—

অভয়।। আমার মেকআপটাও দেখুন? যেন পাক্কা কম্পাউণ্ডার, তাই না?

দত্ত।। প্রায়। যেমন জংলি ডাক্তার তেমনি জংলি কম্পাউণ্ডার।

দুজনে হাসে। দূরে ঝর্নার শব্দ।

অভয়।। বেরিয়ে তো পড়লাম, কিন্তু কিছুই তো চিনি না।

দত্ত।। ওই ছেলেগুলো কোথায় যাচ্ছে বলো তো?

অভয়।। কে জানে? আরে, ভঞ্জাও রয়েছে না ওদের সঙ্গে? (চেঁচিয়ে) ভঞ্জা—

ভঞ্জা।। (দূর থেকে) ডাইকছ কেনে?

অভয়।। একটু শোনো না এদিকে?

ভঞ্জা।। বুল। আরে, কুথাকে চইলছ বটে তুমরা?

দত্ত।। তোমাদের পাড়ায়। রুগি দেখতে। আমরা তো চিনি না কাউকে, তুমি একটু এসো না আমাদের সঙ্গে?

ভঞ্জা।। তুমি ডাকদারবাবু?

অভয়।। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

ভঞ্জ।। ডাকদারবাবু, হামার মা-টোকে তুমি সারাই দিব্যে?

দত্ত।। তোমার মাকে?

ভঞ্জা।। তিনমাস শুয়ে রইছে বটে। মিলাই গিছে মাটিতে।

দত্ত।। কী হয়েছে? জ্বর?

ভঞ্জা।। পচা ভূতে ধরেছ্যে। গুলিন বুল্যেছে, জব্বর ভূত। ছাইড়বেক লাই।

দত্ত।। চলো তো, দেখি—

সমস্বরে কিছু কাকের জটলা চলছে।

দৃশ্যান্তর

দত্ত।। আচ্ছা, এইটে তাহলে তোমাদের বাড়ি? বাঃ! আরে, ওই তো তোমার দাদু বসে রয়েছে দেখছি! — আপনাদের বাড়ি এলাম কত্তা।

ভঞ্জা।। মাকে দেখতে আইসছে বটে। উয়ারা ডাকদারবাবু বটে। আসেন,

মাথাটো লামাই ঘরে ঢুক্যে আসেন কেনে। — হেই মা, মা রে— ডাকদারবাবু আইসছে গ মা— তুকে দেইখবে বটে— তুকে সারাঁইন দিব্যে! ভালো হইঁয়্যে যাবি মা।

ভঞ্জার বাবা।। কী হবেক বাবু উয়ারে টানাটানি কর‍্যে। পচা ভূত লেইগেছে উয়ার শরীলে। উ আর বাঁচবেক লাই।

দত্ত।। দেখি না একবার। ভঞ্জা কত আশা করে ডেকে আনলো—

বুড়ো।। কী ভালো ছিল গ বউটো। বড়ো ভালোমানুষ ছিল হে। আহা— কী মধুরবচন মুখ্যে। লিজে না খেইঁয়ে হামাদিগে খাওয়াইঁছে। আহা-হা, কী হইঁয়ে গেল দিনে দিনে।

দত্ত।। চট করে উনুন জ্বেলে একটু জল গরম করো তো ভঞ্জা।

ভঞ্জা।। ঠিক আছে।

দত্ত।। অভয়, জলটা গরম হলে এই পটে ছেঁকে নিয়ে দু-চামচে বরিক পাউডার মিশিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ দেখছি।

বুড়ো।। কী বুলব্যো আইগাঁ, সবই কপালের দুস্। শক্তসমর্থ মেয়্যামানুষ, সাঁজবেলাতে চুল খুল্যে গিরস্তির কামকাজ কইরতে ছিল— ত তখন পচা ভূতে ধইরল বউটোকে। তিনমাস হইঁয়ে গেল গঁ বাবু। হুতা-হুতা জ্বর। গা পুড়ে যেইঁছে। চোখ দুটা শিমুল ফুলের পারা। গ্যাঁজলা উঠছে মুখ দিয়্যা। কত কবরেজ-গুলিন করাইলম, থাবাই-থাবাই দাওয়াই খাওয়াইলম। ত কী হইঁল ইয়াতে?

দত্ত।। এত ঘা হয়ে গেল কী করে সারা গায়ে?

ভঞ্জার বাপ।। ভূত তাড়াইবার লেগ্যে গুলিন ত হলুদপোড়ার ছ্যাঁকা দিছিল, তাথেই—

অভয়।। সেকি! ... যাক খাওয়াদাওয়া কী করে এখন?

বুড়ো।। কী আর খাবেক? গুলিন বুল্যে দিছে এই পচা ভূতটো বড়ো তেজি বটে। রুগিরে কিছু খাওয়াইলে ভূতের শরীলে জোর বাইড়বেক। তেজ বাইড়বেক। মন্তরতন্তরে তখন কাম হব্যেক লাই। সেই থিকা উয়ার খোরাক বন্দ কর‍্যে দিছে গুলিন।

দত্ত।। কী সর্বনাশ, কিছু না খাইয়ে রেখেছ? কতদিন?

বুড়ো।। তা হপ্তা দুই হব্যেক বটে। তাথেই ত ভূতের তেজ মরে আইসছে আইগাঁ।

দত্ত।। বোঝো ঠেলা। ... জলটা গরম হলো অভয়? একটু দাও তো, সিরিঞ্জটা ধুয়ে নিই?

অভয়।। ইনজেকশন দেবেন?

দত্ত।। হ্যাঁ, আর একটা নয়, দুটো। ইস্— শেষ করে ফেলেছে একেবারে?

ভঞ্জার বাবা।। বেখাই মানুষটোরে ফোঁড়াফুঁড়ি লাড়াঘাটা কর‍্যে কষ্ট দিচ্ছ হে। বড়

গুলিন বুল্যে গিছে উয়ার মেয়াদ শ্যাষ হইঁয়ে গিছে। উ আর বাঁচবেক লাই হে।

ভঞ্জা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

দত্ত।। ছি ভঞ্জা, কাঁদে না। তোমার মা ভালো হয়ে যাবেন?

ভঞ্জা।। সাচ বুইলচ ডাকদারবাবু? হামার মাটো ভালো হইঁয়্যে যাবেক?

অভয়।। হ্যাঁ রে পাগল। এই ইনজেকশান দুটো পড়লেই— তোদের গুনিনের পচা ভূত এ দেশ ছেড়ে পালাবে।

ভঞ্জা।। তুমি হামারে ভুলাইছ না ত?

অভয়।। ভোলাবে কেন? ওষুধগুলো যেমন-যেমন বলে দেবেন ডাক্তারবাবু, সেইভাবে খাওয়াবি— দেখবি, খুব শিগগির সেরে উঠবেন তোর মা!

দত্ত।। শোনো ভঞ্জা, এই ওষুধটা দিনে তিনবার খাওয়াবে। রাতে খাবার ওষুধ দিয়ে দেবো। তাছাড়া কমপ্ল্যান বলে একটা কৌটো দেবো, কেমন করে বানাতে হয় দেখিয়ে দেবো, গুঁড়োদুধের মতো। সেটা সারাদিনে ৫/৬ বার খাওয়াবে মাকে, সেই সঙ্গে দুটো করে বিস্কুট। সব আমরা দিয়ে দেবো, আর সঙ্গে একটা কম্বল। এই পাতার উপরে নয়, ওটার ওপরেই শোয়াবে, কেমন? কী হলো ভঞ্জা, বললাম না— কাঁদলে মায়ের অসুখ সারতে দেরি হয়? চলো আমার সঙ্গে।

দৃশ্যান্তর

ঝিঁঝির ডাক। ঝর্ণার মৃদু শব্দ।

গণেশ।। (উত্তেজিত) রাজেনদা, ও রাজেনদা—

রাজেন।। (ঘুম ভেঙে চমকে) কে? কে? কী? কেন? কোথায়?

গণেশ।। জঙ্গলে।

রাজেন।। কে? ও গণেশ? জঙ্গলে কী?

গণেশ।। আবার কাঠ কাটছে যে— শুনতে পাচ্ছেন না?

বাঘের ডাকের দূরাগত শব্দ ভেসে আসে।

অভয়?। কী হয়েছে গণেশ?

গণেশ।। ওই তো শুনুন কান পেতে?

অভয়।। তাইতো, এত কথা হলো সেদিন— আবার গাছ কাটছে?

রাজেন।। বেইমান, বুঝলে ভাইডি, শালারা সব বেইমান। এই যে দত্তবাবু, তিন দিন ধরে ঘরেঘরে ঢুক্যে ওদের ট্রিটমেণ্ট করতিছেন, বিনে পয়সায় ওষুধপত্তর পথ্যি জুগিয়ে যাতিছেন— আর তেরাত্তির না পোয়াতিই মুখ মুছে ফেললি হারামজাদারা? যে ডালে বসবি— তারই গোঁড়ায় কোপ মারবি?

ভঞ্জা।। (হাঁপাতে হাঁপাতে আসে) ডাকদারবাবু গো—

দত্ত।। এ কী রে ভঞ্জা? এত রাতে? হাঁপাচ্ছিস কেন?

ভঞ্জা।। (চাপা গলায়) মহাজনের লোক টেরাক লিয়্যে এইয়েছে বটে। পাড়ার মানুষজনারে আবার উল্টাসিধা বুঝ করায়্যে গাছ কাইটতে লাগাইন দিছে।

রাজেন।। কতলোক আছে তোদের মহাজনের দলে?

ভঞ্জা।। ৫/৭ জন হব্যেক বটে। দু-টা টেরাক আনা করাইছে। বুলছ্যে— জন্ম থিকা তুরা ই জঙ্গলের মালিক বটে— উয়ারা আইজ মানা কইরল— আর তুরা মেন্যে লিলি? কত বইকল মোর দাদুরে। বুললো, যে ট্যাকা তুরা আগাম লিচু— এখুনি ফেলায়ে দে সি ট্যাকা! আরো কত কী বুলল। এট্টু ফাঁক পেতেই ছুট্যে এলম তুমাদিগে খবর কুইরতে।

গাছকাটার শব্দ আবার স্পষ্ট হয়।

দত্ত।। তোমার মা এখন কেমন আছেন ভঞ্জা?

ভঞ্জা।। অনেকটা ভাল। মাজেমইধ্যে চোখ মেইলছ্যে, দুটা একটা কুথাও বুইলছে বটে।

দত্ত।। ঠিক আছে। যেমন-যেমন বলেছি, ওষুধ আর পথ্যি খাইয়ে যাবে নিয়ম করে।

ভঞ্জা।। কিন্তুক গাছকাটার কী হব্যেক বাবু?

দত্ত।। বড়োবাবু আগে ফিরুন, তারপর ভাবা যাবে।

ভঞ্জা।। মহাজন বুল্যে দিছ্যে, ফাঁক পাইলেই তির মেরো তুমাদিগ্যে খতম কুর্য়ে দিতে। লাশ-পিছু দশ ট্যাকা দিব্যেক।

রাজেন।। তা তুই ওদের সঙ্গে গেলি না কেন গাছ কাটতি?

ভঞ্জা।। হামি? ওই মহাজনের সাথে হাত মিল্যায়ে? ছিঃ!

অভয়।। সাব্বাস! যা— এখন পালিয়ে যা—

গাছকাটার শব্দ ক্রমশ বাঘ ডাকার মত হতে থাকে।

দৃশ্যান্তর

পাখির ডাক। দূর থেকে জিপ এগিয়ে আসছে।

শান্তি।। বুঝলে রায়, ভেতরটা একেবারে ছটফট করছে। তিনদিনের কথা বলে বেরিয়েছিলাম, তা ছদিন হয়ে গেল ফিরতে। এরমধ্যে কত কী যে ঘটে গেল— কে জানে!

রায়।। কী আর হবে? যারা আছে, সবাই বুদ্ধিমান, একসপার্ট। পরিস্থিতি বুঝে সামলে দেবে।

শান্তি।। হ্যাঁ, সেই যা ভরসা।

জিপগাড়িটা দূরে চলে যায়।

দৃশ্যান্তর

গলা ঝাড়া ও কুলকুচির শব্দ।

বাসু।। পেট ভরেছে তো রাজেনদা? আপনি তো প্রায় কিছুই খাচ্ছেন না!

রাজেন।। আরে ভাইডি, দিনগত পাপক্ষয়। বুঝলে বাসু, তোমাগের এই নিরিমিস্যি খায়্যে খায়্যে পেটে পুরো চড়া পড়্যে গেল হে। এইসব শাকপাতা খায়্যে কখনও পুলিশির শরীল টেঁকে? খাতি বসলিই নিজিরি ক্যামন বিধবা-বিধবা মনে হয়।

বাসু।। কেন, একবেলা করে তো ডিম হচ্ছে?

রাজেন।। আরে দূর, ডিমও তো নিরিমিস্যি। দত্তবাবুরি জিগ্যেস কোরো। সর সর— সাহেবের তাঁবুতে মিটিং। দেরি হয়ে গেল।

দৃশ্যান্তর

কাঠঠোকরা পাখির ঠকঠক শব্দ।

শান্তি।। বোসো তোমরা। শোনো ফিরতে আমার দিনতিনেক দেরি হলো বটে, তবে আমাদের সৌভাগ্য সব কথাই ডি. এম. সাহেবকে বোঝাতে পেরেছি। এখানকার সমস্যা উনি খানিকটা অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং সবরকম ভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি, অবশ্য

যতটা ওঁর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। এই ব্লু-প্রিন্টটা দ্যাখো— এতেই ডিমৌলির ডেভেলপমেন্টের স্কিমটা ধরা আছে। এই যে, এখানে— ফরেস্ট-অফিস হবে। আর এখান থেকে বড়ো রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগের পাকা সড়ক। গ্রীষ্মকালে ঝর্নার জল কমে গেলে যাতে লোকজনদের কষ্টে পড়তে না হয়, তারজন্যে ঝর্নাকে আরো গভীর করে কাটিয়ে জলের সাশ্রয় বাড়াতে হবে। পরে বিদ্যুতেরও ব্যবস্থা হবে। এছাড়া প্রাইমারি স্কুল আর একটা হাসপাতালও তৈরি করা দরকার।

অভয়।। কিন্তু এসব কাজ করতে তো অনেক সময় লাগবে শান্তিদা?

শান্তি।। তা ঠিক। তবু যতদিন ফরেস্ট-অফিসের বাড়ি তৈরি না হচ্ছে, ততদিন তাঁবু খাটিয়েই কাজ চালাতে হবে। ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে এইসব ডেভেলাপমেন্টের কাজ চলবে। টেণ্ট করে ছোটোখাটো একটা ডাক্তারখানাও বানিয়ে ফেলবো। ওটা দত্ত চালিয়ে নিতে পারবে। আর প্রাইমারি স্কুল বসবে শান্তিনিকেতনের স্টাইলে, গাছতলায়। রায় হবে তার টিচার। আমি ব্ল্যাকবোর্ড চক শ্লেটপেনসিল বর্ণপরিচয়— সব এনেছি।

রায়।। এছাড়া জিপ বোঝাই হাঁড়ি কড়াই চাল ডাল আটা কাপড়চোপড় কোদাল ঝুড়ি এমন কী প্রত্যেক বাড়ির জন্যে একটা করে লণ্ঠনও আনা হয়েছে।

রাজেন।। লণ্ঠন?

শান্তি।। হ্যাঁ, অন্ধকার তাড়াতে হবে তো? আগে বাইরের, তারপরে মনের। ভালোকথা, আজ রাত থেকেই পাহারা জোরদার করতে হবে। সবাই এ্যালার্ট থাকবেন। যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ হওয়া অসম্ভব নয়। পাগলাকুকুর ক্ষেপে রয়েছে। ... ও, চা এসেছে? থ্যাঙ্কস্।

চায়ের পরিবেশনজনিত মৃদু কোলাহল।

ভঞ্জা।। বাবু!

শান্তি।। কে? ও ভঞ্জা? আয় আয়। তোর মা কেমন আছেন?

ভঞ্জা।। ভাল। ডাকদারবাবুর ওষুধে এখুন বেশ ভাল। কিন্তুক—

শান্তি।। কী?

ভঞ্জা।। আজ রাইতে ফের মহাজনের টৈরাক আইসব্যে গ বাবু, কাটা-গাছ লিয়ে যেত্যে।

শান্তি।। তা কী করবো বলো ভঞ্জা? তোমাদের গাঁয়ের সবাই তো মহাজনের

দিকে। মহাজনও লোকজন নিয়ে আসবে। গুণ্ডা আনবে। আমরা এ কজন মানুষ— কী করবো বলো?

ভঞ্জা।। বাবু, হামার চোদ্দজন বন্ধু আছে। হামরা এক-এক তীরে এক-একটোকে শ্যাষ কর‍্যে দিতে পাইরবো। শুধু তুমরা যদি বন্দুক লিয়ে হামাদিগের পাশে থাক ত একটা গাছও লিতে দিবক লাই উদের।

শান্তি।। বুঝলাম। কিন্তু তোমার বাবা, দাদু, পাড়ার লোকেরা তো থাকবে ওদের সঙ্গে?

ভঞ্জা।। উরা আইসবার আগেই খতম কুর‍্যে দুব শালাদিগে। মহাজন যখন লোকজন লিয়্যে টৈরাক থেইকে লাইমব্যে—

শান্তি।। কিন্তু ওদের হাতে তো বন্দুক পিস্তল থাকবে। যদি তোমাদের গায়ে লেগে যায়?

ভঞ্জা।। না না, অত্ত গাছের মইধ্যে বন্দুক-পিস্তল চালাইল্যে কী হবেক। আন্ধারে উয়ারা কি হামাদিগে দেইখতে পাবেক? গাছের আড়াল থিকে তির চালাইবো হামরা।

শান্তি।। কিন্তু তোমাদের গাঁয়ের লোকজনের হাতেও তো তিরধনুক থাকবে? তারা কী আর ছেড়ে দেবে তখন?

ভঞ্জা।। তির-ধনুক উয়ারা যেখানে রাখ্যে, জানি ত? যখুন গাছ বইতে যাবেক — সেইফাঁকে ওগুলান সরাই দিব হামরা।

নীরবতা। ঝর্নার জলের শব্দ আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বড়বাবু, কিছু বুল কেনে?

শান্তি।। (শান্ত গলায়) কিন্তু ভঞ্জা, আমরা যদি হেরে যাই?

ভঞ্জা।। না বাবু, হাইরব লাই। কুনদিন হাইরব লাই হামরা।

শান্তি।। (আবেগে) রাজেনবাবু, দত্ত, অভয়, রায়— দ্যাখো, তাকিয়ে দ্যাখো— আমরা পেয়ে গেছি! আসল সেনাপতি আমরা পেয়ে গেছি!

যন্ত্রসংগীতে আনন্দের সুর।

দৃশ্যান্তর

ঝিঁঝির ডাক। হাওয়ার শব্দ। দূরে ঝর্না।

অভয়।। এখন রাত বারোটা পঁয়ত্রিশ।

শান্তি।। (একটু চাপা গলায়) ভঞ্জা তার দলবল নিয়ে চলে গেছে। আগের

আলোচনা মতো আমাদের দলও এখান থেকে দুভাগ হয়ে যাবে। রাজেনবাবুর টিমে তিনজন কনস্টেবল ছাড়া অভয় আর রায় থাকবে। আর আমার দলে চারজন কনেস্টবল ছাড়া দত্ত আর আমি। ... ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলার সময়ে সাবধানে পা ফেলতে হবে, যাতে কোনো শব্দ শোনা না যায়। ওদের ট্রাক এসে জঙ্গলের যেখানে থামবে, সেই জায়গাটা ভঞ্জা আমাদের জানিয়ে গেছে। কাজেই সেটাকে সেণ্টার ধরে দুপাশ দিয়ে এগোতে হবে আমাদের সাড়াশি আক্রমণের কায়দায়। মাটিতে শুয়ে থাকবেন সকলে। দরকার বুঝে প্রথম ফায়ার আমি করবো। সেই শব্দ শুনলে আপনারা চার্জ করবেন। ওয়েল-- লেট আস প্রসিড কমরেড। গো অ্যাহেড।

ঝিঁঝির ডাক তীব্রতর হয়।

দৃশ্যান্তর

দূর থেকে ট্রাকের শব্দ কাছে এগিয়ে আসছে। সকলে চাপা গলায় কথা বলবে। গাছের পাতার শব্দ।

রায়।। স্ স্-- ট্রাক ঢুকছে।

অভয়।। দূরে দুটো সবুজ আলো নাচানাচি করছে না রাজেনদা? মনে হচ্ছে যেন সিগনালিং?

রাজেন।। ঘাপটি মার্‌্যে শুয়ে থাকেন!

ট্রাকের শব্দ কাছে এসে দাঁড়ায়। ডালা খোলার শব্দ। ঝিঁঝির ডাক স্পষ্ট হয়।

শান্তি।। কজন লোক মনে হচ্ছে দত্ত?

দত্ত।। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবু মনে হয় ১০/১২ জনের কম নয়। ওই দেখুন স্যার-- মনে হচ্ছে সকলের হাতেই স্টেনগান অথবা রাইফেল।

শান্তি।। স্বাভাবিক। তৈরি হয়েই এসেছে।

দত্ত।। আমরাও কিন্তু তৈরি।

হঠাৎ আর্তনাদ। কেউ যেন পড়ে গেল। ওদের কলরব।

জনৈক।। ক্যা হুয়া ভাই? ক্যা হুয়া?

আবার আর্তনাদ। আবার পতন।

জনৈক।। আরে কা ভৈল হো?

আর্তনাদ করে আবার কেউ পড়ে যায়।

রায়।। কী হচ্ছে বলুন তো রাজেনদা?
রাজেন।। কী জানি ভাইডি, কিছুই তো বুঝতি পারতিছি নে।

আবার আর্তনাদ। হঠাৎ রাইফেল গর্জে ওঠে। পরক্ষণেই এদিক ওদিক থেকে স্টেনগানের শব্দ।

রাজেন।। ছ্যার অ্যাটাক করিছেন।
অভয়।। ওরাও তো স্টেনগান চালাচ্ছে।
রাজেন।। এবারে উল্টোদিক দিয়ে আমরাও চার্জ করবো। ফায়ার।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ। পরপর দুটো আর্তনাদ। এরপর কিছুক্ষণ শুধু লড়াই আর আর্তনাদের শব্দ।

দৃশ্যান্তর

ভোরের পাখির কলরব। ইতস্তত কিছু আর্তনাদের শব্দ।

শান্তি।। রাজেনবাবু, এবারে রাত শেষ। আলো ফুটেছে।
রাজেন।। ইয়েস ছ্যার।
শান্তি।। সব কটাই ঘায়েল হয়েছে মনে হয়। অ্যারেস্ট দেম।
রাজেন।। ঠিক আছে ছ্যার। (গলা তুলে) এই— তোমরা খুঁজে-খুঁজে সব কটার হাতে হাতকড়ি লাগাও। ... এট্টা কাণ্ড দেখিছেন ছ্যার, সব কটাই ঘায়েল হইছে ভঞ্জাগের তিরি। আমাগের গুলিগোলা কোনো কাজেই লাগলো না!
অভয়।। আর দেখুন, সব কটা তিরই পায়ে লেগেছে— যেমন বলে দিয়েছিলেন শান্তিদা।

রায়।। কী টিপরে বাবা!

দত্ত।। এক্ষুনি ইঞ্জেকশান দিতে হবে। নইলে গ্যাগ্রিন হয়ে মরবে সবকটা।

শান্তি।। কিন্তু ভঞ্জারা গেল কোথায়?

রাজেন।। কাজ মিটে গেছে, আর কী খুঁজে পাবেন ব্যাটাগের। সবকটা তো ল্যাজ ছাড়া হনুমান!

রায়।। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

অভয়।। রাইটলি সার্ভড— রায়দা।

দৃশ্যান্তর

মোরগ ডাকছে। এক থেকে একাধিক।

বুড়ো।। তুদের কুথা হামার মগজে কুছু ঢুকলো নাই।

ভঞ্জার বাবা।। হামরা তো তখুন জঙ্গলে কাঠ বইছি সক্কলা। কতখানি পথ যেইতে হব্যেক, হুই টেরাকের কাছ বরাবর। হঠাৎ শুনলম— কে ঝ্যান চেঁচাই উঠলো। আবার। আবার। থক্ খেইঁয়ে গেলম হামরা। দমভর খাড়া হইঁয়্যে রইলম। বুঝলম, মহাজনের নোক বিপদে পড়্যেছে। কিন্তুক কী হয়্যেছে বুইতে লাইরলম্। তখুন তির-কেঁড়ে আইনতে ছুটলম, কিন্তুক যেয়্যে দেখি সব ভোঁ-ভাঁ। হামাদিগের অস্তরগুলান লিয়ে কারা ঝ্যান ভেইগে গেঁইছে বটে।

বুড়ো।। ত সব কুছু ছেড়্যেছুড়্যে তুরাও পলায়্যে এলি ঘরকে?

ভঞ্জার বাবা।। গোলাগুলি চলছে সিঁথা! ত খালিহাতে সিখানে থেক্যে কী কুইরব হামরা?

বুড়ো।। হুঁ বুঝলম। ত ভঞ্জা কুথাকে গেল?

ভঞ্জার বাবা।। গোলাগুলির শব্দ শুনে সে শালার ছেল্যাও কুথাকে ভেগ্যেছে কে জানে?

দৃশ্যান্তর

শান্তি।। দত্ত, তুমি আর অভয় দুটো জিপ নিয়ে চলে যাও জঙ্গলে। মেডিকেল বকস সঙ্গে করে নিয়ে যাও। যেটুকু প্রাথমিক ট্রিটমেণ্ট দরকার করে, রাজেনবাবুকে দিয়ে সব কটাকে সদরে চালান করে দেবে। ওদের তিনজন ড্রাইভারকেই নিয়ে যাবে পুলিশ পাহারা দিয়ে। আমাদের ড্রাইভারই চালাবে ওদের ট্রাক। আর একটা জিপে ওদের অস্ত্রশস্ত্র

নিয়ে রাজেনবাবু যাবেন। ওদের রওনা করিয়ে আর একটা জিপ নিয়ে ফেরত চলে আসবে। অনেক কাজ বাকি। রায় এখানেই থাকছে।

অভয়।। এবার একটা উৎসব হবে না শান্তিদা?

শান্তি।। নিশ্চয়ই। এত বড়ো একটা যুদ্ধ হলো, বিজয়-উৎসব হবে না? নিশ্চয়ই হবে। আগে তোমরা সদর থেকে ঘুরে এসো চটপট— ও. কে.?

জিপ স্টার্ট দিয়ে দূরে চলে যায়।

দৃশ্যান্তর

উৎসবমুখর জনকোলাহল।

শান্তি।। গাঁয়ের এত লোক এসেছে, ভঞ্জার দাদু আর বাবাকে তো দেখছি না?

জনৈক।। উয়া আসবেকই লাই, লাজ পেয়েছ্যে বটে।

শান্তি।। সে কী? কেন? চলো তো দেখি।

দৃশ্যান্তর।

শান্তি।। কী কত্তা, এতবড়ো উৎসব হচ্ছে আপনাদের মাঠে! কত খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন! পাড়ার কর্তা আপনি— চুপচাপ বাড়িতে বসে রয়েছেন?

বুড়ো।। (লজ্জিত) হামাদিগে যাবার আর মুখ লাই গ বাবু।

শান্তি।। কেন?

বুড়ো।। হামার ছেল্যেরা, গাঁয়ের মানুষগুলান সিদিন পলায়্যে আইসছে। লড়াই কুরে লাই।

শান্তি।। সে কী কথা? তাহলে লড়াই করলো কারা? বন্দুকের শব্দ শুনে ভেবেছেন, আমরা? না। আসল যুদ্ধ করেছে তো আপনার নাতি তার দলবল নিয়ে। ভঞ্জাই তো সেনাপতি। আমরা তার সৈন্যসামন্ত।

বুড়ো।। (অবাক) কী বুলছ হে?

শান্তি।। বিশ্বাস হচ্ছে না? রাজেনবাবু, দিন তো তিরের প্যাকেটটা? তাকিয়ে দেখুন। এগুলো কাদের? এই জমাট বাঁধা রক্ত লেগে রয়েছে তিরের ফলায়?

বুড়ো।। হঁ বটে। তাইত! ভঞ্জা! ভঞ্জা কুরেছ্যে? দল বেইন্ধে মহাজনকে

তাড়াইন দিছে উরা? এতকাল হামরা পারি নাই— উয়ারা পাইরল? কুথাকে গেল সেই ছোঁড়া? ভঞ্জা—

ভঞ্জা।। দাদু?

বুড়ো।। বেঁচ্যে থাক দাদু, বেঁচ্যে থাক। মান রাখিছু হামার। (কেঁদে ফেলে) আরে ডাক— তুর বাপরে ডাক। আয়— আর লাজ লাই রে বাপ, তুর বেটা হামাদিগের লাজ মুছ্যে দিছ্যে রে। যা যা— বাবুদিগের হাতে হাত মিলায়্যে দে।

শান্তি।। এসো ভাই। এতো তোমাদেরই বিজয়-উৎসব। তোমরা সবাই মিলে হাত না লাগালে আমরা পারবো কেন? এসো। তোমার মা কোথায় ভঞ্জা? ওঁকে নিয়ে যাবে না তোমাদের উৎসবে?

ভঞ্জা।। হঁ যাব। মা-টোকে তো তোমরা সারাইঁন দিছ। একটু একটু হাঁইটতে পারে এখুন। আমি আর বাপ ধরাধরি কুর্যে লিয়ে যাচ্ছি।

শান্তি।। ঠিক আছে, এসো।

দৃশ্যান্তর

জনকোলাহল। আনন্দমুখরিত পরিবেশ।

শান্তি।। সকলের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে রাজেনবাবু?

রাজেন।। হ্যাঁ, ছ্যার, এই খিচুড়ি, লাবড়া আর চাটনি— কব্জিভর টানিছে ব্যাটা-বিটিরা।

শান্তি।। ভালো ভালো। আহা রে—। অভয়, ওই ফুলের মালাটা দাদুর গলায় পরিয়ে দাও। আজকের উৎসবের প্রধানঅতিথি— দাদু। রায়, দত্ত তোমরা সকলকে একজায়গায় জড়ো করো, আমি কিছু কথা বলবো ওদের।

রাজেন।। (চেঁচিয়ে) এই এদিকে আসো সবাই। আস্তে আস্তে। গোলমাল কোরো না। ছ্যার তোমাগের কিছু বলবেন।

জনকোলাহল ক্রমে স্তিমিত হয়। পাখির ডাক শোনা যায়।

শান্তি।। শোনো ভাই, এই যে সব ঝুড়ি কোদাল গাঁইতি রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ— এগুলো কাল সকালে তোমরা আমাদের তাঁবু থেকে নিয়ে যাবে প্রত্যেকে। কাল সকাল থেকেই কাজ শুরু হবে তোমাদের। কাজের শেষে আবার বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। আর সেই সঙ্গে

খাবারের চাল ডাল তেল নুন নিয়ে যাবে। এইভাবেই কাজ চলবে এখন তোমাদের।

জনৈক।। কী কাম কইরতে হবেক বটে?

শান্তি।। অনেক কাজ। তোমাদের মনের মতো একটা গ্রাম তৈরি করতে হবে প্রথমে। তবে তার আগে-- বলেছিলাম, আর গাছ কাটা নয়? নতুন গাছ লাগাবার জন্যে গর্ত খুঁড়তে হবে। বর্ষা এলে তাতে চারা পুঁতবে। এ হলো বড়োদের কাজ। আর ভঞ্জা বা তার চেয়েও ছোটোরা আপাতত লেখাপড়া শিখবে। ওইখানে-- ওই গাছতলায় ইস্কুলে বসবে ওদের। ভঞ্জা, তোমাদের দল সার বেঁধে দাঁড়াও। ... ঠিক আছে। তোমাদের জন্যে-- এই দ্যাখো, কত শ্লেট পেনসিল বই এনেছি। তোমরা নিয়ে যাও। কাল থেকে কিন্তু স্কুল। কেমন?

ছোটদের কলরব। অনেক হাততালি।

আর একটা কাজ বাকি আছে। আজকের মতো সেটাই শেষ কাজ। ভঞ্জা-- তোমার মা আর দাদুকে এখানে নিয়ে এসো। অভয়-- ওই যে তিনটে শালগাছের চারা রয়েছে-- ওর একটা তুমি দাদুর হাতে দেবে। দত্ত দেবে মায়ের হাতে আর রায় দেবে ভঞ্জার হাতে-- কেমন? ওই যে ওঁরা এসে গেছেন।

আবহসংগীতে আনন্দের সুর। চাপা জনকল্লোল।

আজকের বিজয়-উৎসবের সাক্ষী হিসেবে এই তিনটি গাছ পুঁতে দেওয়া হবে এই ডিমৌলির জমিতে। অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের হাতে চারা তিনটে তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে এই গাছগুলি দীর্ঘজীবী হোক।

সমবেত করতালি। আনন্দের সুর বাজে।

শান্তি।। এবার যুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসেবে তোমাদের কিছু দিতে চাই। ভঞ্জা-- আবার তোমরা দাঁড়াও দলবল বেঁধে। ... ঠিক আছে। ছোট্ট বন্ধুরা আমার-- এই যে লণ্ঠনগুলো দেখছো, এগুলো তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। অন্ধকারের মধ্যে এতকাল যারা দিন কাটিয়ে এসেছে, তাদের তোমরা আলোর রাস্তা দেখিও। জয় হোক তোমাদের।

আবার করতালি। জনকোলাহল দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের মাদল ও বাঁশীর সুরও মিলিয়ে যাচ্ছে এবার।

দেখতে পাচ্ছ তোমরা— লণ্ঠন জ্বালিয়ে কেমন দল বেঁধে শালবনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ভঞ্জাবাহিনী? ওরাই আমাদের স্বপ্ন সফল করবে। বলো, করবে— না? গান ধরো হে— অভয়, দত্ত, রায়— সবাই মিলে গান ধরো সেই প্রথমদিনের মতো—

সমবেত কণ্ঠে গান ধরে ওরা।

আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও...।